জীবন।

প্রথম খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিজের কথা বল্‌তে গেলে, যাঁদের হতে এ জীবন লাভ করেছি, তাঁদের কথাই প্রথম প্রাণে জেগে ওঠে। হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য সর্ব্বাগ্রে তাঁদেরই প্রাপ্য।

তাঁরাই স্বর্গ, তাঁরাই ধর্ম্ম,—তাঁদের প্রীতি-সাধনই পরম তপস্যা।

* * * * *

পিতৃদেবের কথা মনে হতেই, সৌম্য সংযত মূর্ত্তি নয়ন-সম্মুখে ভেসে উঠ্‌ছে। তিনি প্রিয়দর্শন ছিলেন—নয়ন তেজোপূর্ণ, নাসিকা দীর্ঘ, ললাট প্রশস্ত, বদন পুরুষোচিত দৃঢ়তা-ভাব-ব্যঞ্জক। শ্যামবর্ণ—তেমন দীর্ঘাকৃতি ছিলেন না, অথচ খর্ব্বকায় ও নয়।

আমি তাঁর প্রথম সন্তান। আমার পরে, একটী ভাই এবং একটী ভগ্নী জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু অতি অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। তাদের পর ভগ্নী নলিনী জন্মগ্রহণ করে।

জীবন

যে সময়ের কথা বল্‌ছি,—তখন পিতৃদেব কলকাতার বড়বাজারে একজন শ্রীসম্পন্ন ব্যবসায়ী। সেখানে তাঁর মসল্লার বৃহৎ কারবার ছিল।

বাল্যকালটা তাঁর পক্ষে বড় সুখে অতিবাহিত হয়নি। আমার পিতামহের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, কিন্তু পিতাঠাকুরের জন্মের কিছু পর হতেই তাহার পরিবর্ত্তন হয়। একপ্রকার দারিদ্র্য-তাড়নায় প্রপীড়িত হয়েই, পিতৃদেব যৌবন-প্রারম্ভে আবাস-স্থল পূর্ব্ববঙ্গ হতে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য কলকাতা আগমন করেন। প্রথম কয়েক বছর, বড়ই কষ্টে অতিবাহিত হয়। আজ এখানে, কাল ওখানে, এ দোকানে, সে দোকানে —এমন ভাবে অনেকদিন কষ্ট ও অশান্তির ভিতর চলে গেল।

চিরকালই দেখ্‌ছি, কায়মনোবাক্যে অভিষ্টসিদ্ধির জন্য ব্যগ্র হলে,—লক্ষ্মী অবশেষে বরণ করেনই করেন। বুঝ্‌তে পারিনা, জগতের কোন্‌ নিগূঢ় নিয়মানুসারে ইহা সংঘটিত হয় কিন্তু প্রতিনিয়ত যে হচ্ছে, সন্দেহ নেই।

আরো কয়েক বৎসর অতিবাহিত হ'ল। ইতিমধ্যে তিনি বিবাহ করেছেন। আমি জন্মগ্রহণ করেছি। আমাদের পটলডাঙ্গার বাটীখানা মহানন্দে ডগ্‌মগ্‌ কচ্ছে।

অর্থ হলেই, লোক এসে জোটে। অবস্থা-পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয় স্বজনগণের ও মতিগতির পরিবর্ত্তন হতে লাগ্‌লো। এপর্য্যন্ত, সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের দুএকজন ব্যতীত, কেহ তাঁর সংবাদ নেওয়ার প্রয়োজন উপলব্ধি করেননি। এক্ষণে, প্রায়ই লোকসমাগমে গৃহ পূর্ণ হতে লাগ্‌লো। কিন্তু পিতৃদেব হৃদয়ে সঙ্কল্প করেছিলেন, কাহাকেও স্বীয় আবাসে স্থায়ীভাবে বাস-স্থান দিবেন না। সেই জন্য, ধনীর গৃহ সত্বেও আমাদের বাটীতে সুখ এবং শান্তি বিরাজ কত্তো।

কিন্তু তিনি আত্মীয় স্বজনের দুঃখমোচনে পরাঙ্মুখ ছিলেন এমত নয়। সাধ্যানুসারে প্রতিমাসেই দুঃস্থ স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের উদ্দেশে অর্থ প্রেরণ কত্তেন। কোন্ বাঙ্গালী করেনা?

আমাদের বাটী—ঢাকা জেলার অন্তর্গত মালতী গ্রামে। কলকাতা আগমনের পর হতে, পিতৃদেবের সেখানে যাওয়া তেমন ঘটে ওঠেনি। শুন্‌তে পাই, বিবাহের পর এককালীন সাত আট মাস কাল বাস করেছিলেন। তা ব্যতীত, বছর চারি পাঁচ পর কখন কখন মাসেকের জন্য সেখানে যেয়ে থাক্‌তেন।

আমার জন্ম,—আমাদের এই পৈতৃক বাসস্থান মালতীতেই হয়েছিল। নলিনী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে।

কে বল্‌বে, কেন জন্মভূমির প্রতি লোকের এমন প্রগাঢ় ভালবাসা? বাবা বাটীতে একরকম যেতেনই না কিন্তু তথাপি দেখেছি, যদি কখনও কথাচ্ছলে গ্রামের কথা উঠ্‌তো, তখনি যেন তাঁর প্রাণ আহ্লাদে মগ্ন হয়ে পড়্‌তো। দেশের কোন লোক আস্‌লেই, তন্ন তন্ন করে গ্রামের সকলের কথা জিজ্ঞাসা কত্তেন। অথচ, সেখানে যেতে অনুরোধ কল্লে প্রায়ই বল্‌তেন, সময় কোথায়? ইচ্ছা কল্লেই তো আর যাওয়া যায়না। এরূপই। অনেক প্রিয় জিনিষের বিষয়ই দূর হতে শুন্‌তে ভাল, কাছে গেলে আর তেমন মনোহর বোধ হয় না।

বাল্যে তাঁর বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ সুবিধা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু কি সম্পদে কি বিপদে কখনও তিনি কমলার সঙ্গে সঙ্গে সাধ্যানুসারে সরস্বতীর ও সেবা কত্তে ত্রুটী করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, যারা ধন হতে প্রকৃত সুখ-আহরণের অভিলাষী, তাদের পক্ষে জ্ঞানদেবীর সেবাও সর্ব্বোত্তভাবে কর্ত্তব্য।

জীবন

প্রত্যহ প্রাতে, জলযোগ করে, তিনি গাড়ীতে চড়ে দোকানে চলে যেতেন। মধ্যাহ্ন-ভোজন সেখানেই হতো। সন্ধ্যার অন্ধকার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে, গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কত্তেন। কতকক্ষণ পরে, আহারাদি শেষ হয়ে যেতো।

তৎপর তিনি বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ কত্তেন। সে গৃহটী বিশেষ ভাবে সজ্জিত ছিল। দেয়ালে সুদৃশ্য চিত্রসমূহ বিলম্বিত, মেজ কারপেট মণ্ডিত। সুশোভন আলমারীসমূহে নানাবিধ পুস্তকাবলী। এবং ক্ষুদ্র একখানা টেবিলের উপর কয়েকখানা পত্রিকা স্থাপিত থাক্‌তো।

মাতৃদেবী সেখানে তাঁর সহিত মিলিত হতেন। কক্ষের একপার্শ্বে পিয়েনো, কিছু দূরেই, বেহালা এস্রাজ সেতার ইত্যাদি অন্যান্য বাদ্য-যন্ত্র সুসজ্জিত। তিনি যখন যেটী ইচ্ছে, নিয়ে বস্‌তেন। প্রায়ই গাইতেন। দুই একদিন বাবাও গাইতেন। উভয়েরই স্বর সুমিষ্ট। তবে, মা এ বিষয়ে অধিকতর সুশিক্ষিতা ছিলেন।

রাত্রি দশ ঘটীকা পর্য্যন্ত, গান ও গল্পে বিশ্রাম-কক্ষে অতিবাহিত হতো। শনিবার আমরাও আহুত হতাম। সে সকল রজনী আমাদের বাল্য-জীবনের আনন্দ-রজনী ছিল।

মা, বড় ঘরের মেয়ে। বাল্যকালে লরেটোতে পড়্‌তেন। গান বাজনা শিক্ষার জন্য পিত্রালয়ে সুবন্দোবস্ত ছিল। সঙ্গীত বিদ্যায় সুনিপুণা ছিলেন। উত্তর কালে নলিনী সে গুণের অধিকারিণী হয়েছে।

তিনি চিত্রাঙ্কনেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। এসকল কারণেই তিনি পিতৃদেবের প্রথম হৃদয়াকর্ষণ কত্তে সক্ষমা হয়েছিলেন এবং প্রধানতঃ এই ললিতকলার চর্চ্চাই তাঁদের উভয়ের জীবন এমন মাধুর্য্যময় করে তুলেছিল।

পিতৃদেব কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁর ব্যবসায়ে উন্নতির কারণ ও এই।

কলিকাতা আগমনের কিয়ৎকাল পরেই, তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রভাবের ভিতর নিপতিত হন। তখন, বর্ত্তমান ভারতে সাম্য-মৈত্রী ভাবের প্রকৃত প্রথম প্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বঙ্গের নব্যযুবকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মের অগ্নিবাণী নিক্ষেপ কচ্ছিলেন। তাঁর অমৃত বাণী শ্রবণ কত্তে কত্তে তিনি ভাবাবেশে বিভোর হয়ে পড়েন। সে-দিন হতেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম-বন্ধুগণসহ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

ব্রহ্ম মন্দিরেই জননীর সহিত তাঁর প্রথম সন্দর্শন লাভ হয়।

প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আমরা সমাজে যেতাম। বাবা সেদিন সুন্দর পোষাক পরিধান কত্তেন, মা সুশ্রী সুকোমল মসৃণ বস্ত্রে ভূষিত হয়ে তাঁর সঙ্গে গাড়ীতে আরোহন কত্তেন। আমি কখনো বা তাঁদের উভয়ের মাঝে, কোন দিন বা সম্মুখস্থ আসনে স্থান পেতাম। নলিনী মার ক্রোড়েই উপবেশন কত্তো।

শনিবার কিছু সকালেই দোকান হতে বাবা ফিরে আস্‌তেন। তৎপর কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে, আমাদিগকে নিয়ে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে গাড়ী চড়ে ভ্রমণে বহির্গত হতেন।

প্রায়ই আমরা গঙ্গাতীরে বেড়াতে যেতাম। সে সময়টী বেশ ভাল লাগ্‌তো। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে অন্ধকার ভেদ করে, শত শত অর্ণবপোত এবং তরণী হতে আলোকসমূহ নির্গত হচ্ছে, দূরে শত সহস্র আলোক খণ্ড বক্ষে ধারণ করে 'গড়ের মাঠ' অপূর্ব্ব বিপণির ন্যায় শোভা পাচ্ছে, কিয়দ্দূরে চৌরঙ্গীর রাজপ্রাসাদসদৃশ অট্টালিকাবলী অসংখ্য উজ্জ্বল আলোককণা নির্গত করে ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের অনুকরণ

কচ্ছে.—আর এদিকে গঙ্গাশীকর-স্নিগ্ধসমীরের ভিতর দিয়ে আমাদের গাড়ীখানা ধীর মন্থর গতিতে চল্‌ছে। নানা শব্দ মুখরিত নদীতট হতে ক্রমে কোলাহল অপসারিত হচ্ছে। গঙ্গাবক্ষ ও ক্রমে শান্তিভাব পরিধারণ কচ্ছে। উপরে, আকাশে নিঃশব্দে নক্ষত্রসমূহ ফুটে উঠ্‌ছে। সেখান হতে আমাদের শিরোপরি শান্তি ও আনন্দ বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এমন সময়, মন আপনা হতেই নম্রভাব ধারণ করে। ভগবৎ-ভক্তি-পূর্ণ-প্রাণ পিতৃদেব, জননীকে মাঝে মাঝে উদ্দেশ করে বল্‌তেন, চেয়ে দেখ, চারিদিক কেমন অপরূপ বেশ ধারণ কচ্ছে, কেমন মাধুর্য্যমণ্ডিত, শান্তিপূর্ণ! বল্‌তে বল্‌তে তাঁর নয়ন মুদ্রিত হয়ে আস্‌তো। তখন, দুজনে নির্ব্বাক হয়ে যুক্তকরে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম কত্তেন।

বাবা সকল সময়ই ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন। তথাপি, বৎসরে অন্ততঃ একবার আমাদিগকে নিয়ে দেশভ্রমণে বহির্গত হতেন। কোন বার দার্জিলিঙ্গ, কোন বার বৈদ্যনাথ বা দেওঘরে, কাশী বা বিন্ধ্যাচলে বা অন্যত্র কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে মাসেক কাল থাক্‌তেন। দুই একবার মালতীতে ও যেতেন কিন্তু সে খুব কমই হয়ে উঠ্‌ত। তখন,—হাস্যালাপ, গান বাজনা, ভ্রমণ ও নানা প্রকার আমোদ-আহ্লাদের ভিতর আমাদের জীবনটী কেটে যেতো। বাটীর সকলেই এই সময়টীর দিকে সারাটী বৎসর ঔৎসুক্যের সহিত চেয়ে থাক্‌তো। আমাদের পড়াশুনা ও তখন একেবারে বন্ধ থাক্‌তো।

বালক ছিলাম। বুঝ্‌তামনা বাবা বিনা কাজে কেন এমন ভাবে সময় কর্ত্তন কচ্ছেন। এখন দেখ্‌ছি, মাঝে মাঝে ঈদৃশ আনন্দ-স্নান এবং বিশ্রাম-ভোগ জীবন-যুদ্ধে মৃতসঞ্জিবনী। ঘর্ম্মাক্তকলেবর সদাকার্য্যরত ভাড়াটিয়া গাড়ীর ঘোড়ার কপালে সুখ নেই, অতি ক্ষণভঙ্গুর ও সে জীবন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পিতৃদেব অল্পভাষী কিন্তু রূঢ়প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বন্ধুর সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না, কিন্তু যার সঙ্গে মনের মিল হতো, চিরকালের জন্য আপন করে রাখ্‌তেন।

এভাবের তাঁর একজন বন্ধু ছিলেন—রমেশ বাবু। টমসন্ কোম্পানীর বড় বাবু, শত চারি টাকা মাহিনা পেতেন। পিতৃদেব এবং তিনি এক সময়েই ভাগ্যপরীক্ষার জন্য কলকাতা আগমন করেন। উভয়েই বহুদিন এক মেসে বাস করেছিলেন। এক সময়ই ব্যবসায় নিযুক্ত হন। কালক্রমে, রমেশ বাবু ব্যবসা পরিত্যাগ করে সওদাগরি আফিসে চাকরী নিয়ে প্রবেশ কল্লেন এবং এক্ষণে আফিসের সর্ব্বোচ্চ পদ অলঙ্কৃত কচ্ছেন। গোয়াবাগানে বাসা ছিল কিন্তু আমাদের গৃহে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার আস্‌তেনই। আমাদের বড়ই ভাল বাস্‌তেন। বিশেষতঃ নলিনী তাঁর বড়ই আদরের পাত্র ছিল। তাঁকে আমরা জ্যাঠাম'শায় বলে ডাক্‌তাম।

আর একজন বন্ধু ছিলেন—কাশী বাবু, যাঁকে আমরা কাকা বাবু বল্‌তাম। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। গ্রেহামের বাড়ীতে গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাহিনায় কি যেন কাজ কত্তেন। ব্রাহ্মসমাজে খুব যাতায়াত কত্তেন, মাঝে মাঝে সেখানে বক্তৃতাও দিতেন, সাধু লোক বলে নামও ছিল বেশ। কিন্তু সাধুনামধেয় ব্যক্তিগণ সচরাচর যেমন পেঁচক-বদন হয়ে থাকেন, তিনি সেরূপ ছিলেন না। ঠাট্টা-তামাসা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি খুসির ভাবে তাঁর হৃদয় সকল সময়ই পূর্ণ থাকতো। সাধুর কথা হতেই সমাজ মন্দিরে আচার্য্যের আসনে উপবিষ্ট দীর্ঘ-দাড়ি-গোঁফ সমন্বিত

নীরস কর্কশস্বরবিশিষ্ট যে ব্যক্তি বিশেষের মূর্ত্তি মনে উদয় হয়, তাহা অপেক্ষা, 'কাকা বাবু' সহস্রগুণে ভাল-সাধু ছিলেন, অন্ততঃ আমাদের তো তেমন মনে হ'ত।

কাকা-বাবুর পরেই ডাক্তার বিনয় বাবুর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর বাসা আমাদের গৃহের সম্মুখে গোলদীঘির সন্নিকটে। প্রভূত অর্থোপার্জ্জন কত্তেন। খুব পসার ছিল, এমন কি, ভাল করে আহারের সময়টী পর্য্যন্ত পেতেন না। কিন্তু আমাদের গৃহে চিকিৎসা করে, একটী পয়সা ও গ্রহণ কত্তেন না। অথচ, প্রায় প্রতিদিনই প্রাতে আমাদের বাটীতে এসে সকলের সংবাদ নিয়ে যেতেন, কারো পীড়া হলে তো কথাই নেই। মাকে দিদি বলে ডাকৃতেন, তাঁর স্ত্রী প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে আসৃতেন। শুনেছি, মার একবার কঠিন পীড়া হয়েছিল, তিনি চিকিৎসা করেন। সুচিকিৎসাগুণে মাতৃদেবী শীঘ্রই রোগমুক্ত হলেন। পিতৃদেব তাঁকে উপহারস্বরূপ কতক টাকা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ও মাতৃদেবীর ব্যবহারে তিনি এমন কি যেন কি দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, যে ভিজিট বা উপহারস্বরূপ কিছুতো গ্রহণ কল্লেনই না, বরং মার আরোগ্য লাভের পর, আমাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করে ষোড়শোপচারে খাওয়ালেন।

বাবার এক মাড়োয়ারী বন্ধু ছিলেন। তিলকচাঁদ বাজাউতের নাম কে না শুনেছে? বড় বাজারের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ কাপড়ের ব্যবসায়ী। আমার বিশ্বাস, পিতাঠাকুর ব্যবসা সম্বন্ধে বুদ্ধি পরামর্শ তাঁর নিকট হতেই নিতেন। আমাদের গৃহে দুই একমাস্ পরে দেখা দিতেন। তখন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য হুলুস্থূল পড়ে যেতো। পিতৃদেব তাঁকে গুরুদেবের মত মান্য কত্তেন। এত বড় ধনী অথচ পোষাক পরিচ্ছদ নিতান্তই সাদাসিধা ধরণের। তিনি পিতৃদেবকে উদ্দেশ করে মাঝে মাঝে বলতেন, ছেলে

কতদূর পড়্‌লো? শেষে কি চাক্‌রীতেই দেবেন? বাঙ্গালী লোক সব চাকরী চাক্‌রী করেই অস্থির। আমাদের ছেলেদের মা আশীষ করেন, বাবা! সওদাগর হোও। আর আপনার দেশের মা করেন, বাবা বড় নোকর হোও। আপনারা তাই চাকরী করেন, আমরা ব্যবসা করি। না, দীনবাবু! ছেলেকে চাকরীতে দেবেন না। ও দোকানদারের ছেলে, দোকানদার হোবে, বড় সওদাগর হোবে।

বীডনষ্ট্রীটে নীলমণি বাবুর বাড়ী। হাইকোর্টের উকীল। তাঁর সঙ্গে পিতৃদেবের অনেক দিন হতেই মেলামেশা ভাব। তিনিই ধর্‌তে গেলে তাঁর একমাত্র বন্ধু, যার সঙ্গে তিনি মন খুলে দেশের সাধারণ বিষয় সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বল্‌তেন। আইন পড়ায় ও নানাবিধ লোকের সম্পর্কে অতিবাহিতজীবন হেতু, তাঁর কথাবার্ত্তার ভিতর এমন একটা দৃষ্টির প্রসারতা দেখ্‌তাম, যা আর কারো কথায় তেমন দৃষ্ট হতো না।

ইঁহারা ব্যতীত বাবার ছোট খাটো আরো কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। তা ছাড়া বন্ধু-নামধারী আরো কয়েকজন ছিলেন, কিন্তু তারা কতদূর হিতাকাঙ্ক্ষী, বিশেষ সন্দেহ।

কি জানি কেন, এই প্রসঙ্গে আমাদের কুল-পুরোহিত শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তীর কথা মনে জেগে উঠ্‌ছে। বাবার যখন অবস্থা খারাপ, তখন তাকে গৃহে পদার্পণ কত্তে দেখা যায় নি। কিন্তু যখন তাহার পরিবর্ত্তন হলো, তখন প্রথম তিনিই সর্ব্বাগ্রে সুদূর স্বদেশ হতে আমাদের সংবাদ নিতে ছুটে আস্‌লেন। সরু যষ্টির ন্যায় আকৃতি, দীর্ঘ নাসিকা, কপালে তিলক, মস্তকের পশ্চাতে দোদুল্যমান টিকি, পায় চটিজুতা, সাদা থানের ধুতি পরিধানে,—লোকটীকে প্রথম যখন দেখি, তখন আমার বয়স অল্প। তারপর, এমন বছর যায় নি, যে তিনি তিন চার বার আমাদের গৃহে

পদার্পণ করেন নি। বছর পঞ্চাশেকের উপরে বয়স, লোকটা ভারি হিন্দুয়ানির ভান্ কত্তো, কথায় কথায় শ্লোক আওড়াতো, স্বহস্তে রান্না করে খেতো। আমরা যে কুক্কুট-মাংস ভোজনে মহাপটু তার অবিদিত ছিল না কিন্তু তথাপি মা রান্নার যোগাড় করে দিলে যেন বড়ই পরিতৃপ্ত হতেন। সে সব সময় মাকে লক্ষ্য করে বল্‌তেন, মা যেন স্বয়ং লক্ষ্মী, কেমন পরিপাটী কাজ, এমন ভাবে সাজান গোছান জিনিষ পত্র কোথাও পাবার যো নেই। বাবা তার উত্তরে দুই এক সময় হেসে বল্‌তেন, ঠাকুর মশায়! আমরা তো ম্লেচ্ছ, জাততো এক প্রকার মানিই না, ভয় হয় আপনার হিঁদুয়ানির উপর কোনও দোষ না পড়ে। তদুত্তরে চক্রবর্ত্তী মশায় বল্‌তেন, তা বাপু! এখন এসব না খায় কে? তবে সামাজিক কোনও ব্যাপারে প্রকাশ্যে না খেলেই হলো। জাত কি আর আছে? একটা ভড়ং, না রাখ্‌লে নয়, তাই। আমি ব্রাহ্মণ, আমার জাত নেয়, কার সাধ্যি? বিদায়কালীন মা তাকে সাষ্টাঙ্গ হয়ে প্রণাম কত্তেন, অনেক টাকা পয়সা দিতেন, কিন্তু লোকটীকে আমার কেন যেন ভালই লাগ্‌তনা।

পাড়া-প্রতিবেশীরা বল্‌তো যে আমাদের দাস দাসীরা বড় প্রভুভক্ত, কর্ত্তব্যপরায়ণ। যারা সঠিক সংবাদ না জান্‌তো, তারা ভাব্‌তো অত্যধিক বেতন প্রদানই এর কারণ। প্রকৃত কথা, বাবা ও মার ব্যবহারই এমন সুমধুর ও সুসংযত ছিল, যে কালে তারা আমাদের নিতান্ত নিজ জন হয়ে পড়েছিল। পিতৃদেবকে বাটীর সকলেই ভয় করে চল্‌তো কিন্তু হৃদয়ের সহিত ভক্তি ও কত্তো। চাকর চাকরাণীদিগকে নিতান্ত নিজ সন্তান মত দেখ্‌তেন, অথচ কর্ত্তব্য-কর্ম্মে যৎসামান্য বিমুখ দেখ্‌লে তিরস্কার কত্তে কখনও ত্রুটী কত্তেন না।

বস্তুতঃই, আমাদের গৃহখানা শান্তির আলয় ছিল। প্রভাত হতে রাত্রি পর্য্যন্ত, যে যার মনে কাজ কচ্ছে, কোথায় ও অকারণ শব্দটী নেই। সবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, যথাস্থানে বিন্যস্ত। জ্যাঠামহাশয় প্রায়ই বল্‌তেন, এ বাড়ীতে পা দিতেই মনে হয়, স্বর্গে এলুম।

প্রকৃতই, যদি শৃঙ্খলা শান্তি ও সন্তোষ, আনন্দ এবং প্রীতি স্বর্গের প্রধান অঙ্গ হয় (স্বর্গরাজ্য যদি কোথায়ও বিরাজিত থাকে, তবে তা না হয়েও পারে না) তা হলে আমাদের পটলডাঙ্গার বাটীখানা নিশ্চয়ই মর্ত্তে অমরাবতী বিশেষ ছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মার কথা মনে হতেই, আর একটী মূর্ত্তি আমার নয়ন সম্মুখে ভেসে ওঠে—হিন্দুর পরমারাধ্যা ভগবতী মূর্ত্তি। তিনি তেমনি অপূর্ব্ব সুন্দরী ছিলেন, তেমনি বুদ্ধিব্যঞ্জক উজ্জ্বল নয়ন, সন্তান-বৎসলা। পরদুঃখ কাতরতা তাঁর হৃদয়ের প্রধান অঙ্গ ছিল। শুনেছি, বিজয়া দশমীর রজনীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁর নামকরণ হয়েছিল—ভগবতী। সত্যই তিনি রূপেগুণে ভগবতীসদৃশা ছিলেন।

পূর্ব্বেই বলেছি, তিনি বাল্যকালে লরেটোতে বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন। বিবাহের পরও পাঠের কোনও প্রকার ব্যাঘাত হয় নি। পিতৃদেবের ইচ্ছানুসারে, তাঁর শিক্ষার জন্য অনেকদিন পর্য্যন্ত ভাল ভাল শিক্ষয়ত্রী নিযুক্ত ছিল।

সাধারণ লোকের বিশ্বাস, শিক্ষিতা রমণীগণ সংসারের কাজকর্ম্মে অনভিজ্ঞা ও অমনোযোগিনী হয়ে থাকে। যাদের গৃহের রমণীগণ

অশিক্ষিতা, তাদের মুখেই সচরাচর ঈদৃশ সারশূন্য সমালোচনা শ্রুত হওয়া যায়। আমার মাতৃদেবীকে কেহই সংসারের কাজে অপটু, এ অপবাদ দিতে সক্ষম হয় নি। তাঁর মত পাকা গৃহিনী বিরল। এ ক্ষেত্রে শিক্ষালব্ধ জ্ঞান তাঁর বিশেষ সহায়-স্বরূপ ছিল।

স্বামী স্ত্রী যদি একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত ও শিক্ষিত হন, তা হলে জীবন কেমন উপভোগ্য হয়, সংসার কি প্রকার সুখের হয়, আমাদের পরিবার তার সুদৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

দাসদাসীগণ মাতৃদেবীকে মা বলে ডাকতো। বস্তুতঃও স্নেহে এবং যত্নে তিনি তাদের মা-ই ছিলেন। একবার আমাদের কানাই দাদা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল, ডাক্তারগণ জীবনের আশা একপ্রকার পরিত্যাগ করেছিল। তখন দেখতাম, মাতৃদেবী তার শয্যা-সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করে সেবা শুশ্রূষা কচ্ছেন ও তাঁর চক্ষুদ্বয় বাস্পাকুল হয়ে উঠ্‌ছে। বহু বৎসর চলে গেছে কিন্তু কানাই দাদার সেই পীড়িতাবস্থার শয্যা, কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট পিতৃদেব ও পীড়িতের সম্মুখে উপবিষ্টা মার সে স্নেহ-মধুর মূর্ত্তি, সমস্ত দৃশ্যটী আজও আমার নয়ন-সম্মুখে ভাস্‌ছে।

মাকে কখনো দাসদাসীকে তিরস্কার কত্তে শুনি নি। যদি কারো কাজে কখনো অসন্তুষ্ট হতেন, তা হলে মাথাটী নত করে, তাকে লক্ষ্য করে ঈষৎ গম্ভীর ভাবে বল্‌তেন, তোমার কাজ ভাল বোধ হচ্ছে না, এ ভাবে চল্‌বে না, সাবধান করে দিচ্ছি তোমায়, সাবধান, সাবধান! ইহাই তাদের নিকট বিষম ভৎর্সনা ছিল। এমন কোনও মন্তব্য শ্রবণ কল্লে, চাকর চাকরাণী মহলে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হতো এবং কখনও বা ভৎর্সিত ব্যক্তি কেঁদে আকুল হতো।

সকল মাতাই সন্তানবৎসলা। ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। তাও মনে

হয়, আমাদের মা বুঝি আমাদের প্রতি একটু বিশেষ ভাবে স্নেহশীলা ছিলেন। অন্ততঃ, আমি তো তেমনি ভাব্‌তাম। বোধ হয়, ইহার একটু কারণও ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার পরে আমার একটী ভ্রাতা ও ভগ্নী জন্মগ্রহণ করে অকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। তজ্জন্যই বুঝি, আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহ শতগুণে বর্দ্ধিত হয়ে উঠেছিল। সকল সময়ই, হারাই হারাই একটা ভাব হৃদয়ে বিরাজ কত্ত। কিন্তু, তাঁকে কখনো শোকে মুহ্যমান হতে দেখিনি। পিতৃদেবকে মাঝে মাঝে আমাদের মৃত ভ্রাতা ও ভগ্নীর উল্লেখ কত্তে শুনেছি কিন্তু মার মুখে তাদের নামোল্লেখ কথনও দেখি নি। অথচ, বুঝ্‌তাম তাদের স্মৃতি সর্ব্বক্ষণই তাঁর হৃদয় জড়িয়ে রয়েছে, তাদের দূরে রাখ্‌বার জন্য সর্ব্বক্ষণই যেন চেষ্টা কচ্ছেন। মাঝে মাঝে দেখ্‌তাম, তাদের ফটোর কাছে তিনি নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি করে আছেন। এমন সময়, যেই কেহ ঘরে প্রবেশ কল্ল, অমনি অন্যত্র চলে গেলেন। ভালবাসার জনকে ভুলে যাওয়া, ইহা অপেক্ষা কঠিন কাজ জগতে নেই।

তিনি ভগবানে মহাভক্তিমতী ছিলেন। দুঃখকষ্ট যা কিছু, তাঁর আদেশ বলে, অবনত-মস্তকে বিনা আপত্তিতে বহন কর্‌বার চেষ্টা কত্তেন। সময় সময় বুঝি বা অক্ষমা হতেন, তখন চক্ষু গড়াইয়া জল বহিত, তথাপি মুখ ফুটে কিছু বল্‌তেন না। পিতৃদেবের ও ভগবানে অটল বিশ্বাস ছিল, কিন্তু তিনি যেন কোনও বিরহ সহ্য কত্তে পাত্তেন না। সামান্য বাত্যায় যেমন সমুদ্রবক্ষ বিলোড়িত হয়ে উঠে, সেই প্রকার কোনও দুঃখের কথা শুন্‌লে, ভালবাসার অপার আধার তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌তো।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁদের উভয়েরই মত বিশেষ উদার ছিল। পিতাঠাকুরের দেব দ্বিজে বিশ্বাস ছিল না, জাতিভেদ মান্‌তেন না, এবং অবরোধ প্রথায়

বিশেষ বিপক্ষী ছিলেন। খাওয়া দাওয়ারও কোনরূপ বিচার কত্তেন না। পাড়ার ভিতর আমরা ম্লেচ্ছ ব্রাহ্ম পদবীতে অভিহিত হতাম।

রমণীজাতি সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই রক্ষণশীলা। সকল বিষয়েই, বিশেষতঃ ধর্ম্ম ও আচার সম্বন্ধে তারা পরিবর্ত্তিত হন, ধীরে ধীরে। যদি চ মাতাঠাকুরাণী বাল্যকালেই ইংরাজী শিক্ষা লাভ করেছিলেন, যদি চ সে সময় হতেই ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টান রমণীদের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত, তথাপি দেখ্‌তাম অনেক বিষয়েই তাঁর হৃদয় প্রাচীন হিন্দু আদর্শসমূহের পদতলেই পড়ে ছিল। এ বিষয়ে পিতৃদেবের চরিত্রপ্রভাব পতিত হয়ে তাঁর হৃদয়কে দিন দিন উন্নত কচ্ছিল।

শয়নের পূর্ব্বে, প্রতি রজনীতেই মা আমাকে ও নলিনীকে কাছে নিয়ে বস্‌তেন। কতকটুক কাল ভগবানের নাম কত্তেন এবং তৎপরে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম কত্তেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে যোগদান কত্তাম। শেষে তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে কক্ষান্তরে শয়ন কত্তে যেতাম।

পাড়ার সকল বাড়ীতেই তাঁর যাতায়াত ছিল। রমণীগণ তাঁকে বড়ই ভালবাস্‌তো ও ভক্তি কত্তো। দুঃখে কষ্টে তিনি তাদের মহা সুহৃদ বিশেষ ছিলেন। কিন্তু গায়ে পড়ে কাহাকেও উপদেশ দেওয়া কিম্বা খুঁজে খুঁজে কার কোথায় কিরূপ কষ্ট হচ্ছে, বাহির করা, তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা-স্বরূপিনী ছিলেন। মুখে সর্ব্বক্ষণই নির্ম্মল হাস্য বিরাজিত। বিশেষ বুদ্ধিমতী অথচ নিতান্ত সরলা, স্নেহপরায়ণা। তাঁকে কেহ ভাল না বেসে পারেনি। কাকাবাবু তাঁকে পটলডাঙ্গার রাণী বলতেন,। বস্তুতঃ, তিনি ছোট বড় সকলেরই হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতির অর্ঘ্যপ্রাপ্ত হয়ে পাড়ার রাণী রূপেই বিরাজ কচ্ছিলেন।

শুনেছি, তাঁর গৃহ প্রবেশের পর হতেই, পিতৃদেবের সৌভাগ্য-সম্পদ অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি হয়ে আস্‌ছে। তাঁকে তিনি যে ভাবে যত্ন কত্তেন, এমন যত্ন কাহাকেও স্ত্রীর প্রতি কত্তে দেখি নি। স্বামী, স্ত্রীকে ভালবাসিবে এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। কিন্তু পিতৃদেব তাঁকে যে শুধু ভালবাস্‌তেন এমত নয়, সে ভালবাসার ভিতর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার ভাব বিজড়িত ছিল। প্রকৃত ভালবাসা বুঝি এ প্রকারই।

পিতৃদেব কর্ত্তৃক কখনও তাঁর প্রতি রূঢ় বাক্য প্রয়োগ দেখিনি। তাঁর আজ্ঞানুসারেই দাসদাসীগণ চালিত হতো। তাহার বিরুদ্ধে পিতাঠাকুর কিছুই বল্‌তেন না। ইহাই বাটীর নিয়ম ছিল। বল্‌বার প্রয়োজনও ছিল না।

উভয়ের কার্য্যস্থল সম্বন্ধে উভয়ের অলক্ষিতে একটা বিভাগ হয়ে গিয়েছিল। পিতৃদেব সারাদিন দোকান নিয়ে ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত থাক্‌তেন। রজনী সমাগমে গৃহে প্রবেশ কল্লেই, মাতার হস্তে শাসন ক্ষমতা সমস্ত পরিহার কত্তেন। সেথানে, মৃদুভাষিণী জননী সাম্রাজ্ঞীরূপে বিরাজ কত্তেন এবং ভক্তি-ভালবাসা ও মমতার সাহায্যে তাঁর জীবনপথ সরল ও মধুর করে দিতেন। তাঁর মিষ্ট স্নিগ্ধ ব্যবহারে সঞ্জীবিত হয়ে, তৎপরদিবস আবার নূতন উৎসাহে স্বীয় কার্য্যে গা ঢেলে দিতেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমাকে বাল্যকালেই হিন্দু-স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়েছিল। আমার বিশ্বাস, লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী ছিলাম না কিন্তু বাবার বন্ধুদের মুখে আমার সুখ্যাতি ধর্‌ত না। আমাকে লক্ষ্য করে, তাঁরা প্রায়ই বল্‌তেন, দীনবাবু। দেখ্‌বেন, এ ছেলে বেঁচে থাক্‌লে বংশ উজ্জ্বল কর্‌বে।

আমাদের শিক্ষকদের ভিতর কারো কথা আমার তেমন মনে হচ্ছে না, যেমন থার্ড মাষ্টার বসন্তবাবুকে।

ছেলেরা তাঁকে বড় ভালবাস্‌তো। এমন সুন্দর শিক্ষাপ্রণালী কারো ছিল না। ছাত্রগণের দুঃখকষ্টও তিনি যেমন বুঝ্‌তেন, এমন আর কেহই নহে। আপদে বিপদে আমাদের বন্ধুস্বরূপ ছিলেন।

তাঁর গৃহে প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। তখন, তাঁর মত শান্ত সুধীর অমায়িক লোক কেহ আছে বলে বোধ হত না। আমাদের সাথে নানা-বিষয়ে গল্প কত্তেন। মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে গড়ের মাঠে বা শিবপুরের বাগানে বেড়াতে যেতেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধে তাঁকে এক প্রকার নাস্তিকই বলা যেতে পারে। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্ট, কি ব্রাহ্ম সকল ধর্ম্মকেই সমানভাবে আক্রমণ কত্তেন। এক কথায়, তিনি বল্‌তেন—হয় দুঃখসুখ, পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম বলে কিছু নেই, আর তা না হলে ঈশ্বর নেই। যদি তেমন কেহ থাক্‌বেই, তা হলে পৃথিবী-ভরা এমন দুঃখকষ্ট, হাহাকার, অনাচার, দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার থাক্‌বে কেন? সাধারণ লোক চেষ্টা করে কত দুঃখ দারিদ্র্য মোচন কচ্ছে, পরের দুঃখে তাদের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে, আর সর্ব্বশক্তিমান

ত্রিকালজ্ঞ দয়াবান ভগবানই যদি থাকৃতেন, তা হলে তিনি বুঝি হাত গুটিয়ে বসে থাকৃতেন। বুড়টা বসে বসে বুঝি মজা দেখ্‌ছে!

তাঁর যুক্তি আমাদের অনেকের নিকট, বিশেষতঃ আমার কাছে, মনঃপুত বলেই বোধ হতো। কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা ভগবান ভক্তিতে বিভোর লোক দেখ্‌লে বল্‌তেন, লোক্‌টা খেপেছে হে। ভাব্‌ছে, ভগবান ভগবান করে কি যেন কি একটা পাবে, শেষে কিন্তু কিছুই পাবে না। এ ভাবেই দিনগুলি যাবে, মাঝ থেকে সংসারটা ভোগ করা হলো না, এমন মিহিদানা, সীতাভোগ, সন্দেশ, রসগোল্লা কিছুই ওর কপালে জুট্‌ল না, পোলাও কালিয়া কোর্ম্মাতো দূরের কথা।

তাঁকে সভাপতি করে, আমরা একটা সভা করেছিলাম। তার নাম ছিল—'জ্ঞানদায়িনী সভা'। আমি তখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। স্কুল গৃহেই প্রায় সভার অধিবেশন হতো। বার তিনেক তাঁর গৃহেও হয়েছিল। এই সভায়, আমরা ধর্ম্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, স্ত্রীশিক্ষা এবং মাঝে মাঝে সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ কত্তাম। সভ্য-সংখ্যা প্রথমে জন দশেক ছিল, শেষে একশতের কিছু কমে পরিণত হয়। সভ্যগণ অধিকাংশই প্রথম তিন শ্রেণীর ছাত্র, চতুর্থ শ্রেণীরও কয়েক জন ছিল।

তর্কস্থলে দেখ্‌তাম অনেকেই প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের সংস্কার এবং আচার ব্যবহারসমূহের পক্ষপাতী। কিন্তু সভাপতি মহাশয় সকল বিষয়েই উদারমতাবলম্বী ছিলেন। ভগবানে অবিশ্বাসী কিন্তু পরোপকারে সর্ব্বাগ্রণী ছিলেন। বল্‌তেন, আমরা নিজেরা যদি নিজদের সাহায্য না করি, তবে কে কর্‌বে? ভগবানের দিকে চেয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকাও যা, মরাও তা। কলেরা হলে ঔষধ না খেয়ে ভগবান বলে ডাকো দেখি, সারে কি না?

তাঁর কর্ত্তৃত্বাধীনে এবং জ্ঞানদায়িনী সভার সংশ্লিষ্টে 'বিপদের বন্ধু' নামে আমাদের একটী দল ছিল। কারো পীড়া বা কোন দুঃখকষ্টের সংবাদ পেলে, আমরা সাহায্যের জন্য ছুটে যেতাম। এমন ভাবে আমরা কলকাতার অলিগলিতে কত দুঃস্থ নরনারীকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করেছি। যদি গ্রহবৈগুণ্যে কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তা হ'লে আনন্দ-চিত্তে তার শব বহন করে শ্মশানে অগ্নিসাৎ করেছি, অথবা কবর দিয়েছি। কত দুঃখিনী বিধবাকে অর্থ সাহায্য করেছি, দরিদ্র ছাত্র-বন্ধুদের পাঠের সুযোগ করে দিয়েছি। 'বিপদের-বন্ধুগণ' প্রকৃতই বিপন্নব্যক্তির বন্ধু ছিল।

মাষ্টার মশায় সুন্দর কবিতা লিখ্তেন। আমাদিগকেও লিখ্তে প্রবুদ্ধ কত্তেন। তাঁর কল্যাণে আমার ও কবিতা মাঝে মাঝে মাসিকের কলেবরে স্থান পেয়েছে। ছাত্রমহলে আমার ও 'কবি' বলে একটু সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়্ছিল। অনেকে উপহাসচ্ছলে 'কবি' বলেই সম্বোধন কত্তো।

মাষ্টার মহাশয়, সকল ছাত্রকেই পুত্রবৎ স্নেহ কত্তেন কিন্তু আমার প্রতি ভালবাসার মাত্রা যেন একটু বেশী ছিল। তাঁর বাটীতে বেড়াতে গেলে শীঘ্র আস্তে দিতেন না। সংসারে স্ত্রী, আর একটী কন্যা। বিমলার বয়স তখন বছর ছয় সাত। বাসার কাছে বালিকা বিদ্যালয়। তৃতীয় ভাগ পড়তো। আমাকে পেলে, প্রায়ই সে তার বই নিয়ে আস্তো এবং যোগ বিয়োগ অঙ্ক কসিয়ে নিতো। দু একদিন বানান সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, আমার অভিজ্ঞতার পরীক্ষা কত্তো। পিতামাতার যত আদর তাতে যেয়ে একত্রীভূত হয়েছে, পোষাক পরিচ্ছদের অভাব নেই। আজ এ কাপড়, কাল ও জামা; মনে পড়েনা, তাকে কখনো এক পোষাকে দুদিনের বেশী দেখেছি। বেশ মেয়েটী।

শ্যামবাজারে ক্ষুদ্র একখানা একতালা বাড়ীতে মাষ্টারমশায় বাস কত্তেন। বাটীতে তিনটী মাত্র কক্ষ। তন্মধ্যে সম্মুখেরটী বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হতো। তার এক কোণে একটা টেবিল। কাছে দুটী আলমারি —পুস্তক রাশিতে ভরা। টেবিলের উপরে ও অযত্নবিন্যস্ত পুস্তকসমূহ এবং কাগজ পত্র। আমি মাঝে মাঝে সাজিয়ে গোছিয়ে দিতেম। তাঁর স্ত্রী তখন বিশৃঙ্খলতার উল্লেখ কল্লে, তিনি হেসে বল্‌তেন, নাও, ও সব আমার হয়ে ওঠে না। ও সব নিয়ে থাকৃতে গেলে, আর কিছুই হবে না। ক্ষুদ্র জীব যারা, তারাই এসব খুঁটিনাটি নিয়ে সময় কাটাক্।

সত্যই, আমরাও তাঁকে ক্ষুদ্র জীব মনে কত্তাম না। এমন কি হেডমাষ্টার রাধানাথ বাবু, যিনি পাঁচ শত টাকা মাহিনা পেতেন, তাঁকেও তাঁর তুলণায়, নিতান্ত ক্ষুদ্র ভাব্‌তাম। ছাত্রগণের উপর তাঁর অপরিসীম প্রভাব ছিল।

নীচাশয়তা, লঘুতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি দোষের তাঁর হৃদয়ে স্থান ছিল না। তাঁর কাছে আস্‌লেই, আমরা সাধারণ সংসারের কথা ভুলে যেতাম। বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত, প্রধান কবি, ভুবন-বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, পুতচরিত্র দানবীরগণ, মহাশক্তিশালী পুরুষ-প্রবরদের কথাই তখন শুন্‌তে পেতাম। যখন তাদের কথা বল্‌তে বল্‌তে ভাবে তন্ময় হয়ে পড়্‌তেন তখন তাঁর শ্মশ্রুবিমণ্ডিত বদনমণ্ডল এক অপূর্ব্ব আভায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠ্‌তো। তখন, অলক্ষিতে তাঁর হৃদয়ের ভাব-তরঙ্গ আমাদের প্রাণের ক্ষুদ্র দ্বারে এসে আঘাত কর্‌তো এবং সে সময় আমরা যে ক্ষুদ্র সামান্য শক্তিবিহীন স্কুলের ছাত্র ভুলে যেতাম।

* * * * *

বাল্যকাল হতেই আমার কেমন স্বভাব, লোকজনের হট্যগোলের ভিতর নিজপ্রভাব বিস্তার কত্তে পারি না। গল্প করবার, কি মজলিস জমিয়ে তুলবার ক্ষমতা আমার একেবারেই নেই।

জীবন

সত্যই, যতই বয়স বাড়ছে, ততই দেখ্‌ছি প্রকৃত সুখ যাহা, তার সাথে হট্যগোলের বিশেষ সম্পর্কও নেই। নির্জ্জন নদীতীরে, বিহঙ্গমের সঙ্গীতে, বৃক্ষলতাপাতার সৌন্দর্য্যে, বন্ধুর সহিত আলাপে, গৃহ-কোণে একাকী সদগ্রন্থ পাঠে যে আনন্দ অর্জ্জন করা যায়,—গোলমালের ভিতর তাহা অসম্ভব। সুখ,—অন্ততঃ আমার পক্ষে—নির্জ্জনতার ভিতর বাস কচ্ছে। আমার প্রাণের দেবতা হাঠের ভিতর আমার সাথে দেখা দিবেন না।

হিন্দু স্কুল হতেই এণ্ট্রেন্স উত্তীর্ণ হলেম। বাবার বড় আশা ছিল, বৃত্তি পাব, কিন্তু অল্প কয়েক নম্বরের জন্য লাভ কত্তে পাল্লেম না।

নিয়ম মত—কলেজে ভর্ত্তি হলাম। প্রিয়বন্ধু হেমচন্দ্রও পরীক্ষা পাশ করে, এক সেক্‌সেনেই ভর্ত্তি হলো।

জীবনের সে এক বিচিত্র সময়। কলেজের সর্ব্ব নিম্নের সিঁড়ীর কাছে দাঁড়িয়ে উর্দ্ধে প্রসারিত তেতালার সিঁড়ীর দিকে যখনি দৃষ্টি কত্তাম, তখনি এক মহা বিজয়-গৌরবের, দর্পের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌তো। অন্য মানুষ, বিশেষতঃ অন্যান্য কলেজের ছেলেদেরতো, তখন মানুষ বলেই মনে হতো না। কলেজে পড়ি, আমরা ও দশজনের একজন হতে চল্লাম, ভাবতেই উৎসাহ ও উদ্যমের ভাবে প্রাণ নেচে উঠতো।

মনে হতো, মানুষের অসাধ্য কিছুই নেই। এই কলেজেরইতো কত যুবক দেশের উপর সমাজের উপর কত চিহ্ন রেখে গেছে। সংসার তখন মহাসুখের স্থান মনে হতো। কষ্টের ভিতর কেবল মাত্র—পরীক্ষা। সে সাগর উত্তীর্ণ হয়ে অপর পারে পৌছিলেই আনন্দ, কেবল আনন্দ, মহা আনন্দ, অনাবিল আনন্দ! কৈশোর-সমাগমে জীবন এমনি লোভণীয় বলেই বোধ হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

স্কুল পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানদায়িনী সভার সহিত সম্বন্ধ এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই নূতন এক সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট হলাম। আমাদের ফার্ষ্ট ও সেকেণ্ডইয়ার ক্লাসের সংশ্রবে একটী সমিতি ছিল। তাহার নামটী একটু নূতন ধরণের—ফোর্টিন ক্লাব অর্থাৎ চৌদ্দজনের অধিক ম্যানেজিং কমিটীর সভ্যসংখ্যা ভুক্ত হওয়া নিয়মের বহির্ভূত ছিল। দুই ক্লাসের ছাত্রদের ভোট নিয়ে এই চৌদ্দজন সভ্য নিযুক্ত হতো। তন্মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সেক্রেটারী।

সভা হতে, দুই ক্লাসের ছাত্রদের অভাব ও অভিযোগের অনুসন্ধান হতো। ক্লাসের সহিত অন্য ক্লাস, স্কুল, কলেজ বা দলের ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার ম্যাচ ইত্যাদিও সভা কর্ত্তৃক নিরূপিত হতো। প্রয়োজন হলে, দরিদ্র ছাত্র-ভ্রাতাদিগকে ক্লাস হতে চাঁদা করে সাহায্য করা হতো। ছাত্রগণ মধ্যে কেহ পীড়িত হলে, সভ্যগণ মধ্যে কেহ যেয়ে তার সংবাদ নিতো এবং প্রয়োজন বিশেষে তার সেবা শুশ্রূষাও কত্তো। কোনও ছাত্র অন্যে ছাত্রের প্রতি দুর্ব্ব্যহার কল্লে, তার বিচার হত। দরকার হলে, কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচরেও তা আনা হত। মাসে কমিটীর তত্ত্বাবধানে সমস্ত ছাত্রগণের জেনারেল মিটিং হত। তখন নানাবিধ প্রবন্ধাদি পঠিত হত ও সমসাময়িক বিষয় সম্বন্ধে বাদানুবাদ debate হত। গ্রীষ্মাবকাশ ও পূজার বন্ধের পূর্ব্বে বিশেষ অধিবেশন হত। তখন সেক্রেটারী বিগত টার্ম্মের (term) কার্য্য সমূহের বিবরণ পাঠ কত্ত। মাসিক সভায় সভাকর্ত্তৃক নিযুক্ত সভাপতিই, প্রায় সচরাচর সভাপতির

আসন অলঙ্কৃত কত্তেন। কখনো বা কোন প্রফেসারকেও সভাপতির পদে সে-সময় বরণ করা হত।

দু এক সময়, কলেজ-গৃহছাড়া স্থানান্তরেও সভা আহুত হত। ছোটলাট স্বয়ং একবার আমাদের বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন।

কমিটীর সভ্য সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট থাকায়, সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত হওয়া ক্লাসের ছাত্রদের বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল। কতজন কত চেষ্টা করেও সভ্য পদলাভে ব্যর্থ হয়েছে।

ইহা ব্যতীত সমস্ত কলেজের ছাত্রদের নিয়ে আর একটী সমিতি ছিল। কলেজের সকল ছাত্রই এই সভার সভ্য। কিন্তু সে সভার ও কার্য্যকরী সমিতির সভ্য সংখ্যা চৌদ্দজন। তাহার নাম ছিল, কলেজ কাউন্সিল। এম, এ, ক্লাস হতে চার জন, বি এ ক্লাস হতে ছয় জন, ও এফ এ ক্লাস হতে চারজন, মোট চৌদ্দজন। যে দুজন যথাক্রমে এই সভার সভাপতি ও সেক্রেটারী হতো, তাদের আমরা মহা ভাগ্যবান মনে কত্তাম।

মনে করোনা, পরীক্ষায় যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার কত্ত, তারই সভাপতি পদে বরিত হবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। তা নয়। বরং ঘট্‌ত তার বিপরীত।

আমি যে বার ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ি, সেবার যিনি সভাপতি হয়েছিলেন, তার নাম জ্যোতিষবাবু। এম, এ ক্লাসে তখন তিনি পড়্‌তেন। পরীক্ষা ক্ষেত্রে তেমন সুবিধা কত্তে পারেননি। তার বিশেষ কারণও ছিল। লোকটী কিছু একগুঁয়ে ধরণের, যা একবার ভাল বলে বুঝ্‌বে বা ধর্‌বে কিছুতেই ছাড়্‌বে না। ফিলছফির প্রতি তার অত্যধিক অনুরাগ। ক্লাসে পাঠ্য ছিল, মার্টিনোর 'এথিক্স (Ethics)। জ্যোতিষ বাবুর সঙ্গে

মার্টিনোর মতের মিল হত না। তাই পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরে, মার্টিনোর মতের বিরুদ্ধে যা তা লিখে আসতেন। এমন কল্লে তো আর পরীক্ষায় নম্বর পাওয়া যায় না। বার বার দুবার ফেল হলেন। বন্ধুবান্ধবেরা কত বুঝাতো, তিনি তদুত্তরে বল্‌তেন, মিছাকথা কেমন করে লিখব। বুঝ্‌ছি মার্টিনোর মত সব বিষয়ে ঠিক নয়, তাও কি প্রশ্নের উত্তরে তাই লিখ্‌তে হবে, এ কেমন ব্যাপার? দুবার ফেল হওয়ার পর, মার্টিনোর কাছে, তার মত খণ্ডন করে এক লম্বা পত্র লিখে পাঠালেন। তিনি তদুত্তরে লিখ্‌লেন, আমি বৃদ্ধ হয়েছি, এখন তর্কের সময় নয়। তোমাদের ফিলছফির প্রফেসার মিষ্টার রায় আমার ছাত্র, তাকে আমার চিঠি দেখাইও, তিনি আমার মত বুঝিয়ে দিবেন। শেষে প্রফেসার রায়ের বিশেষ উপদেশানুসারে মার্টিনোর কথা লিখে পরীক্ষায় পাশ হলেন। এখন বুঝ্‌তে পার, কেমন লোকটা আমাদের সভাপতি ছিলেন।

তার মত, এ পর্য্যন্ত কোনও ছাত্রকে বাঙ্গলায় বা ইংরাজীতে এমন সুন্দর বক্তৃতা দিতে শুনেছি বলে মনে হয় না। তার ফুটবল ও ক্রীকেটে অপূর্ব্ব ক্রীড়াকৌশল,—ভাবতে ও স্ফূর্ত্তি হয়। তাদের বার যিনি বি, এতে ফাষ্ট হয়েছিলেন, সেই কোটরগতচক্ষু, অজীর্ণপীড়াক্লিষ্ট অস্থিচর্ম্মসার কৈলাস বাবুর পক্ষে কলেজ কাউন্সিলের সভাপতি হওয়ার আশা, আর বামনের চাঁদে হাত, একই প্রকার সম্ভব ছিল। সভাপতি তো দূরের কথা—বেচারী কাউন্সিলের সভ্যশ্রেণী ভুক্তই হতে পাল্লনা। আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় সভাপতির তুলনায়, তাকে এবং তারই ন্যায় পুস্তকের কীটসমূহকে আমরা মানুষই মনে কত্তামনা। যে, লোকের সহিত ভাল করে দুটো কথা বল্‌তে পারেনা, যৎসামান্য একটু ধাক্কা দিতে না দিতেই যে পড়ে যায়, এই অল্প বয়সেই দৃষ্টিশক্তির হীনতাবশতঃ

যার চশমা ব্যবহার প্রয়োজন হয়ে উঠেছে, অগাধ পাণ্ডিত্য তার মস্তিস্কের ভিতরই লুক্কায়িত থাক্, আমাদের তাকে দিয়ে কোনও প্রয়োজন নেই এবং কাউন্সিলেও তার স্থান নেই।

* * * * *

ক্লাসে বোধ হয় লোক-প্রিয় ছিলাম। তা না হলে, কেমন করে 'ফোর্টিন ক্লাবের' সেক্রেটারী হলাম, কেমন করেই বা আমাদের ক্লাস হতে কাউন্সিলের সভ্য মনোনীত হলাম?

আমার ঈদৃশ সফলতা লাভের অনেকটা কারণ বন্ধুবর হেমচন্দ্র। আমি যতই লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে না চাইতাম, সে আমাকে ততই জোড় করে তাদের ভিতর নিয়ে ফেলবেই ফেলবে। আমি বই নিয়ে বসে থাক্‌ব; সে হাত হতে কেড়ে নিয়ে যাবে। আমি খেলবনা; সে জোড় করে খেলাবে।

হেমকে আমি ভালবাস্‌তাম, বড়ই ভালবাস্‌তাম। তার কারণ বোধ হয়, আমাতে যা পেতাম না, তাতে তার পূর্ণ বিকাশ দেখ্‌তাম। আমি নম্র, অনেকটা লাজুক, কবিরই ন্যায় নীরবপ্রকৃতি, ধীর। হেম বলশালী, তেজস্বিতার আধার, তার হৃদয়-নিঃসৃত আনন্দধারা আমার প্রাণকে সঞ্জীবিত কত্ত। কথা বল্‌বে, তাও কেমন স্পষ্ট। যেন লোকের উপর আধিপত্য করবার জন্যই সে জন্ম গ্রহণ করেছে; সে যে কারো আজ্ঞা গ্রহণ কর্‌বে এমত নয়। সহধ্যায়ীগণ স্বেচ্ছায় তার হস্তে ক্ষমতা ধরে দিচ্ছে, অবনতমস্তক হচ্ছে, সে দয়া করে তাদের দিকে দৃষ্টি কল্লে যেন কৃতার্থ হচ্ছে।

সে যখন সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে ফোর্‌টিন ক্লাবের সভাপতি মনোনীত হলো, তখন সকলেই এক বাক্যে বল্‌তে লাগ্‌লো, সুরেশের সেক্রেটারী

হওয়াতো এখন অনিবার্য্য। ফলে, হলোও তাই। সে সভাপতি না হলে কি আমি সেক্রেটারী হতে পাত্তেম?

তখন ভেবেছিলাম, আমার উপর বড্ডই জুলুম হলো। বাপ মায় আদর আহ্লাদ ভোগ, রববার সমাজে গমন, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে কাব্যালোচনা, ও হেমের সঙ্গে সময় বিশেষে তর্ক বিতর্ক ও ভ্রমণ—জীবনটা বেশ যাচ্ছিল। এমন সুন্দর সুমোহন নির্জ্জনতার ভিতর হতে টেনে এনে সে কলেজের ছাত্রদের হট্টগোলের ভিতর আমায় ফেলে দিলে। এখন দেখ্‌ছি, ভালই করেছিল সে। পূর্ব্বে 'জ্ঞানদায়িনী' ও 'বিপদের বন্ধুদেয়' সম্পর্কে এবং এক্ষণে ক্লাবের সেক্রেটারীরূপে যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা লাভ কল্লাম, তা আজীবন আমার মহা উপকার সাধন করবে। জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে হলে, জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ দৈন্য হতে দূরে থাক্‌লে চল্‌বে কেন? শুধু তীরে বসে ফেণাঙ্কিত তরঙ্গের শোভা দেখলেই কি জীবনের প্রকৃত আনন্দের আস্বাদ পাওয়া যায়?

ফোর্‌টিন ক্লাবের সেক্রেটারীর পদ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে ক্লাবের নানা কাজে জড়িত হয়ে পড়তে লাগ্‌লাম। সহপাঠীগণের সমাগমে আমার পঠ-কক্ষ গম্‌ গম্‌ কত্তে লাগ্‌লো। মার প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে খান কয়েক চেয়ার ও ছোট ছোট বেঞ্চ ক্রয় করে এনে কক্ষটা সুসজ্জিত করে তুল্লাম। সেখানে বন্ধের দিবস মাঝে মাঝে আমাদের কমিটির সভ্যগণের মিলন হতো। কখনো কখনো বা কোন হোটেলে প্রীতি-সম্মিলন ভোজে মিলিত হতেম। যা তা খেতাম। মুরগী, গো-মাংস, বরাহ-মাংস কিছুই বাদ যেতনা। মাষ্টার মশায় বল্‌তেন, সব prejudice ছাড়, সব ছাড়, সব। তা না হ'লে North pole পার হবে কেমন করে?

* * * * *

এ সময় আমি কয়েকটী নূতন বন্ধুও লাভ কল্লাম। তন্মধ্যে ললিতচন্দ্র সর্ব্বপ্রধান। তার সহিত মিলনের প্রধান কারণ, তার কাব্যাশক্তি। সে আর আমি মিলে প্রায়ই নূতন নূতন কবিতা পাঠ কত্তাম। হেমও তাতে যোগ দিত। ইংরাজ কবিদের লেখা তেমন ভাল বুঝ্তে পাত্তামনা, তথাপি যতদূর সাধ্য আমরা কতক অর্থ পুস্তকের সাহায্যে, কতক নিজেদের চেষ্টায় অনেক কবিতা পড়ে ফেল্লাম। শেক্সপিয়ার ও শেলির যথেষ্ট চর্চ্চা হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের বিশেষ আদরের কবি ছিল—রবীন্দ্রনাথ। তার লেখার প্রধান গুণ, জীবনে মাধুর্য্য আনে, কিন্তু দুঃখের ভাব আনে না; শান্তি আনে কিন্তু বৈরাগ্য আনে না; পাঠে, ধীরে ধীরে জীবনের মহত্ত্বের ভাব জেগে ওঠে।

ললিতের পরই বঙ্কিমের নাম উল্লেখযোগ্য। তার ডাক নাম ছিল ব্যাঙ্গা। রাজসাহী জেলায় বাড়ী। গল্প জমিয়ে তুল্‌বার তার অপূর্ব্ব ক্ষমতা ছিল। সে ছিল আমাদের ক্লাসের গোপাল ভাঁড়। তার গল্প শুনে শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে আমরা গড়াগড়ি যেতাম। তার সদা মনে কাদা ছিলনা, শত্রু মিত্র জ্ঞান ছিল না, সকলেরই প্রতি সমান ব্যবহার।

আর একজন নরেন্দ্রনাথ। অতিশয় বুদ্ধিমান। আকৃতি প্রকৃতিও সুন্দর। আমরা জান্‌তাম, কালে সে নিশ্চয়ই বড় লোক হবে। প্রায়ই আমাদের বাটীতে বেড়াতে আস্‌ত। সে, হেম ও আমি তিন জনে মিলে ইডেন গার্ডেনে, গড়ের মাঠে বেড়াতে যেতাম।

আরো অনেকের সঙ্গেও বিশেষ-ভাবে পরিচয় হলো। দেখ্‌তাম, অধিকাংশই হট্টগোল পছন্দ করে। অর্থোপার্জ্জন ব্যতীত, জীবনের যে

অন্য কোনও উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা যেন কারো মনেই তেমন স্থান পেতনা। চাকরী যোগাড় করব এ ছাড়া কোনও (Hobbey) বাজে খেয়াল—একমাত্র যাহাই জীবনকে প্রকৃত মধুময় করে তোলে—কারো দেখ্‌তে পেতাম না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নলিনী আমার অপেক্ষা অনেক ছোট। অনেকটা মাতৃদেবীর অনুরূপেই প্রকৃতি তাকে গঠিত করেছিল। তাঁরই মত লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি, সদানন্দময়ী। সে বাবার বড় আদরের ছিল। আমিও তাকে বড় স্নেহ কত্তাম। সারাদিন আমার পাছে পাছে ঘুরে বেড়াত।

বাল্যকাল হতে বেথুন স্কুলে পড়্‌ছে। স্কুলের গাড়ী এসে তাকে প্রত্যহ স্কুলে নিয়ে যেতো। দেখতাম, ফুলের বাগানে সুশোভন গোলাপ ফুলটী সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে অন্যান্য সকলকে অনায়াসে পরাস্ত করে যেমন ফুটে থাকে, সেই প্রকার বালিকাদের মাঝে তার বদনকমল ও সৌন্দর্য্যে ঢল ঢল করে শোভা পেত। সে আমাদের গৃহের আনন্দ-প্রতিমা ছিল।

উভয়ে এক গৃহে বসেই লেখা পড়া কত্তাম। একই প্রাইভেট টিউটার উভয়কে পড়াত্তেন। কেন যেন, গিরীশ বাবুকে ভালই লাগ্‌তনা। অঙ্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং বি কোর্সের লোকের ন্যায়ই নিতান্ত রস শূন্য। আমাদিগকে সর্ব্বক্ষণই পাঠ নিয়ে ব্যস্ত রাখ্‌তে চেষ্টা কত্তেন। বাজে কথা প্রায় বল্‌তেনই না। তাঁকে দেখ্‌লেই, ভয়ে প্রাণ জড় সড় হয়ে আস্‌তো। শাসন ও ছিল বড় কড়া। বিশেষতঃ, এণ্ট্রেন্সে বৃত্তি

না পাওয়ার পর থেকে আরো কড়া হয়ে দাঁড়ালো। ভর্ৎসনার তো কথাই নেই, দুই এক সময়ে সদুত্তর না দিতে পাল্লে, চপেটাঘাত ও সহ্য কত্তে হতো। কাকে বল্‌ব? নলিনী আমার দিকে, আমি তার দিকে চাইতাম।

পিতৃদেব পূর্ব্বে একটু অধিক আদর দেখাতেন কিন্তু এখন হতে তিনিও মাষ্টার মশায়ের কড়া শাসনেরই পক্ষপাতী হয়ে দাঁড়ালেন। অন্যান্য সকল বিষয়েই পূর্ব্বের ন্যায় আদর পেতে লাগ্‌লাম কিন্তু পাঠ সম্বন্ধে কোনও প্রকার গাফিলতি, অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো।

মোটের উপর, ফল ভালই দাঁড়াতে লাগ্‌লো। গৃহে ভর্ৎসিত ও সময়ে বিশেষে রূঢ় বাক্য শ্রবণ কত্তে হতে সত্য, কিন্তু ক্লাসে প্রফেসারদের নিকট ভাল ছাত্র বলে প্রশংসা পেতে লাগ্‌লাম। দিন দিন ছাত্র মহলে ও প্রতিপত্তি বাড়্‌তে লাগ্‌লো।

আমার অপেক্ষা ও নলিনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবা ও মা বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা একমত হতে পাচ্ছিলেন না। মার ইচ্ছে কিছুকাল পাঠাভ্যাসের পর, কোন ও সৎপাত্র দেখে, তাকে দান করা। কিন্তু বাবার মত ছিল বিপরীত। তাঁর অভিলাষ, সে সুশিক্ষিত হয়ে, নারীসমাজের মুখোজ্জ্বল করে। যদি কপালে বিবাহ থাকে হবে, না থাক্‌লে, নয়। তজ্জন্য ভাববার বিশেষ কোনও কারণ নেই।

অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালিকা। অল্পায়াসেই পাঠ শিখে ফেল্‌ত। তা ছাড়া, কি সঙ্গীত, কি চিত্র, কি সূচীশিল্পে তার এমন একটা সহজ নৈপুণ্য ছিল যে সকল বিষয়েই ক্লাসের বালিকাগণ মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। তার প্রাইজের পুস্তকাবলী, বাক্স, আয়না, চিরুণী, পুতুল ইত্যাদিতে মাতৃদেবীর আলমারীর দুটী তাক ভরে গিয়েছিল।

শেষবার সে প্রাইজ নিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বাবার কোলে স্থাপন কত্তেই, তিনি গালে চুমা খেতে খেতে মাকে লক্ষ্য করে বল্লেন, এমন মেয়েকে কি না তুমি পড়্‌তে দেবে না ?

নলিনীর সঙ্গে তার সমবয়স্কা কয়েকটী বালিকা আমাদের বাটীতে খেল্‌তে আস্‌তো। প্রফুল্লবদনা সেই মেয়ে কয়টীকে দেখ্‌লে হৃদয়ে স্বতঃই প্রীতির ভাব জেগে উঠ্‌তো। কচি কচি মুখ, সংসারের কুটিলতার সামান্য রেখাটী পর্য্যন্ত নেই, যেমন মিষ্টি কথা, তেমন মিষ্টি ব্যবহার। তন্মধ্যে, তিনটীই বিশেষভাবে আমার মন আকর্ষণ করেছিল। একটী পিতৃদেবের বন্ধুবর (আমাদের জ্যাঠা মহাশয়) রমেশ বাবুর কন্যা—ইন্দিবর তুল্যা ইন্দিরা। দ্বিতীয়টী মৃণালকুমারী—প্রফেসার সতীশ বাবুর মেয়ে, রংটী তেমন ফরসা নয়, কিন্তু মুখখানা মধুরতামাখা। তৃতীয়টী নীলমণি বাবুর কন্যা—সরোজকুমারী। বেশ সুন্দর মেয়ে, সারাদিনই হাসি তামাসায় মত্ত, ক্ষণকালের জন্যও একস্থানে ঠিক হয়ে বসে থাকৃতে অশক্তা। নলিনীরই অনেকটা অনুরূপা। সে আসিত কচিৎ।

প্রায়ই বালিকাদের কলহাস্যে গৃহপ্রাঙ্গন মুখোরিত হতো। তারা মনের আনন্দে খেলা কত্তো, কোনও বিষয়ে মতভেদ হলেই আমার কাছে দৌড়িয়ে আস্‌তো। আমার বিচারের উপর তাদের বড় বিশ্বাস ছিল। তার কারণ বোধ হয়, হুকুমের বিরুদ্ধে আপিল করবার আর উচ্চ আদালত ছিল না।

তবে, ইতিমধ্যেই বালিকা মহলে পক্ষপাতিত্বের জন্য একটু নিন্দা বাহির হয়ে পড়ছিল। আমি নাকি প্রায়ই সরোজের দিকে রায় দিতাম। হতে পারে, কিন্তু হলেও আমার অলক্ষিতে হয়েছে।

বল্‌ব কি ? এমন লজ্জাই বা কি বল্‌তে ? সরোজকে বড়ই ভাল লাগ্‌তো। কেন, বল্‌তে পারি না। খুব যে সুন্দরী, তা নয় কিন্তু তার সচঞ্চল গমন, ফুট্‌ফুটে হাসি ও সর্ব্বক্ষণ আনন্দময় ভাব আমার মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট কচ্ছিল।

মনে করোনা, ইচ্ছা করে উপন্যাসের উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম। সুশ্রী, সুশীলা বালিকাকে ভালবাসা, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। সৌন্দর্য্য ও ভালবাসা—সংশ্লিষ্ট। বুঝিবা একই জিনীষের দুই নাম। হৃদয় যাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করেছে, কবে না-ভালবেসে পেরেছে ? বিশেষতঃ, আমি কবি বসন্তনাথের ভক্ত শিষ্য, মাধুর্য্যপ্রতিমা সরোজ যে আমার হৃদয় আকর্ষণ কর্‌বে, আশ্চর্য্য কি ?

ভাল লাগ্‌তো, তাই বলে ভেবোনা, তার জন্য পাগল হয়ে পড়েছিলাম। তা মোটেই নয়। সে আস্‌লে মনে আনন্দ হতো, চলে গেলে বিস্মৃত হতাম। একে ভালবাসা বল্‌তে হয় বল, না বল্লেও ক্ষতি নেই।

সত্যি কথা, উপন্যাস জগতে যাকে তোমরা ভালবাসা বল, তেমন কিছুর আমি ধারই ধারতাম না। প্রেমে পড়ার বয়স সে নয়। বিশেষতঃ, পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে কোনও নাটক নভেল তখনও আমাদের হাতে স্থান পায়নি। প্রাবৃটের সন্ধ্যায় ঘন কাদম্বিনী কোলে অকস্মাৎ যেমন সৌদামিনী চারিদিক সৌন্দর্য্যে বিভাষিত করে অন্তর্হিত হয়, সরোজের মুখখানিও সেই প্রকার হৃদয়ের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ক্রীড়া করে যেতো, এইমাত্র।

* * * * *

তখন হেমের জন্যই প্রাণ ব্যাকুল ছিল। প্রতিদিনই, তার সাথে দেখা হতো, একদিনের অদর্শনে আমি যেন পাগল হয়ে পড়তাম।

তাদের বাসা ছিল, বৌবাজারে ডিক্সেন লেনে। তার পিতা কাষ্টাম আফিসে কাজ কত্তেন। সেই উপলক্ষ্যে তারা বহুবৎসরাবধি কলকাতায় বাস কচ্ছে। তাদের বাড়ী ফরিদপুর জেলায় তেতুলিয়া গ্রামে। আমি ও নলিনী প্রায়ই তাদের গৃহে বেড়াতে যেতাম। নলিনীকে নিয়ে সে কত ঠাট্যা তামসাই কত্তো।

সে শৈশবেই মাতৃহীন। সংসারে বিমাতা। আমার মাকে মা বল্‌তো। দিবসের অনেক সময়ই তার, আমাদের গৃহে কাট্‌তো। আহারে, আনন্দে, খেলায়, গল্পে আমাদের সাথী ছিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

তখন বি, এ ক্লাসে পড়ি। নলিনী এণ্ট্রেন্স দিবে। হেম শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়্‌ছে।

খ্রীষ্টমাস, সারকাস, থিয়েটার, কংগ্রেস, কনফারেন্স উপলক্ষ্যে কলিকাতা সহর গুলজার। কিন্তু নলিনীর গল্প করবার ও অবসরটুক নেই। তার পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, সারাদিন পুস্তক নিয়েই আছে। হেম তাকে তদবস্থায় দেখে, মাঝে মাঝে হেসে হেসে বল্‌ছে, যেমন দেখ্‌ছি নলিন্! তুমি হেমচন্দ্র-পদক না নিয়ে ছাড়ছোনা।

কথাটা হচ্ছে কি, হেম তাকে কথাচ্ছলে একদিন বলেছিল যে সে যদি এণ্ট্রেন্সে বৃত্তি পায়, তা হলে তাকে 'রৌপ্য-পদক' উপহার দিবে। নলিনী কিন্তু সত্য মনে করে উত্তর কল্ল, দেখো হেম দা! কথা যেন ঠিক্ থাকে। তখন উপায়ন্তর না দেখে, অগত্যা হেম উপহার দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিল।

বাবা মাঝে মাঝে প্রায়ই ডেকে বল্‌ছেন, মা! এতো খেটো না। দেখো, শেষে শরীর খারাপ না হয়ে পড়ে। তা হলে সবই মাটী। কিন্তু নলিনী সে উপদেশে কর্ণপাত কচ্ছে না।

আমার থার্ড ইয়ার। চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রাতে উঠি, জলযোগান্তে কিছুক্ষণ পড়ি। কোন দিন দশটায়, কোন দিন বা একটার সময় কলেজে যাই। ঘণ্টা তিনেকের বেশী থাক্‌তে হয় না। বেশ আছি।

হেমের সঙ্গে এক্ষণ কচিৎ দেখা হতো। যেদিন সে কলেজ হতে ছুটী পেতো সে দিনটা তার সঙ্গে কত আনন্দেই চলে যেতো। মাঝে মাঝে ফুটবল ও ক্রীকেট ম্যাচ্ হচ্ছে। নিজে তেমন ভাল খেল্‌তে পারিনে বটে কিন্তু কলেজ টিমের জয়-পরাজয়ের চিন্তায় সর্ব্বক্ষণ বিভোর। এক্ষণ আমি কলেজ কাউন্সিলের সেক্রেটারী। প্রায়ই কাউন্সিলের অধিবেশন হচ্ছে। সে উপলক্ষ্যে সুরেন বাঁড়ুয্যের অনুকরণে গলা কাঁপিয়ে সভ্যগণের বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। কথনো বন্ধুগণ সহ গঙ্গা-ভ্রমণ। কথনো বা হেম ও আমি চন্দননগর, হুগলী, বর্দ্ধমান, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, ডায়মণ্ড হাড়বার ইত্যাদি স্থানে বেড়িয়ে আস্‌ছি। সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ, মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে কাব্যচর্চ্চা। তিনি কত নূতন ভক্ত শিষ্য পেয়েছেন, কিন্তু তথাপি আমাকে দেখ্‌লে যেন তার আনন্দ ধরত না। প্রায়ই বল্‌তেন, সুরেশ ও হেমের মত ছেলে আর পাব না। ওদের পড়িয়ে শিখিয়ে যেমন সুখ পাওয়া গেছে এমনটী আর হবে না। দু চারি কথার পরেই, তার নব-প্রকাশিত 'হিমাদ্রি' নামক কাব্যগুচ্ছ হতে আমি কবিতা আবৃত্তি কত্তে থাক্‌তাম। তখন তিনি আরও প্রফুল্ল হয়ে বল্‌তেন, দেখ, এসব কবিতায় যে এত সব ভাব নিহিত রয়েছে, পূর্ব্বে টেরই পাই নি। এ সময় ললিতের সঙ্গে মিলে কত বাজে পুস্তক ও কবিতা পড়ে ফেল্লাম তার

নির্ণয় নেই। বিশেষতঃ, শেলি, কীট্‌স, টেনিসেন ও ব্রাউনিং এর তো শ্রাদ্ধ করে ছাড়্‌লাম। রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নেই। যতই পড়ছিলাম, ততই তার প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। তার সমকক্ষ বুঝি জগতের কোনও কবিই নয়, তার তুলনা তাতেই মাত্র হয়।

পিতৃদেবের কারবার বেশ ভাল চল্‌ছে। মাঝে, মার শরীর একটু খারাপ হয়েছিল, এখন ভাল আছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, ভালবাসা,—যাহা জীবনপথ সরল ও সুধাময় করে, সকলই পূর্ণমাত্রায় গৃহে বিদ্যমান।

*　　*　　*　　*　　*

এমন সময়, আমাদের গৃহে একদিন একটী ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। তাকে পূর্ব্বে যে কখনও দেখেছি মনে হয় না। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, পিতৃদেবের পরিচিত।

সে-দিনই রজনীতে শুনতে পেলাম, তার পুত্রের সাথে নলিনীর বিবাহ প্রস্তাব চল্‌ছে।

বিহারী বাবু সব জজ। অবস্থা খুব যে ভাল এমত বলা যায় না, তবে নেহাৎ মন্দও নয়। তার পুত্র শেখরনাথ আমাদের কলেজের ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র। তাদের ইচ্ছা সে বি, এ পরীক্ষা শেষেই বিলাতে সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে যায়। তার পূর্ব্বে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে দেওয়ার প্রয়োজন। বিশেষতঃ, এই সুযোগে বিলাত যাওয়ার খরচটাও যোগাড় করার অভিপ্রায়।

আমি ত শুনেই অবাক। নলিনীর এইমাত্র চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স। নিতান্তই কচি মেয়ে, তার আবার বিবাহ!

বাবারও নিতান্ত অনিচ্ছা। কিন্তু মাতৃদেবীর অন্য মত। তিনি তাঁকে বুঝাতে লাগ্‌লেন, দেখ, মেয়ের বিয়ে, সোজা ব্যাপার নয়। শুধু

টাকাতেও হয় না, সুন্দরী হলেও হয় না। ভাল ঘর বর সব সময় ঘটে ওঠে না। দুদিন পরে তো বিয়ে দিতে হবেই, তবে ভাল ছেলে পেতে এখন দিতে আপত্তি কি? আর যদি, মেয়েকে শিক্ষা দিতে এমন ইচ্ছেই থাকে, তাতেও কোন বাধা হবে না। বিয়ের পরেই তো জামাই বিলেত চলে যাবে, ফিরে আসতে বছর তিনেক, এর ভিতর মেয়ের লেখাপড়ার যথেষ্ট সময় পাবে।

শেখরনাথকে আমি বেশ চিনতাম। খুব ভাল ছেলে। এক, এ তে জেনারেল স্কলার। তবে একটু যেন বেশী দাম্ভিক। বয়সে আমার অপেক্ষা বছর খানেকের বড়।

পরদিন মা আমাকে তার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কল্লেন। যতদূর জানতাম সব কথা তাঁর কাছে খুলে অকপটে বল্লাম। কথাশেষে মা কোনও উপলক্ষে তাকে আমাদের গৃহে আহ্বান করে আন্‌তে বল্লেন।

এক্ষণে, আমার পাঠ-কক্ষে কলেজের ছাত্রবৃন্দের মহা সমাগম। পরের রবিবারেই শেখরনাথ এসে উপস্থিত।

তখনও সে বিবাহের কথা বিশেষ জানেনা। বিলাত যাওয়ার সুখ স্বপ্নেই মগ্ন।

জলযোগের পর, তার সাথে মার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো। মাতৃ দেবীর ইচ্ছানুসারে আলাপের শেষভাগে নলিনী এসে উপস্থিত হলো। তাকে দেখে কে না মুগ্ধ হয়েছে? শেখরনাথ বারংবার তার দিকে অতৃপ্তনয়নে চাইতে লাগ্‌লো।

কতক্ষণ পরে সে চলে গেল। মার কথাবার্ত্তায় বুঝলাম তার ব্যবহারে বিশেষ প্রীত হয়েছেন। আমার যেন তেমন ভাল লাগ্‌ছিল না। কথাবার্ত্তায়, আগাগোড়াই সে জানাতে চেষ্টা কচ্ছিল যে তারা খুবই ধনী,

টাকা পয়সার কোনও চিন্তা নেই। সিভিল সার্ভিসে পাশ—সে আর কে ঠেকিয়ে রাখে? ক্লাসের অন্যান্য ছেলেরা? মানুষ তো কাউকেও দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ইত্যাদি ইত্যাদি।

যেমন কতকগুলি লতিকা আছে,—সূর্য্যরশ্মিতে মৃত প্রায় হয়ে পড়ে, আবার রজনী সমাগমে চন্দ্রের ম্লানমধুর কিরণে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, আমিও যেন তেমনি প্রখর চরিত্রের লোকের সম্মুখে নিতান্তই ম্লান হয়ে পড়তাম। বোধ হয়, এ কারণেই তাকে আমার ভাল লাগলো না।

বিধাতা বোধ হয় আমাকে বিভিন্ন উপাদানে গঠিত করেছিলেন। বাল্যকাল হতেই কলিকাতার হট্টগোলের ভিতর লালিত পালিত হচ্ছিলাম। দেখ্‌তাম, লোক সকল অর্থ নিয়েই ব্যস্ত, অন্য কোনও চিন্তাই যেন নাই। ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপ মহারথের চক্রের নীচে পড়ে কত দুর্ব্বল, নিঃসহায় লোক যাতনায় চীৎকার কচ্ছে, মর্‌ছে, তার দিকে কেহই একবার ভ্রমবশেও ফিরে চাচ্ছে না। সকলেই নিজ নিজ সুখ স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত, পরের চিন্তা করবার সময় নেই। এমন স্বার্থপরতা, এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব পূর্ব্বে ছিল না। নির্জ্জনে নিজ জীবন মুকুল ফুটিয়ে তুলব, নীরবে অবিচলিত একাগ্রতা সহকারে কর্ত্তব্য যা সম্পন্ন করে যাব, এভাব আর লোকের মনে স্থান পচ্ছে না। কিছু করি না করি, লোকের কাছে নিজের মহিমা প্রচার কত্তেই হবে—ইহাই বর্ত্তমান যুগের প্রধান লক্ষণ। শেখরনাথকে আর কি দোষ দিব?

সে দিবস রজনীতে পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর নলিনীর বিবাহ সম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। সেই পুরাতন ব্যাপার—মা বিবাহের পক্ষপাতী, বাবা বিপক্ষ।

অবশেষে অন্যত্র এ ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে তাহাই হলো—মাতৃদেবীরই জয় হলো।

সপ্তাহ মধ্যে বিবাহের তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। এণ্ট্রেসের তারিখ ২০শে ফাল্গুন, বি, এ পরীক্ষা হবে ১৫ই চৈত্র, বিবাহের তারিখ ৫ই বৈশাখ।

নলিনী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। বাবার ইচ্ছা ছিল, একবার তার মত জিজ্ঞাসা করে। মা বল্লেন, কচি মেয়ে, ওর আর মতই কি অমতই কি?

কিন্তু হঠাৎ যে দিন সে সংবাদ প্রচারিত হলো, তখন সে চন্দ্রবদনের উপর অকস্মাৎ কোথা হতে কালিমামেঘ এসে পড়্লো। তার সে সরল মধুর হাসি, যাহা সময়ে অসময়ে কারণে অকারণে দেখা দিয়ে গৃহ আনন্দোজ্জ্বল করে রাখ্তো, কোথায় অন্তর্হিত হলো। তা দেখে, আমার হৃদয়ে শেল সম বাজ্লো।

আমার একমাত্র ভগিনী—তাকে কত ভালবাসতাম। বাল্যকাল হতে একত্র লালিত পালিত হয়ে আস্ছি। কয়েক দিন পরেই আমাদের সহিত ছিন্ন হয়ে চলে যাবে, সেখানকার লোকজনের সুখে দুঃখে নিজকে সুখী বা দুঃখী মনে করবে, তাদের আজ্ঞা পালন করা, সুখ বিধানে যত্নপর হওয়াই তার জীবনের মূলমন্ত্র হবে—ভাব্তেও প্রাণ আকুল ব্যাকুল হয়ে উঠ্ছিল। সর্ব্বাপেক্ষা, তার ম্লান মুখখানা আমার হৃদয়ে বড় ব্যাথা দিচ্ছিল।

*　　*　　*　　*　　*

চৈত্রমাসের শেষ ভাগ। নলিনীর পরীক্ষা হয়ে গেছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্ছে। বেলা পড়ে আস্তে না আস্তেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন করে

ঝড় দেখা দিয়েছিল। এক্ষণে ঝড় থেমেছে কিন্তু বারিপতন সম্পূর্ণ থামেনি। ধীরে ধীরে বৃষ্টি পড়্ছে, আমাদের পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীটের উভয় পার্শ্বের অট্টালিকাগুলি যেন বিনা আপত্তিতে সেই বারিধারা স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করে দণ্ডায়মান, মাঝে মাঝে বা বাতাসের দুই একটী উচ্ছ্বাস উঠে জানালা কপাট চৌকাঠ আক্রমণ কচ্ছে, কচিৎ বিদ্যুৎ চম্‌কে যাচ্ছে এবং চারিদিক আঁধার করে আকাশের উপর দিয়ে মেঘের পর মেঘ ছুটে যাচ্ছে—প্রকৃতির কেমন এক অপূর্ব্ব গম্ভীর অথচ লীলাময় ভাব।

এসব সময়েই কাব্যসুন্দরী ভক্তের হৃদয়পদ্মে স্বীয় রক্তচরণ স্থাপন করেন। কিন্তু আমি আজ কবিতার কথা ভাব্‌ছিলাম না। বুঝি, কিছুই ভাব্‌ছিলাম না। কিন্তু কেন যেন, মন বিষাদ-ক্লিষ্ট হয়ে উঠ্‌ছিল। জীবন যে নিতান্ত নশ্বর, সুখ যে নিতান্ত ক্ষণধ্বংসী,—সে সকল কথাই থেকে থেকে হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ছিল।

আমার দুঃখ কিসের? ধনীর সন্তান, পিতামাতার আদরের একমাত্র পুত্র, গিরীশ মাষ্টারের তাড়নার কল্যাণে এক্ষণে লেখা পড়াতে ও ক্লাসের অন্যান্য ছাত্রদের পশ্চাৎপদ নই, লোকের মুখে শুনি সুন্দর ও বুদ্ধিমান, কলেজ কাউন্সিলের কার্য্যতৎপর সেক্রেটারী—আমার মনে এ সকল ভাব কোথা হতে স্থান পেল?

কৈশোর ও যৌবন—দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী সময়টী এক অতি আশ্চর্য্য কাল। এখান হতে দুটী পথ—একটী সংসারের দিকে—অর্থলাভ, রাজ্যলাভ, যশোলাভের দিকে; অন্যটী ভাবের পথ, শান্তি-অভিমুখী।

প্রাণ আমাকে অলক্ষিতে শেষোক্ত পথের দিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। পিতামাতার বড় সাধ ছিল, বিদ্বান্ হব, অর্থোপার্জ্জন কর্‌ব। আমার মন কিন্তু অর্থ-চিন্তায় কখনও আলোড়িত হত না।

বিশেষতঃ, আজ এই ম্লান সন্ধ্যায় অর্থ ও যশ অপেক্ষা শান্তিই অধিকতর কাম্য বলে বোধ হচ্ছিল। পার্থিব সুখের ক্ষণভঙ্গুরত্ব ভাবটাই যেন হৃদয়কে আলোড়িত কচ্ছিল।

বসে বসে ভাব্ছি, এমন সময় পশ্চাৎ হতে কে ডাক্‌লো, দাদা! চেয়ে দেখ্‌লাম,—নলিনী।

কই, আমার সদানন্দময়ী ভগ্নীর ওষ্ঠাধরে সেই হাসি কোথায়? চাহিতেই প্রাণ সমবেদনায় কেঁদে উঠ্‌লো। আমি যেন হৃদয়াভ্যন্তরে স্পষ্ট অনুভব কচ্ছিলাম কি এক মহাকষ্টে মহাবিপদে পড়ে, সে আমার কাছে সাহায্যের জন্য উপস্থিত হয়েছে।

সম্মুখস্থ চেয়ারে এসে সে ধীরে ধীরে উপবেশন কল্ল।

আমি বল্লাম, নলিন্, কেন ডাক্‌ছিস্?

আমতা আমতা করে কি যেন কি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু অবশেষে কিছুই বল্‌তে পাল্লো না। সে কেঁদে ফেল্লো।

তার চক্ষে জল দেখে, আমার চক্ষুও জলে ভরে উঠ্‌লো। বসনাঞ্চল সাহায্যে, তার চক্ষুজল মুছিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম, কেন নলিন্, কেন কাঁদছিস্?

সে আর কিছুই উত্তর কত্তে পাল্লনা। আমার স্কন্ধে মাথাটী রেখে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদতে লাগ্‌লো।

আর দিন কয়েক পরেই তার বিবাহ। জীবনের মহা আনন্দের দিন সমীপবর্ত্তী। কোথায় তার হাসির ঝঙ্কারে গৃহ মুখরিত হবে, তা নয় কি না সে কেঁদে আকুল হচ্ছে।

কিছু বল্লোনা সত্য কিন্তু তার ক্ষুদ্র হৃদয়নিঃসৃত যে বেদনাতরঙ্গ এসে আমার হৃদয় দ্বারে আঘাত কচ্ছিল, তাতেই যেন তার দুঃখের কারণ

বুঝ্‌তে আমার অধিক বিলম্ব হলোনা। তাকে উদ্দেশ করে বল্লাম, নলিন্! তোমার কি এ বিবাহে মত মত নেই? কেন? বাবা মা সম্বন্ধ ঠিক করেছেন, শেখরনাথ বড় লোকের ছেলে, ভাল ছেলে, সুন্দর চেহারা, শীগ্‌গিরই ম্যাজিষ্ট্রেটী পরীক্ষা পাশ করে আস্‌বে, তোমার মত ভাগ্য কার?

বাঁধা যেন কেটে গেল। দু-একবার আম্‌তা আম্‌তা করে শেষে সে বল্‌লো, আমার এসব ভাল লাগ্‌ছেনা। এখন বিয়ে দিওনা তোমরা, দাদা! দিওনা, দিওনা।

চতুর্দ্দশ বৎসরের বালিকা। সব কথা ভাল করে বোঝেনা, অথচ একেবারে ও যে না বোঝে এমত ও নয়। আমার মনে হচ্ছিল, হয়তো বা অন্য কাউকেও ভালবেসেছে। তাই, জিজ্ঞাসা কল্লাম, নলিন্, খুলে বল্‌তো, তোর এ বিবাহে মত নেই কেন?

সে উত্তরে বল্ল, দাদা! পায়ে পড়ি তোমাদের, আমায় এ বিপদে ফেলোনা।

আমি তাকে বারংবার জিজ্ঞাসা কত্তে লাগ্‌লাম। সে কেঁদে কেঁদে একই উত্তর দিতে লাগ্‌লো।

তখন আমিও অল্প বয়স্ক যুবক। এসব বিষয়ে পুঁথিগত বিদ্যা ছাড়া অন্য বিশেষ কিছু জ্ঞান নেই। মনে হলো, শেখরনাথ তার তেমন মনোমত হয়নি।

আমার মন ও যেন তার প্রতি তেমন আকৃষ্ট হচ্ছিল না অথচ কেন এমন হচ্ছিল, বুঝ্‌তে পাচ্ছিলাম না। মানবহৃদয় দুর্জ্ঞেয়। বাহির হতে মনে হয়, চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই মন সর্ব্ববিষয়ের গুণাগুণ বিবেচনা করে কিন্তু হৃদয়-সম্বন্ধে বুঝি এ নিয়ম খাটে না।

অনেক লোক দেখেছি, ব্যবহার ভাল, কথা সুমিষ্ট, স্পষ্টতঃ যার সম্বন্ধে কিছু দোষের দেখ্‌তে বা শুন্‌তে পাইনা অথচ তার দর্শনলাভ হতেই কি যেন কি প্রাণের ভিতর হতে বলে ওঠে, না, না এ তোমার নয়। শেখরনাথ সম্বন্ধে ও আমার মনের অনেকটা ঈদৃশ ভাব। বিশেষ কোনও দোষ খুঁজে পেতাম না অথচ তাকে দেখ্‌লে কেন যেন কোথা হতে হৃদয়ে অশান্তির ছায়া এসে পতিত হতো। তাকে আমার যেমন ভাল লাগ্‌ছিল না, মনে হচ্ছিল সেরূপ সে নলিনীর ও বুঝি চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয় নি।

বুঝিতেছিলাম, আমার ভগ্নীর এ বিবাহে একেবারেই মত নেই। পিতৃদেবকে এ বিষয় জানান অসম্ভব। ভাব্‌লাম, মাকে বল্‌বো। কিন্তু বলি বলি করে পাঁচ ছয় দিন চলে গেল।

এদিকে, বিবাহের আয়োজন সমারোহের সহিত চল্‌তে লাগ্‌লো। অন্যদিকে, আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, হাস্যময়ী নলিনী দিনের পর দিন ম্লান হতে লাগ্‌লো।

অবশেষে সাহসে ভর করে মাকে সব কথা খুলে বল্লাম। তিনি হেসে এক প্রকার পরিহাসচ্ছলে বল্লেন, একটুখানি মেয়ে, এসব বিষয়ে ভাল-মন্দ ও কি বুঝ্‌বে? এ সকল নভেল নাটকের দিনে ছেলেমেয়ে-গুলির মাথা বিগ্‌ড়ে যাচ্ছে। তুই তোর বই নিয়ে থাক্‌, এ-সব চিন্তা না কল্লেও চল্‌বে।

তাঁর কাছে কোনও প্রকার সুবিধা না পেয়ে আমার মনটাও যেন একটু বিদ্রোহের ভাব ধারণ কল্ল। কিন্তু কি আর কর্‌বো? আত্ম-সম্মানে আঘাত-প্রাপ্ত হয়ে, মনের দুঃখে বৈকালে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে চলে গেলাম।

ভাব্তে ভাব্তে এক একবার মনে হতে লাগ্লো, তাইতো, নলিনীর এত আপত্তিই বা কেন? সে বোঝে কি? বাপ মার কোল ছেড়ে, অন্যগৃহে যেতে প্রাণ এমন সকলেরই কাঁদে। হিন্দুর মেয়ে, যার সাথে বিয়ে হবে, তাকেই ভক্তি কত্তে, ভালবাস্তে হবে। তখনই, আবার নলিনীর মুখ-খানা ও অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় মনে পড়লো। কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিলাম না।

পরদিন, মাতৃদেবীর ইচ্ছানুসারে শেখরনাথ আমাদের বাটীতে এসে উপস্থিত। কেমন দিব্যি চেহারা!

আমার ভগ্নী অপরূপা সুন্দরী, মাধুর্য্যপ্রতিমা। অন্য হলে তার মত রূপে গুণে অনুপমা স্ত্রী-লাভ কত্তে পেলে নিজ্কে কৃতার্থ মনে কত্তো। শেখরনাথ ও যে মুগ্ধ হয়নি, এমত নয়। তথাপি তার কথাবার্ত্তায়, চাল-চলনে ইহাই সে প্রকাশ কচ্ছিল যে তার মত বালিকাকে গ্রহণ করে, তার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি সে নিতান্তই অনুগ্রহ দেখাচ্ছে।

আমার সাথে, নিতান্ত মুরুব্বিয়ানা ভাবে কথা বল্তে লাগ্লো, হেমের প্রতি ও অনেকটা ভদ্রূপ। অথচ মাত্র আমার উপরের ক্লাসেই পড়্ছে।

সে চলে গেলে, হেম আমাকে উদ্দেশ করে বল্লে, দেখেছ ভাই, কি আত্মম্ভরিতার ভাব। যাই বল সুরেশ! তোমার ভবিষ্য ভগ্নীপতি সম্বন্ধে তোমাকে কনগ্রেচুলেট্ (Congratulate) কত্তে পাল্লুম না।

আমার ও তাই মত। আর নলিনী? তারতো এবিবাহে সম্পূর্ণ অমত। অথচ, মার যেন সে-দিকে একেবারেই লক্ষ্য নেই। আমরা একপ্রকার বালক, বোধ হয়, এসব বুঝিনা। মার বিচার শক্তিতে আমার অটল বিশ্বাস। মনকে প্রবোধ দিলাম, তিনি যা কচ্ছেন, ভালই কচ্ছেন।

আমিও হেম বসে আলাপ সালাপ কচ্ছি, এমন সময় কোথা হতে হঠাৎ নলিনী এসে উপস্থিত। তাকে লক্ষ্য করে হেম হেসে বল্ল, কই নলিন্!

আমাদের মিঠাই কোথায় ? ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বৌ-হতে চল্লে, দেখো, আমাদের খাবারটা যেন ভুলে যেওনা।

'যাও' বলে নলিনী নিমেষে অন্তর্হিত হলো। দেখ্‌লাম, তার নয়ন-প্রান্তে অশ্রুবিন্দু উথ্‌লে উঠেছে।

তবে কি সত্যই নলিনীর প্রাণ অন্য কাকেও বরণ করেছে ? কে স ?

সেই মুহূর্ত্তে হেমের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। এ কি ?—দেখ্‌লাম, কে যেন তার বদন কালিমায় ঢেকে দিয়েছে! তন্মুহূর্ত্তে তার বদনের ভিতর এমন কি দেখ্‌লাম, যেন সকল কথা নিমেষে আমার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয়ে পড়লো।

তাই কি ? তাই কি ?—কিন্তু হায়! তাতো আর হবার নয়! নয় কি ?

বিবাহের আয়োজন মহা আড়ম্বরের সহিত চলতে লাগ্‌লো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মের আমি বিশেষ ধার ধারতামনা। তবে দেখ্‌তাম সৎভাব দ্বারা প্রাণ যে ভাবে আকৃষ্ট হতো, কুভাব বা কুকার্য্যের দ্বারা তেমন নয়।

বাল্যকাল হতেই পিতামাতার সঙ্গে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ব্রাহ্মসমাজে যেতাম। কিন্তু মনে পড়েনা, সেখানে এমন কিছু দেখেছি যার দ্বারা আমার মন ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। সুসজ্জিত কক্ষে উপবেশন পূর্ব্বক নিয়মিত সময়ে সঙ্গীত ও বক্তৃতা শ্রবণ, আচার্য্যের ইঙ্গিতানুসারে সকলে মিলে এক সময়ে এক ভাবে উপাসনা করা ও চক্ষু নিমীলন ও

উন্মীলন করা—দৃশ্যটী ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্য্যাবলী ক্রমে ক্রমে নিতান্তই পুরাতন হয়ে পড়েছিল। শেষে মনে হতো, উহার ভিতর বিশেষ কিছু সার নেই। ধর্ম্মের যাহা প্রধান অঙ্গ, হৃদয় ব্যাকুলতা—তাহা সেখানে তেমন দেখতে পেতেম না। যা কিছু দেখতাম স্ত্রীলোকদের ভিতর কিন্তু তাহা আমার হৃদয়কে আকর্ষণ কত্তো না। কে কবে সভা-সমিতি করে, বক্তৃতা করে ভগবানকে লাভ করেছে ?

যাই হোক, ব্রাহ্মসমাজে গমন করার জন্য অথবা অন্য যে কারণেই হোক—আমি যখন এফ, এ, ক্লাশে পড়্ছি, তখন কোথাহতে হৃদয়ে এক ব্যাকুলতার ভাব এসে দেখা দিল। বোধ হয়, এই ভাব এসেছিল বলেই, কোন বিপথে গমন করা সম্ভবপর হয়নি। ধর্ম্মই বুঝি আমায় তখন সৎপথে ধরে রেখেছিল।

আমি ভগবানকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠ্লাম। ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা পদ্ধতিতে আমার তেমন আস্থা ছিলনা কিন্তু তা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। পূর্ব্বে উপাসনায় তেমন যোগ দিতাম না কিন্তু এখন হতে প্রার্থনাকালীন আপনা হতেই নয়নদ্বয় বুজে আস্তো। স্বগৃহেও রজনী সমাগমে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে আস্তো তখন কক্ষের আলো নির্ব্বাপিত করে, কপাট বন্ধ করে, স্বীয় শয্যার উপর জোড়াসন ভাবে উপবিষ্ট হয়ে, নিমীলিত নেত্রে ভগবানের উদ্দেশে ব্যাকুল-প্রাণে প্রার্থনা কত্তাম। কোনও দিন বা ঘণ্টা খানেক, কোনও দিন বা ততোধিক কাল এভাবে চলে যেতো।

এ অবস্থায় ভাব্তে ভাব্তে এক এক সময় মনে হতো, এই বুঝি বা কি জানি কি জীবনের গূঢ়রহস্য সমূহ আমার নিকট সরল সহজভাবে ব্যক্ত হয়ে পড়্লো, এই তো আঁধারের ভিতর আলোর ন্যায় চক্ষের

কাছে কি দেখ্‌ছি,—কিন্তু কই, কিছুই না,—চক্ষু মেল্‌তেই দেখতাম, গাঢ় অন্ধকার, আমি যথায় তথায়, পূর্ব্বেও যা এখনও তাই।

জীবন দিন দিন লক্ষ্যশূন্য বোধ হতে লাগ্‌লো। এক এক সময়ে মন বিদ্রোহভাব ধারণ কত্তো। ভগবানকে ডাকার প্রয়োজন কি? তিনিই না কি আমাকে ও সমস্ত জগৎকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি ব্যতীত যখন অন্য সৃষ্টি কর্ত্তা নেই, তখন আমার পাপ, আমার ভিতর যা মন্দ, যার জন্য নাকি আমাকে এ জন্মে ও পর জন্মে কষ্ট পেতে হবে,তা সবইতো তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাই যদি হলো, তা হলে পাপ পুণ্যের জন্য আমি কেন দায়ী হব? যদি কাকেও দায়ী হতে হয়, তবে ভগবানই হবেন। এ সামান্য বিষয়, এসব সরল যুক্তি, সকলেই বোঝে কিন্তু যারা দার্শনিক, ধর্ম্মগুরু তারাই বোঝে না। ইচ্ছা করেই যেন বুঝতে চায়না। তা হলে আর বিদ্যার দৌড় দেখানো হল কৈ, বাহাদুরী হল কৈ? মাষ্টার মশাই ঠিক্।

আর কেমন করেই বা বল্‌বো ভগবান আমাকে সৃজন করেছেন। তা হলে যে সংসারে দুইটী পৃথক সত্তা হলো, ভগবান ও আমি। তবে কি ভগবান সীমাবদ্ধ? তাই বা কি প্রকারে সম্ভব?

কোনও প্রশ্নেরই সদুত্তর না পেয়ে আমি গোলকধাঁধায় ঘুর্‌তে লাগ্‌লাম এবং উপায়-বিহীন হয়ে বিশেষ যত্নের সহিত আবার ভগবানকেই ডাক্‌তে লাগ্‌লাম।

এমন ভাবে অনেকদিন চলে গেলো।

সে-দিন আমাদের ক্লাসের কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে শুন্‌তে পেলেম যে কলকাতায় সম্প্রতি ভারত-বিখ্যাত একজন সাধু আগমন করেছেন।

ইতি পূর্ব্বে ও অনেক সাধু দর্শন করেছি কিন্তু কেহই আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ কত্তে সক্ষম হননি। হিন্দু সাধুগণ, অন্ততঃ যারা সমাজে

বিশেষ ভাবে পূজা পেয়ে থাকেন—প্রায়ই ব্রাহ্মণ। তারা যতই কেন বড় সাধু না হৌন—জাত্যাভিমান ভুল্‌তে পারেন না। মুখে যতই কেন বিশ্ব-প্রেম ও হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্বন্ধে বড় বড় কথা না বলেন,—কাজের বেলা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচারেই সমুৎসুক। শঙ্করাচার্য্য হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান কালের ছোট বড় সমাজ সংস্কারকের মনে ঐ এক ভাব—ব্রাহ্মণ ভগবানের বিশেষ আদরের পাত্র এবং অন্যান্য জাতি তাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এমন কি, রাজা রামমোহন, উদার ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক—তাঁরা ও এ মোহের হাত সম্পূর্ণরূপে এড়াতে পারেন নি।

শুন্‌তে পেলেম, যে সাধু সম্প্রতি দেখা দিয়েছেন, তিনি কতক দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, এক্ষণে পুনঃ হিন্দুধর্ম্মের অনেক আচারও পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। পূর্ব্বে হিন্দুদিগের ভিতর তার নিন্দুকের সংখ্যা ছিল না, কিন্তু যেই তিনি ব্রাহ্মসমাজ হতে সরে দাঁড়িয়েছেন, অর্থাৎ মনুষ্যত্বের সোপানে নীচে নেমেছেন, অমনি শিষ্য সংখ্যায় দেশ ভরে উঠেছে।

রজনী আগত-প্রায়। এমন সময় কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের সেই দ্বিতল বাটীতে, যে খানে সাধু বিশ্বনাথ বাস কচ্ছেন, সেখানে যেয়ে হেমও আমি উপস্থিত হলেম।

দেখ্‌লাম কক্ষাভ্যন্তরে ও সম্মুখস্থ বারেন্দায় বিস্তর লোক, উপবেশন করবার স্থানটুকুও পাওয়া কষ্টসাধ্য।

সাধু, মৃগ চর্ম্মোপরি উপবিষ্ট। মাঝে মাঝে ভক্তবৃন্দের সাথে কথা বল্‌ছেলেন।

তিনি সপরিবারেই বাস কচ্ছেন। কিছু দিন হলো তীর্থভ্রমণে

গমন করেছিলেন—সে সম্বন্ধে আলাপ হচ্ছিল। ভক্তবৃন্দ সুধাবিন্দুর ন্যায় তার বাণী পান কচ্ছিল।

কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে গেলে তার দর্শনে আমার পাষাণ হৃদয়ে এক বিন্দুও ভক্তি-ভাবের উদ্রেক হলো না। বরঞ্চ তার জড়াগ্রস্ত দেহ, যাকে নিয়ে তিনি নিতান্ত বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন,—জটাজুট-ধারী মস্তক, মলিন গৈরিক বসন—আমার হৃদয়ে তার প্রতি দুঃখের ভাব জাগিয়ে তুলছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল—বেচারীর কেন এ দুর্দ্দশা? ভগবানকে লাভ কত্তে হলে, শরীরকে এভাবে রাখার কি দরকার? পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাক্‌লে, মাথার কেশ কর্ত্তন করে তাকে পরিষ্কার রাখ্‌লে, শুভ্র বসন পরিধারণ কল্লে কি তাকে পাওয়া যায় না?

পোষাক পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি কল্লে, হৃদয়ে সৎভাব সমূহ না কি উদ্বোধিত হয় না। সৎভাব কাকে বল্‌ব? কে সৃষ্টি করেছে? ভগবান। কুভাব কাকে বল্‌ব? কে সৃষ্টি করেছে? ভগবানই নয় কি? সৎভাবের চর্চ্চাতেই তাকে পাওয়া যাবে, কুভাবের চর্চ্চায় নয় কেন? তিনি না কি শুদ্ধং অপাপবিদ্ধং। তবে সংসারে পাপ এলো কোথা থেকে? হয়, পাপ অন্যের সৃষ্টি, যার সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেন না, নয় পাপ পুণ্য কিছুই নয়। আর সৎভাবই বা কি? সত্য কথন, জীবনের নশ্বরতা অনুভব, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম। কে বল্ল, সত্য কথা বলাই পুণ্যের কাজ? মিথ্যা—পাপ? এই মিথ্যাকথা বলার প্রবৃত্তি আমায় হৃদয়ে কে দিয়েছে ভাই? ভগবান নয় কি? এমন ভাবে আমার হৃদয়ে এসব কুভাব প্রবেশ করিয়ে দিয়ে, এক্ষণে আবার তিনি তার নাম শুনতে পারেন না কেন? মিথ্যাকথা, কপট ব্যবহার, রাজনীতির মূল ভিত্তি, ভেবে দেখ্‌লে দেখা যাবে সমাজ-নীতিরও। সমস্ত সভ্য

সমাজই দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার রূপ ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কে বল্লে দয়া পুণ্য? কে বল্লে—প্রেম-ভাবই মহৎ ভাব। দয়াতো অনেক স্থলেই দৌর্ব্বল্যের রূপান্তর মাত্র।

আর এ দেহ, যাকে ধারণ করে বেঁচে আছি, কিছুই নয়? তার সুখ সাচ্ছন্দতা কি চিন্তার বিষয়ই নয়? 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্—মহাকবির এ-উক্তি কি সম্পূর্ণ মিথ্যা?

ভগবান্? কি লাভ তাকে পেয়ে? কি হবে তাকে লাভ কল্লে? না কল্লেই বা কি ক্ষতি?

ভক্তবৃন্দ তার কথা অমৃত জ্ঞানে পান করে আনন্দে গদ গদ হয়ে উঠ্ছিল। ভগবানের নাম কীর্ত্তন কত্তে কত্তে তিনি মাঝে মাঝে বিভোর হয়ে পড়ছিলেন। তিনি বল্ছিলেন, বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ কর। মায়ামোহ পরিত্যাগ কর, দারা পুত্র কে কার? সংসার-বিরাগী হয়ে ভগবানের নাম কীর্ত্তনে দিন-যাপন কর। এ সংসার কয়দিনের, দেহের এ সুখ-সম্ভোগ কয়দিনের, সব মিথ্যা সব মিথ্যা, ভগবানই সার, তাঁর প্রাপ্তিতেই জীবের মুক্তি।

বলে কি লোক্টা? এই যে কলকাতা সহর, ব্যবসা বাণিজ্য, জ্ঞান বিজ্ঞান, ধন-ঐশ্বর্য্য, মোট কথা মানব-সভ্যতা, অসংখ্য যুগের অসংখ্য নর নারীর সমবেত যত্নে যা ফুঠে উঠেছে—এসব কিছুই নয়? বনে যেয়ে নয়ন মুদ্রিত করে ভগবান ভগবান করাই একমাত্র সার? বলি, হে সাধু! সকলে যদি সংসার ছেড়ে চলে যায়, তা-হলে তোমার আহার জুট্বে কোথা থেকে? তোমার স্ত্রী-পুত্রের এমন চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের বন্দোবস্ত হবে কোথা থেকে? বেশ তুমি নিরলস, নিষ্কর্ম্মা হয়ে ভগবানে ভগবান করো আর সংসারের সকল লোক তোমার ও তোমার পরিবারবর্গের আহার

যোগাড় করুক। এ ভাবে আহার কত্তে লজ্জা বোধ হয় না কি তোমার?

ভগবান লাভ কি একটা পীড়ার চিকিৎসা বিশেষ? যেমন জ্বর রোগে উপবাস প্রয়োজন, কুইনাইন সেবন কত্তে হয়, তেমন যাকে ভগবান লাভ কত্তে হবে, তাকে ও শরীরকে নানা ভাবে কষ্ট দিতে হবে? সাধুর উপদেশ আমার ভাল লাগ্‌ছিল না।

ঘণ্টা দুই চলে গেল। কতকক্ষণ পর হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হলো। পাড়ার যতলোক এসে জড়ো হলো। লম্ফে ঝম্পে, নৃত্যে, চীৎকারে, মৃদঙ্গ ও করতাল ধ্বনিতে গৃহ প্রকম্পিত হতো লাগ্‌লো। আমরা চলে এলাম।

বাহিরে আস্‌তেই হেম আমাকে উদ্দেশ করে বল্ল, কি হে কেমন লাগ্‌লো?

আমার নিকট কোনও উত্তর না পেয়ে সে আবার বল্ল, কিছুই যে বল্লে না। ভাল নয় বুঝি? তোমাকে সন্তুষ্ট করা দুষ্কর।

সত্যই সাধুকে আমার ভাল লাগেনি। সংসার যে অসার এ কথাতো সহস্র সহস্র বছরই এদেশে উচ্চারিত হয়েছে, ফলে সংসার আমাদের অসারই হয়েছে। নূতন বাণীতো কারো কাছেই শুন্‌লামনা। সংসার সার এবং সংসারে থেকে তার সর্ব্ববিধ উন্নতি-সাধন কর এতো কেহই বলে না। অথচ সংসারে সকলেই আছি। সাধু বনে চলে যান। কয়েক দিন পরেই আবার সংসারে এসে উপস্থিত হন। কেন? লোক শিক্ষার জন্য? দরকার কি তোমার? ভগবানের সন্তান তারা, ভগবানই তাদের দিকে চাহিবে? তাদের নিকট হতে তণ্ডুল-মুষ্টি ভিক্ষা করে উদর পূর্ণ কত্তে লজ্জা হয় না কি তোমার সাধু? কয়জন সংসার

সংসার পরিত্যাগ করে চলে যায়? আর যদি তেমন ভাবে চলেই যায়, তা-হলে অবশেষে বন জঙ্গলই যে কালে লোকের বাস-হেতু নগরে পরিণত হয়ে উঠ্‌বে?

সংসার পরিত্যাগ কল্লেই কি ভগবানকে পাওয়া যায়? কে পেয়েছে? তুমি কি পেয়েছ হে সাধু? তা-হলে তোমার আমার অবস্থার পার্থক্যতো কিছুই দেখিনে। যে পীড়ায় আমি কষ্ট পাচ্ছি, তোমার দেহওতো তাহারই আধার। আমি যে ভাবে মরছি, ক্রমে ক্রমে জড়ায় আক্রান্ত হচ্ছি, তোমাকেও তো সে ভাবেই মর্‌তে হবে, আক্রান্ত হতে হবে। মরবার সময়, তোমার নাকি চ'খে জল আসে না। এমন কত লোকেরই তো হয়। তোমার আস্‌বে কেন, তুমি যে ইচ্ছা করে তিলে তিলে ভালবাসা হৃদয় হতে উৎপাটন করেছ। কঠিনপ্রাণ সৈনিকের যে অবস্থা, তোমার তাই। যারা বলে ভগবানকে পেয়েছে, হয় তারা মিথ্যাবাদী নয় কপটাচারী নয় নির্ব্বোধ বা ভ্রান্ত সংস্কারের বশবর্ত্তী। আর ভগবানকে পেলেই কি? নিতান্ত সব ছেলে মানুষের কথা এই সব ধর্ম্ম সংক্রান্ত ব্যাপার।

ঈশ্বরের নাম কত্তেই যে সকল সাধু ভাবে বিভোর হয়ে পড়েন, তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে যুক্তি তর্কের অবতারণা কত্তেই ভক্তি ইত্যাদির কথা এনে ফেলেন, এবং জ্ঞানের মুক্ত প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করে অন্যান্য কুটিল পথের আশ্রয় খোঁজেন, তাহারা যেন কখনো আমার হৃদয় আকর্ষণ কল্ল না। এ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে শুধু ভক্তিরূপ বর্ত্তিকার সাহায্যে যে জীবন পথে নিজকে পরিচালিত কত্তে অভিলাষী, মূর্খ সে, নিতান্ত দয়ারও পাত্র।

জ্ঞানই মানবের প্রধান সহায়, যার মহিমায় সে বিশ্বরাজ। জ্ঞান দ্বারা জীবন-সমস্যা পূর্ণ হয় ভাল; না হয় না হবে। 'বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ,

তর্কে বহুদূর’—এ সকল বালকোচিত উক্তির সাহায্যে ভগবানের মহিমা প্রচার করা—আর শোভা পায় না।

একটী কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। সাধু বিশ্বনাথ ইতিমধ্যেই ভগবানের অবতাররূপে পূজিত হচ্ছেন। তিনি যদি অবতার হয়ে থাকেন, তবে আমাদের হতেই বা দোষ কি? অনন্ত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও নাকি যার মহিমা প্রচার কত্তে অশক্ত, তার অবতার একজন সামান্য মানব, যার জ্ঞানের প্রসার বিষয়বিশেষে স্কুল কলেজের সাধারণ ছাত্র অপেক্ষাও কম। ভগবানের নিতান্তই যে ক্ষুদ্র সংস্করণ! আর, ভগবানের ঈদৃশ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবারই বা কি প্রয়োজন? লোক শিক্ষার জন্য? তিনিই তো নিখিলের সৃষ্টিকর্ত্তা, এমন ব্যাকুবের মত এমন মূর্খ দুষ্ট লোক সকল সৃজন কল্লেন কেন? কি দরকারই বা ছিল—লোক সৃজনে এবং কি কাজই হচ্ছে তাকে শিক্ষা দিয়ে? বেদান্তবিৎ বল্‌ছে—তার মায়া। কেন তার দুর্বুদ্ধির মত এ মায়া হলো? আমাদেরই বা কেন এমন আধিব্যাধি প্রপীড়িত দুঃভিক্ষক্লিষ্ট স্থানে সৃষ্ট করে জ্বালিয়ে মাল্লেন?

ভগবান আছেন কি না সন্দেহ। তার আবার অবতার। সে অবতার ও কি না সার্দ্ধ তিন হস্ত পরিমিত নিতান্ত স্বলশক্তি স্বল্পবুদ্ধি মানুষ! ভ্রান্ত সাধু ও তার ভক্তবৃন্দ!

যাক্ সে সকল কথা। যদি তাকে পূজা করে কেহ সুখ পায়, পাউক।

আমি—নাস্তিক বলে উপহাসাস্পদ হতেও প্রস্তুত, তথাপি যেন যুক্তি তর্ক বিহীন মূর্খ আস্তিক না হই।

আর, নাস্তিক কি এমনি ঘৃণার পাত্র? একজন বুদ্ধি পরিচালনা করে জগৎ সৃষ্টিরূপ মহাব্যাপার উপলব্ধি কত্তে অক্ষম হয়ে, সাহসের আশ্রয় গ্রহণ করে নিজ পদের উপর ভর করে চলেছে; অন্যজন পরের কথায় বিনা আপত্তিতে ভগবানরূপ কিম্ভূতকিমাকার কিছুকে কল্পনা করে তার পূজা কচ্ছে। কে শ্রেষ্ঠ?

নবম পরিচ্ছেদ।

সাধু বিশ্বনাথের বাটী হতে স্বগৃহে ফিরে এসে দেখ্‌লাম, টেবিলের উপর নলিনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রাদি স্থাপিত।

আমিই ছাপাখানায় এ সকল পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তখনো বিবাহ যে এত নিকটবর্ত্তী মনে ভেবে ও ভাবিনি। স্বর্ণরেণুশোভিত চাকচক্যময় চিঠিগুলির দিকে দৃষ্টি কত্তেই মনটা কেমন হঠাৎ বেজে উঠ্‌লো।

হেম একখানা চিঠি হাতে নিয়ে পড়্‌ছিল। আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, কেমন হয়েছে?

সে ধীর গম্ভীর ভাবে উত্তর কল্লো, ভালই।

আমরা কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত, এমন সময় মা সে কক্ষে দর্শন দিলেন। আমাকে উদ্দেশ করে পুলকিতচিত্তে বল্লেন, খোকা! দেখেছ, কেমন সুন্দর ছাপিয়েছে। রঞ্জিকা প্রেসে যে এমন সুন্দর ছাপা হয়, জান্‌তুম না।

এত বড় হয়েছি, তাও মার মুখে আমি 'খোকা' নামেই অভিহিত। বন্ধুমহলে এজন্য কতই ঠাট্টা বিদ্রূপই সহ্য কত্তে হয়েছে। মাকে কতবারই না এ কথা বলেছি, তিনি সব সময়ই হেসে উত্তর দিয়েছেন, আমি তোমায় প্রথম 'খোকা' নামেই পেয়েছি, এ নামেই চিরকাল ডাক্‌ব। তুমি চিরকালই আমার কাছে 'খোকা' থাক্‌বে। বল্‌তে বল্‌তে অশ্রুপ্লুতনেত্রে আমার মস্তকে হস্ত বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করেছেন, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, খোকা আমার!

যদি চ নলিনীর ভাবী স্বামী আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা তেমন আকর্ষণ কত্তে পারে নি, তথাপি বিবাহের সমারোহ ব্যাপারে আমি গা

ঢেলে দিয়েছিলাম। মা যা কচ্ছেন, ভালই কচ্ছেন এ বিশ্বাসই আমার হৃদয়ের সমস্ত সন্দেহ ও নৈরাশ্য দূর করে দিচ্ছিল।

মা হেমকে উদ্দেশ করে বল্লেন, এখন বন্ধুদের ভিতর যাদের তোমাদের ইচ্ছা হয়, নিমন্ত্রণ করে পাঠাও। এ সব বিষয়ে তোমাদের উপরই ভার রইলো। দেখো যেন শেষটা গোলমাল না হয়।

হেম নম্রভাবে উত্তর কল্ল, তার জন্য কোনও চিন্তা নেই মা! আমি আর সুরেশ সব ঠিক কর্‌ব।

আমি বলে উঠ্‌লাম, এ উপলক্ষ্যে কলেজ কাউন্সিলের সভ্যদের একটা বিশেষ ভোজ দিতে হবে।

মা হেসে বল্লেন, তাতো নিশ্চয়ই। ললিত, নরেন, বঙ্কিম এরা না আস্‌লে আমোদ হবে কেমন করে? বিশেষত কাউন্সিলের যোগ্য সেক্রেটারী ও ক্লাবের ভূতপূর্ব্ব যোগ্য প্রেসিডেণ্টকে তো সে ভোজে যোগ দেওয়া চাইই।

হেম ঈষৎ হেসে বল্ল, তা প্রেসিডেণ্ট হোক না হোক,—সেক্রেটারী যে বিশেষ যোগ্য তার তো আর সন্দেহ নেই।

আমি। ঠাট্টা না কল্লেও চলবে।

কথার মোড় ঈষৎ ফিরিয়ে বল্লাম, আমাদের বন্ধুবর্গ তো নিমন্ত্রিত হবেই। তা ছাড়া নলিনীদের ক্লাসেরও সব মেয়েদের নিমন্ত্রণ হওয়া উচিত।

টেবিলের নীচ হতে হেম আমার গায় ঈষৎ চিম্‌টী কেটে বল্ল, বিশেষত নীলমণি বাবুর বাড়ীর মেয়েদের।

মা তার কথায় অল্প যৎসামান্য যা শুন্‌লেন, তাকে উপলক্ষ্য করে বল্লেন, তাতো ঠিকই। নীলমণি বাবুর বাড়ীর সকলকেই নিমন্ত্রণ কত্তে

হবে, সরোজ, তার মা, পিশতাতো বোন, আরো যারা আছেন। যারা আমাদের বন্ধুস্থানীয় তাদের বাড়ীর পুরুষ স্ত্রীলোক সবকেই নিমন্ত্রণ করা চাই। এই আমার প্রথম কাজ, খরচের দিকে তোমরা চেয়োনা; যাতে কাজটী সুন্দরভাবে হয়ে যায়, তার এখন চেষ্টা কর।

মা চলে গেলেন। হেম হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, কেমন জব্দ!

আমি ঈষৎ গম্ভীরভাবে উত্তর কল্লাম, ভারি দুষ্টু তুমি! আচ্ছা, এর প্রতিশোধ একদিন পাবে।

দুজনে মিলে নিমন্ত্রণ পত্রে নাম লিখে বিলি বন্দোবস্তে বসে গেলাম। সে দিন শনিবার, হেমের আমাদের বাটীতেই আহার করবার কথা।

গল্প কত্তে লাগ্‌লাম, ওদিকে কাজ চল্‌তে লাগ্‌লো।

আমার মনে থেকে থেকে শুধু সাধু বিশ্বনাথের কথাই জেগে উঠ্‌ছিল। যদি সংসার অসারই হবে, তবে নলিনীর বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া কেন? আমাদেরই বা পড়াশুনা কেন? বিদ্যা বুদ্ধি ধন ঐশ্বর্য্য লাভের চেষ্টা কেন? সবই যে বৃথা!

হেমকে উদ্দেশ করে বল্লাম, কি বল হে হেম, বিয়ে করা উচিত কি না?

সে উত্তর কল্ল, উচিত। তোমার মতে?

আমি। তাতো জানই। তুমি যখন বলছ্ উচিত, তখন, নয়। কেন উচিত?

হেম। কেউ যদি বিয়ে না করে তা হলে এই মানব জাতি থাক্‌বে কেমন করে?

আমি। তার জন্য তোমার এত ভাবনা কেন?

হেম। ভগবানের ইচ্ছা নয় যে আমরা তাঁর সৃষ্টি বিনাশ করি, তা হলে কি পাপ হবে না?

আমি। যদি আমাদের সাহায্য ছাড়া ভগবান তাঁর সৃষ্টি ব্যাপার চালাতে অক্ষম হন, তা হলে তো তাঁর মত এমন দয়ার পাত্র আমি দেখিনা। এমন ভগবান কি ভক্তির পাত্র?

হেম। কি জানি হে, এ সব বিষয় তর্ক করে ঠিক করা দুষ্কর। আমরা ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজের ছাত্র—শক্ত মাটী, ইট, কাঠ, বীম, বরগা নিয়ে আমাদের কাজ,—ভাবের জিলিপীর প্যাঁচের আমরা ধার ধারি না।

আমি হেসে বল্লাম, তাই বল, তর্কে পেরে উঠ্লুম না। আমার মতে বিয়ে না করাই ভাল। যত আপদ ঐ বিয়ে হতে।

হেম। তবে কেনই বা সংসারে থাকা। সাধু বিশ্বনাথের মত সংসারত্যাগী হও না?

আমি। বিয়ে না কল্লেই যে সংসার ছাড়তে হবে, এমনই বা কি? কেন, দশটা সৎকাজে নিযুক্ত থেকে জীবনটাকে কাটান যায় না কি? এই মনে কর, পর-সেবা, দীন দুঃখীকে সাহায্য করা, দেশের উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি।

হেম। তর্কের কথাই যদি বল, তবে বলবো পর-সেবায় আমার কি প্রয়োজন? দীন দুঃখী আমার কে? মরুক বা বাঁচুক,—আমার দুঃখ কি? দেশই বা কি? আমি বুঝি,—ওসব জল্পনা কল্পনা কিছুই নয়। যে দিকে দুই চক্ষু যায় সে দিকে যাব; প্রাণ যা চায় তা তাকে দোব, কারোর দিকে চাইব না, এতেই আমার সুখ; আমার গাড়ী চালাতে যেয়ে এমন যদি কারো কষ্ট হয় হোক, তাতেও ক্ষতি নেই।

আমি। তা যাই বল ভাই! ভগবান ঠগবান একটা কিছু আছে বলে মেনে না নিলে, জীবনের চরমগতি সম্বন্ধে কিছু একটা ঠিক না করে

নিতে পাল্লে সবই যেন উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বাস করাও যে কঠিন ব্যাপার।

হেম। আমি তো দেখি কিছুই কঠিন নয়। কার্য্য থাকলে, কারণও থাকবে; গৃহ থাকলে তার নির্ম্মাতা ও থাকবে। পৃথিবী আছে, তাই তার সৃষ্টিকর্ত্তা ও আছে।

আমি। স্বীকার কল্লেম পরমেশ্বর হতে পৃথিবী সৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু তাকে সৃষ্টি করেছে কে ভাই? এমন ভাবে যুক্তি তর্কের আশ্রয় নিতে গেলে, সৃষ্টি কারকের অন্ত থাকবে না।

হেম। তাতো ঠিকই, সবই দুর্জ্জেয়।

আমি। আমার মনে হয়, আমরাই নিজ মন হতে যত ধর্ম্মও দেবতাকে সৃষ্টি করেছি। নিজ দেহ হতে তন্তুজাল নিঃসৃত করা যেমন মাকড়সার একটী ধর্ম্ম, আমাদের ও এ সব ভাবসৃষ্টি দেহের ও মনের অঙ্গবিশেষ। যে ভাবে আমরা বিচার করি, তাতে কার্য্য হলেই, পশ্চাতে কারণ আছে বলে ঠিক করে নি। হতে পারে, আমাদের ছাড়া অন্যবিধ এমন জীব আছে যারা এ ভাবে বিচার করে না। তাদের কাছে, জগৎ আছে অতএব ভগবান আছেন—এ প্রকার যুক্তি ও বুঝি উপস্থিত হয় না।

হেম। যাও, ওসব বাজে তর্কের কথার কাটাকাটির দরকার নেই। অত ধর্ম্মাধর্ম্মের আমি ধার ধারি না। এখন যে কাজটায় হাত দিয়েছি সেটাতো শেষ করে ফেলা যাক্। এন্‌ভেলাপ লেখা আর কখানা বাকী?

কথা হচ্ছে, এমন সময় মা এসে আবার দেখা দিলেন। হেসে জিজ্ঞাসা কল্লেন, কি তর্ক হচ্ছিল? কতগুলি নাম লেখা হলো?

হেম। না, তর্ক তেমন কিছুই নয়। লেখা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

আমি যেন নিজের অলক্ষিতে হঠাৎ বলে উঠ্‌লাম, মা। নলিন্‌কে এখন বিয়ে না দিলে কি চল্‌তো না?

মা উত্তর কল্লেন, আর কত দিনই বা রাখা যেতো? এই তো বিয়ের ঠিক বয়স। শেখরনাথের মত ছেলেই বা সব সময় কোথায় পাওয়া যাবে,—যেমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, তেমন দেখ্‌তে সুন্দর, বড় ঘর।

আমি। তুমি মা তোমার ভাবি জামাতার যত সুখ্যাতি কচ্ছ, আমি যেন কেন তার তত প্রশংসা কত্তে পাচ্ছি না।

মা। কেন, কি দোষ?

আমি। বড়ই যেন অনাবশ্যক রকমের অহঙ্কারী। শেষ্‌টা বোধ হয়, আমাদের মানুষের মধ্যেই ধরবে না।

মা। তা, তোমার এমনতর লাগ্‌বারই কথা। তুই তো আর লোকের সঙ্গে মিশ্‌বিনে। বাইরের লোক দেখ্‌লেই যেন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়িস্‌। যত বাহাদুরী কেবল বাড়ীর ভিতর, মার কাছে।

আমি। নলিন্‌ কি বলে মা?

মা। ও আবার কি বল্‌বে? ঐ এতটুকু একটুখানি মেয়ে, তার আবার হাঁ, আর না। বাপ মা ছাড়া হতে হবে, একথা ভাব্‌তে প্রাণ প্রথম প্রথম অস্থির হবার কথা, শেষে সব ঠিক হয়ে যাবে। (হেমকে উদ্দেশ করে বল্লেন) কি হেম! তোমার কি মত?

সে অতি নরম সুরে উত্তর কল্ল, মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হওয়াই ভাল। আর শেখরনাথ ও ভাল ছেলে, বেশ সম্বন্ধ হয়েছে।

আমি মনে মনে বল্‌ছিলাম, মিথ্যুক।

দশম পরিচ্ছেদ।

নলিনীর বিবাহের আর বিলম্ব নেই। নিমন্ত্রণ-পত্রাদি সব বিতরিত হয়েছে।

শনিবার—সকালেই কলেজ ছুটী হয়ে গেছে। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কত্তেই কিয়দ্দূর হতে নহবতের বাজনা শুন্‌তে পেলেম। সানাই ও নাগরার শব্দ মিশ্রিত এই রসনচৌকী বাজনা আমার কর্ণে চিরদিনই মধুর লেগেছে। আজও লাগ্‌ছিল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় ভগ্নীর আসন্ন বিদায়ের কথা মনে করাইয়া, প্রাণকে বিক্ষোভিত করে তুল্‌ছিল। নলিনী ও আমি পিতামাতার আদরের সন্তান, বাল্যকালাবধি একে অন্যকে ছাড়া আর কাকেও জানিনি। আর একদিন পরেই সে জন্মের মত আমায় পরিত্যাগ করে অন্য গৃহে চলে যাবে, ভাবতেই প্রাণ কেমন কেঁদে উঠ্‌লো।

গৃহে প্রবেশ কত্তেই দেখলাম, আমার প্রতীক্ষায় সে দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লাম, নলিন্! আর কি? কালইতো তুই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের মেম হতে চলে যাবি। আমাদের কি খাওয়াবি, খাওয়া এখন।

কিন্তু কৈ, সে তো আমার কথায় কোন উত্তর কল্লনা, বরং উপবেশন কত্তেই আমার ক্রোড়ে মাথা গুঁজে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো।

তার কি দুঃখ ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিলেম না। তখনও আমি নাটক নভেল তেমন পড়িনি। প্রেমের কথা তেমন বুঝে উঠ্‌তে পাত্তেম না। তথাপি আমার মনে হচ্ছিল, সে যে আমাদিগকে ছেড়ে যাচ্ছে এজন্য তার দুঃখ নয়, তদপেক্ষাও তার অধিকতর দুঃখ শেখরনাথের সহিত বিবাহ।

পূর্ব্বেই বলেছি সে তখন চতুর্দ্দশ বর্ষের বালিকা। অনেকটা এমনি বয়সে আমিও প্রথম হেমকে ভালবেসেছিলাম। বল্‌তে কি এক আনন্দ মদিরায় তখন আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম। কে বল্‌বে নলিনীর প্রাণ কাকে চাচ্ছে? সে দিনকার সেই ক্ষুদ্র দৃশ্যটীও মনে পড়্‌লো। তাও কি সম্ভব? অসম্ভবই বা কি? হেমের প্রতি কে আকৃষ্ট হয় নি? যদি তাই হয়, তা হ'লে কি নলিনীকে এই বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা সঙ্গত হচ্ছে?

ভগ্নী! কি করব আমি—শক্তিহীন, সহায়বিহীন, উপায়শূন্য? আমার কথা, তোমার দুঃখ—ছেলেমি ব্যাপার বলে সকলে হেসে উড়িয়ে দেবে।

কিন্তু লোকে যাই বলুক, হেমের প্রতি সে সময়কার ভালবাসা আমার পক্ষে ছেলেমি ব্যাপার ছিল না। বাল্য ও কৈশোরের সুখ দুঃখ, ভালবাসা, কি কিছুই নয়? হেম ছাড়া তখন আমার জীবন কি? নলিনীর প্রাণ কি সত্যই কারো জন্য কাঁদ্‌ছিল?

এ সব বিষয়ে, আমার একমাত্র বুদ্ধি পরামর্শদাতা—হেম। তাকেই বা কেমন করে জিজ্ঞাসা করব?

অথবা, আমি ছেলে মানুষ, ছোট জিনিষকে বড় ভাবে দেখছি। বাল্যের ভালবাসা—কয়দিনের জন্য স্থায়ী ইহা?

নলিনীকে কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা কল্লেম, নলিন্, নলিন্! তুই কাঁদছিস্ কেন? সে কোনও উত্তরই কল্লনা, কেবল কাঁদ্‌তেই লাগ্‌লো।

* * * * *

কিছুতেই কিছু হলো না। তৎপর দিবস রজনীতে মহাসমারোহের ভিতর শেখরনাথের সহিত নলিনীর বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহ আসরে

আমার বন্ধুগণ মধ্যে ললিত, বঙ্কিম, নরেন্দ্র, অক্ষয় অনেকেই উপস্থিত ছিল। হেম এক কোণে দণ্ডায়মান। আমি তার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে চেয়েছিলাম। দেখ্‌লেম, সে বারংবার নলিনীর দিকে চাচ্ছে; নলিনীও মাথা উঁচু করে অন্যের অলক্ষিতে তার দিকে চাহিল। সেই সুযোগে আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলাম, আমার ভগ্নীর মুখখানা কে যেন কালিমায় ঢেকে দিয়েছে। হেমের সদা-প্রফুল্ল বদন, তাহাও সে মুহূর্ত্তে কেমন বিষাদ-ম্লান দেখাচ্ছিল। সম্মিলিত লোকসমূহ আনন্দমগ্ন, বর ও কন্যার রূপগুণ বর্ণনায় ব্যস্ত। আমি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভীতিবিহ্বল নেত্রে দৃশ্যটী দেখ্‌ছিলাম। আজও তাহা আমার হৃদয়ে জাগরূক রয়েছে!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের মাসেক পরে, শেখরনাথ সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে বিলাত চলে গেল। সে ব্যয়ভার পিতৃদেবই গ্রহণ করেছিলেন।

পূর্ব্ব কথাবার্ত্তানুসারে নলিনী পূর্ব্বেরই ন্যায় আমাদের বাটীতে থেকে বেথুন কলেজে পড়বার জন্য প্রস্তুত হতে লাগ্‌লো।

সংসারানভিজ্ঞ আমি এসব ব্যাপার ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিলাম না। নলিনীর বিবাহের এক্ষণে এমন কি দরকার ছিল? শেখরনাথের মত জামাতা কি এমনই দুষ্প্রাপ্য?

মাস দেড়েক চলে গেল। এমন সময়, নলিনীর পরীক্ষার ফল বাহির হলো। বালিকা পরীক্ষার্থীনিদের ভিতর প্রথমস্থান অধিকার করে সে

কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়েছে—এ সংবাদে সে তো আনন্দিত হলোই কিন্তু বাবার আনন্দ যেন আর ধরে না। তিনি তাকে নানাবিধ পুস্তক ও চিত্রাবলী তো উপহার দিলেনই, তা ব্যতীত নূতন মূল্যবান মুক্তা বিনির্ম্মিত নেকলেস ক্রয় করে দিলেন। বন্ধু-বান্ধবকেও নিমন্ত্রণ করে একদিন সমারোহের সহিত আহার করালেন। নূতন বসন ভূষণে সজ্জিত হয়ে নলিনী সৌন্দর্য্যের প্রতিমাস্বরূপ আমাদের গৃহে বিচরণ কত্তে লাগ্‌লো।

অবশেষে কলেজ খুল্লে, সে বেথুন কলেজে ভর্ত্তি হলো।

আমাদের জীবন-প্রবাহ আবার পূর্ব্বের ভাব ধারণ কল্ল। সংসারের কাজকর্ম্ম পূর্ব্বেরই ন্যায় চল্‌তে লাগ্‌লো।

তবে পার্থক্যের ভিতর এই দেখ্‌তে লাগ্‌লাম, যে এখন হতে আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আর একজনের কথাও জড়িত হয়ে উঠ্‌তে লাগলো। মাতাঠাকুরাণী অনেক সময়ই তাঁর প্রিয় জামাতার বিষয় উল্লেখ কত্তেন। নলিনীর পরীক্ষার সুফলে তিনি জামাতার ভাগ্যবত্তারই যেন নিদর্শন দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

শেখরনাথ বিলাত যাওয়ার পর বাবা ও মার নিকট প্রায়ই তার পত্র আসতে লাগলো।

নলিনীও নিয়মমত চিঠি প্রাপ্ত হতে লাগ্‌লো। সে তার কি উত্তর দিত, তা অবশ্য আমার জানার কোনও কারণ বা দরকার ছিল না। তবে দেখ্‌ছিলাম দিন দিনই তার মনের ভাব পরিবর্ত্তন হচ্ছে; স্বামীর দিকে মন নুয়ে পড়্‌ছে। আনন্দরূপ মৃণালে ভর দিয়ে হৃদয়পদ্ম নূতন শোভাসম্পদে ফুটে উঠ্‌ছিল। সুন্দরী নলিনী দিন দিন আরও সুন্দর হয়ে উঠ্‌ছিল। সত্যই বুঝলাম—আমি ছেলেমানুষ। হিন্দুস্থানের

বালিকা—প্রকৃতির রম্য সৃষ্টি—পিতামাতা যার হস্তে তাকে সঁপে দেন, তাকেই আত্মহারা হয়ে ভালবাসে। ইহাই তার প্রাচীন আদর্শ ও শিক্ষা।

বিবাহের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হতে দেখ্‌ছিলাম সে হেমের সান্নিধ্যে আস্‌তে একটু ব্রীড়াবনত হয়ে পড়্‌ত। বিবাহের মাসেক পর সে যখন শ্বশুরালয় হতে গৃহে পুনঃ প্রবেশ কল্ল, তখন আর সে ভাব নাই। তাহার সেই নবোঢ়া বধূমূর্ত্তি কেমন মধুর! নানালঙ্কারভূষিতা সুশ্রীবসনা বলেই যে এমন সুশ্রী দেখিচ্ছিল—তা নয়। সেই কয়েক দিনের ভিতরই তার দেহ ও হৃদয়ের ভিতর কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে। সেই হাসি-ভরা ফুল্ল বদন, সীমান্তে সিন্দুর বিন্দু আমার হৃদয়ে কেমন এক বিমল আনন্দ আনয়ন কচ্ছিল। সে গৃহে পদার্পণ কত্তেই বুঝ্‌লেম, পূর্ব্বের সে লজ্জা, লোকের কাছে মুখ খুলে কথাটী বল্‌তে সঙ্কোচ-বোধ—সে ভাব আর নাই। এত দিন বালিকা ছিল, আজ যেন সে অকস্মাৎ স্ত্রীজীবনের প্রথম সোপানে আরোহণ করে আপনাকে অন্যান্য রমণীসমূহের সম-সত্বাধিকারিণী মনে কচ্ছে। আমি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিন্তু তার কথাবার্ত্তায় আচার ব্যবহারে মনে হচ্ছিল সে যেন আমার অপেক্ষাও সমাজের উচ্চস্থানে আসীনা বলে নিজকে অনুভব কচ্ছে।

হেমের সহিত ও তার সাক্ষাৎ হলো। কিন্তু কৈ, পূর্ব্বের সে ব্রীড়াময় ভাব কৈ? তার কাছে সে হেসে কুট্‌কাট্‌ হচ্ছিল। তাকে তার প্রতি-শ্রুত 'হেমচন্দ্র-পদকের' কথা উল্লেখ করে দিতে ও ত্রুটী কল্লনা। হেম তার স্বামীর কথা লক্ষ্য করে কিছু বল্‌তেই, যাও বলে, হাসির তরঙ্গ উত্থিত করে সে কক্ষান্তরে চলে গেল।

আমার হৃদয়ের এক মহাভাবনার অবসান হলো; বুঝলেম, মাতৃদেবী —যিনি কোনও কাজে কখনও ভুল করেন না, এক্ষেত্রেও করেন নি।

কে সে যাদুকর যে আমার ভগ্নীর হৃদয়ের দুঃখরাশি অপনোদন করে এমন আনন্দ রাশি ঢেলে দিল? কে সেই যাদুকর, যে তাহার বদনের মলিনতা দূর করে, তার দেহলতিকা সুষমায় সাজিয়ে তুল্‌তে লাগ্‌ল?

সে দিন আকাশ নির্ম্মল। আমি আমার দ্বিতল কক্ষের জানালার পার্শ্ব হতে চেয়ে দেখ্‌লাম, চারিদিক এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। প্রভাতের প্রথর মধুর সূর্য্য-কিরণে চারিদিক হাস্‌ছে। দূরে, আকাশে এক শুভ্র মেঘ-খণ্ড অন্য মেঘ-খণ্ডের সাথে যেয়ে মিলিত হচ্ছে; নিম্নের বাগানে এক ফুল আর এক ফুলের দিকে চেয়ে হাস্‌ছে। এক মিলন-দেবতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে সমস্ত ভুবন ব্যাপিয়া একে অন্যের দিকে মিশ্‌তে চলেছে। বাহ্য জগতে সৌন্দর্য্য, অন্তর্জগতে ভালবাসা—উভয়েই একই দেবতার করধৃত যন্ত্রবিশেষ।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃদেবের সৌভাগ্যের মূল কারণ, ব্যবসা বাণিজ্য। সর্ব্বদা তাহাতেই তিনি ব্যস্ত থাক্‌তেন। ব্যবসার মাহাত্ম্য ও তাঁর কাছে সকল সময়ই শুন্‌তে পেতাম।

সত্যই আমার এখন মনে হয় আমাদের বর্ত্তমান পতিত অবস্থায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা ধন বৃদ্ধির চেষ্টাই দেশপ্রীতির সর্ব্ব প্রধান লক্ষণ। সে-ই মাতার প্রকৃত সন্তান, যে একটী টাকার পরিবর্ত্তে বিদেশ হতে দশটী টাকা এনে তাঁর রিক্ত ভাণ্ডারে সঞ্চিত কচ্ছে। কিন্তু হায়! কি দুঃখ! ব্যবসা বাণিজ্যের গৌরব কেহ বুঝ্‌লে না। যারা এ গৌরবময় কার্য্যে লিপ্ত, তারা ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রসূত জাতিভেদের বিষময় ফলে সমাজের নিম্নস্তরে

ঘৃণনীয় অবস্থায় পতিত হয়ে রয়েছে। এই ভাবের প্রভাবেই দেশের শ্রেষ্ঠ জাতি 'বণিক' বেণেতে পরিণত হয়েছে; 'সাহা' জল আচরণীয় নয়। বাক্য-বণিকেরই সর্ব্বত্র আদর, বাণিজ্যে-লিপ্ত বণিকের নয়।

কলেজে এ কারণে অনেক সময় ঠাট্টা বিদ্রূপ সহ্য কত্তে হতো। সর্ব্বত্রই দেখ্‌তাম, উকীল, সবজজ, ডেপুটী, ডাক্তার, মুন্সেফ ইত্যাদির সন্তানগণ আমার অপেক্ষা অধিক সম্মান পেত। দু এক সময় বা কেহ, কি হে মুদি ভায়া, বেণে ভায়া বলে প্রকাশ্য ভাবে ঠাট্টা কত্তেও ক্রুটী কত্ত না। পিতৃদেবের দিকে লক্ষ্য করেও ইঙ্গিতে ঠাট্টা তামাসা চল্‌তো।

আমি কিন্তু জান্‌তাম—তাঁর তুলনায়, উকীল, সবজজ নিতান্ত সামান্য লোক—পরদাস, পরপ্রত্যাশী। কি চরিত্র সম্পদে, কি বুদ্ধিমত্তায় তিনি অতুলনীয় ছিলেন। ধনের তুলনা কি করব?

তথাপি বাল্যকালাবধি সর্ব্বক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অবজ্ঞাব্যঞ্জক ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথা শ্রবণ কত্তে কত্তে আমার হৃদয়েও কেমন তার প্রতি একটা ঘৃণার ভাব জেগে উঠ্‌ছিল। পিতৃদেবের ইচ্ছা ছিল যে সর্ব্ববিষয়ে সুশিক্ষিত হয়ে তাঁর ব্যবসা অবলম্বন করি। তিনি প্রায়ই জ্যাঠামশায়ের কাছে দুঃখ করে বল্‌তেন, এত বড় একটা দেশ, এত কোটী কোটী লোকের বাস অথচ এমন একটা স্কুল কলেজ নেই যে ছেলেকে ব্যবসা শিখ্‌তে পাঠাব। যে সকল স্কুল কলেজ আছে তাতে ছেলে পাঠানো যা, জেনে শুনে তার ভবিষ্যতে কুড়াল মারা ও তা। কিন্তু কি করব? ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লে যে একেবারেই মূর্খ হবে।

মাঝে মাঝে তিনি আমাকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যেতেন। কিন্তু প্রে.........কলেজের ত্রিতল কক্ষের মধুর হিল্লোল সেবনে অভ্যস্ত আমার বড় বাজারের অন্ধকারাবৃত বদ্ধবায়ু দোকানগৃহে প্রবেশ কত্তেই

মাথা যেন ঝিম্ ঝিম্ করে উঠ্‌ত। বিশেষতঃ মসল্লা ইত্যাদির তীব্র গন্ধ আমার একেবারে অসহ্য ছিল।

আমি নিজে কোনও উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে বিদ্যাভ্যাস কচ্ছিলাম না। বন্ধুগণ মধ্যে অনেকেই জিজ্ঞাসা কত্ত, লেখাপড়ার শেষে কি করব? আমি উত্তরে বল্‌তাম, দেখা যাক্ না শেষটা কি দাঁড়ায়? এখন তো পড়া যাক্।

বারংবার চেষ্টা করেও যখন স্বীয় ব্যবসায়ের দিকে আমার মন তেমন আকৃষ্ট করাইতে সক্ষম হলেন না, তখন পিতৃদেব আমাকেও বিলাত পাঠাবার জন্য মনস্থ কল্লেন। তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়্‌ছি।

মার প্রথম প্রথম একটু আপত্তি দেখা গেল। একমাত্র পুত্র—সেও দূরদেশে চলে যাবে, ভাব্‌তে বোধ হয় বাঙ্গালী মার ভালবাসা-ভরা প্রাণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় শিহরে উঠ্‌ছিল। যা হোক, তিনিও অবশেষে সম্মত হলেন।

তাঁদের কোন কথায় কখনো আপত্তি করি নি। উহা আমার স্বভাব বিরুদ্ধ। পিতৃদেবের ব্যবসা অবলম্বন—তার জন্যও আমি প্রস্তুত ছিলাম। তবে তিনি নিজেই বুঝেছিলেন, আমার দ্বারা সেকাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে না।

বি, এ পরীক্ষার ফল বের হবার কয়েক দিবস পরেই, পিতৃদেব একদিন আমাকে স্বীয় কক্ষে ডেকে পাঠালেন। দেখলাম, সম্মুখে মাতৃদেবী চেয়ারে উপবিষ্টা। আমাকে উদ্দেশ করে বল্লেন, এখনতো তুমি বি, এ পাশ করেছ। ইংলিশ ও ফিলছফি দুটাতে অনার পেয়েছ, আমরা দুজনেই বড় সুখী হয়েছি। এখন কি কত্তে চাও?

আমি তদুত্তরে বল্লাম, যা বল্‌বেন,—তাই।

তা শুনে বল্লেন, আমাদের ইচ্ছে, তুমি বিলাত যেয়ে সিভিল সার্ব্বিস পাশ করে বংশের মুখোজ্জ্বল কর।

মা বল্লেন, শেখরের শেষ চিঠি কি দেখেছ? পরীক্ষা শীগ্‌গিরই হচ্ছে—জুলাইতে। তোমরা দুজনে যদি একে একে পরীক্ষায় পাশ করে দেশে ফিরে আস, তা হ'লে আমাদের কি সুখের দিনই না হবে।

জামাতা ও পুত্রের ভবিষ্য সৌভাগ্য সম্পদের চিত্রে মাতার বক্ষ আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। যাতে সে সুখ তিনি ভবিষ্যতে সত্য সত্যই উপভোগ কত্তে পারেন, তজ্জন্য আমার মনেও দৃঢ় সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল। আমি সেই ভাবের আকস্মিক উত্তেজনায় বলে উঠ্‌লাম, আপনারা যা আজ্ঞা করবেন, করব।

বাবা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ কল্লেন। তাঁদের ভক্তিভরে প্রণাম করে, আমি স্বীয় কক্ষে প্রবেশ কল্লাম।

আমার পাঠগৃহ আমি নানাদেশের মহাপুরুষদের মূর্ত্তিদ্বারা শোভিত করেছিলাম। বুদ্ধদেব, গোবিন্দসিংহ, রামমোহন, কেশবচন্দ্র, মধুসূদন, মিল্‌টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, [illegible]জা, ওয়াসিংটন, ক্রমওয়েল, ক্যাণ্ট, হিগেল, ডারউইন, [illegible]র ও অন্যান্য যাঁহাদের ছবি দেয়ালের গায় শোভা পাচ্ছিল, কোন দিন তাদের জীবন-কথা হৃদয়পটে তেমন ভাবে উদয় হয়নি। কিন্তু আজ গৃহে প্রবেশ কত্তেই দ্বারদেশে বুদ্ধদেবের সৌম্যসংযত মূর্ত্তি কেমন যেন হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুল্ল।

রাজার ছেলে। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। পরমা সুন্দরী যুবতী ভার্য্যা, নয়নাভিরাম পুত্র, সবই তো তাঁর ছিল। তথাপি কেন তিনি সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন?

জীবন

দেয়ালের অপরদিকে ভারতের নবীন ভাস্কর রাজা রামমোহনের প্রতিভাবিমণ্ডিত বলদৃপ্ত মূর্ত্তি। কিসের তাড়নায় তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে তিব্বতের ভীষণ বিজন বনে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন? জীবনের মহাব্রত—সত্যানুসন্ধান ও সত্যপ্রচারের জন্য—তিনি আজীবন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন?

মধুসূদন—দরিদ্র, দুঃখ-প্রপীড়িত, অর্থাভাবে হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত—কই তিনি তো অর্থের জন্য জীবনপাত করে যাননি?

ইংরাজ কবি মিল্টন। কি দুর্দ্দমনীয় তেজ! কি শক্তি! অন্ধ দরিদ্র কবি! কে কবে তার মুখে অর্থের যশঘোষণা শুনেছে?

দার্শনিক স্পাইনোজা! জগতে দুর্ল্লভচরিত্র! অর্থকে কে এমন হেয় জ্ঞান করেছে? কে এমন জ্ঞানচর্চ্চায় জীবনপাত করেছে?

চেয়ারে উপবেশন পূর্ব্বক ভাবছিলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছিল যে দেয়ালের প্রতিমূর্ত্তিসমূহ যেন সজীব হয়ে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে আমায় বল্‌ছিল—শুধু অর্থের দাস, অর্থের দাস হ'ওনা। শুধু অর্থের জন্য লালায়িত হ'ওনা। প্রাণ যাকে চাচ্ছে, আজন্ম হৃদয় দিয়ে যাকে বরণ করে আস্‌ছ, তার দিকেই লক্ষ্য রেখো; তারই অনুসরণ কর—সমস্তসুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়ে। সে দুঃখের ভিতর ও যে সুখ নিহিত রয়েছে তার তুলনায় অন্য সুখ ও সুখ নয়।

কি চাচ্ছিল আমার হৃদয়? কেবল এই মাত্র বুঝিতেছিলাম, সমস্ত দেহ প্রাণ ভরে কি এক মহা ক্ষুধা বিরাজ কচ্ছে, শুধু অর্থপ্রাপ্তিতে যা মিট্‌বেনা। এ কিসের ক্ষুধা? প্রাণ কি চাচ্ছিল?

এমন সময়, কি যেন কেমন করে সাধু বিশ্বনাথের মূর্ত্তি আমার হৃদয়পাশে ভেসে উঠ্‌ল? মনে তখনই প্রশ্ন উদয় হলো—কেন তিনি সংসার বিরাগী হয়েছেন?

কে বল্‌বে কার অন্বেষণে জগৎ চিরকাল ঘুরে বেড়াচ্ছে? কে সে, কি সে—যার জন্য রাজপুত্র ভিখারীর বেশে ঘুরেছে? কবি তার হৃদয়ের সমস্ত ভাষা ব্যয় করেও যাকে ফুটিয়ে না তুল্‌তে পেরে নিজকে অভাগ্যবান মনে করেছে? যার ইঙ্গিতে দেশবীর শত্রুহস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে ও নিজকে কৃতার্থজীবন মনে করেছে? যে অমৃতের আস্বাদ পাবার জন্য রাজবালা ভিখারীর সহিত প্রাণ মিশাবার জন্য ছুটে গেছে? অন্ধকার রজনীর আলেয়ার ন্যায় মাঝে মাঝে অকস্মাৎ হৃদয়প্রান্তরে দেখা দিয়ে কে এমন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছ?

আমি তন্ময়চিত্তে বসে বসে এসব বিষয় ভাবছিলেম এবং অস্পষ্ট ভাবে এই টুকু বুঝিতেছিলাম যে আমার প্রাণ সিভিল সার্ব্বিসের মোহে ভুলিতে যেন সে সময় তত রাজি ছিল না। পরের অধীন হয়ে, পরের আজ্ঞায় সারাটা জীবন নিজকে চালিত করা, এ আদর্শ কখনো আমার নিকট লোভনীয় ছিল না। অর্থের অভিলাষী ছিলাম কিন্তু তার জন্য পরের হাতে নিজকে বিলাইয়া দিতে ইচ্ছুক ছিলাম না।

এমন সময় কোথা হতে হেম এসে গৃহে প্রবেশ কল্ল।

বাবা ও মার প্রস্তাব শুনে সে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ কল্লে এবং আমাকে লক্ষ্য করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তে লাগল, দেখো ভাই! শেষটা জজ ম্যাজিষ্ট্রেট হয়ে নেটিভ নিগার বন্ধুকে ভুলে যেও না।

*　　*　　*　　*　　*

মাসেক কাল চলে গেল। আমি তখন এম, এ পড়্‌ছি। ঠিক হলো, পূজার পরই বিলাত যাত্রা করব।

এ দিকে যতই যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হচ্ছিল, আমার মন ততই বিদ্রোহ-ভাব ধারণ কচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, শুধু অর্থান্বেষণে

বিলাত যাওয়ার কি দরকার? মান সম্ভ্রম? পরপদসেবী আজ্ঞাবহ ভৃত্যের আবার কি সম্মান? বিলাত যাব—জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কিন্তু চাকরীর জন্য নয়।

বাল্যকাল হতে যে জীবনের কল্পনা মাঝে মাঝে হৃদয়ে ফুটে উঠেছে তাতো এ নয়। মনে পড়ে না, কখনো কোন জজ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেটকে দেখে তাদের জীবন বাঞ্ছনীয় মনে করেছি। তারা তো পরের দাস; পরের আজ্ঞানুসারে যার জীবন চালাতে হবে সেও মানুষ?

প্রাণ চাচ্ছিল নির্ম্মল আনন্দ। অতুল ধনের আমার প্রয়োজন ছিলনা, জীবন নির্ব্বাহ হলেই যথেষ্ট। কিছু কাজ করব, আর কবিতা লিখব এই তো বেশ আদর্শ। বরং জজ ম্যাজিষ্ট্রেট অপেক্ষা মাষ্টার মশায়কেই অধিকতর আদর্শস্থানীয় বলে বোধ হচ্ছিল। আমি জানতাম, বাঙ্গালায় তার মত মহৎ ব্যক্তি কম। সত্যই কবি বলেছেন, জগৎ তার প্রকৃত মহৎ সন্তানগণের বিষয় জানে না।

এই প্রকার নানাভাবে হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছিল, এমন সময় এক হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটল, যার ফলে আমার জীবন-ইতিহাস এক নূতন ভাব ধারণ করবার উপক্রম হলো।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পিতৃদেব বৎসরাধিক হতে শিররোগে ভুগ্‌ছিলেন। কারণ, অত্যধিক পরিশ্রম।

মা কতবার এ ভাবে শ্রম করতে বারণ করেছেন কিন্তু তিনি এ বিষয়ে তাঁর কথায় কর্ণপাত কর্‌তেন না। যৌবনের প্রারম্ভ হতে কাজে লিপ্ত থাক্‌তে থাক্‌তে তার প্রতি এমন একটা আশক্তি জন্মে গিয়েছিল, যে কাজ ছাড়া সময় কর্ত্তন তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম ভাগ। দুটা বেজে গেছে। ভয়ানক গরম। পরীক্ষান্তে স্কুল কলেজ সব বন্ধ। এমন সময় পিতৃদেবের গাড়ী এসে বাড়ীর দরজার সন্মুখে লাগ্‌লো।

রাজপথ তখন অনেকটা লোকবিরল। ধূলিকণা হতে অগ্নি নির্গত হচ্ছে। মাঝে মাঝে বরফ ডেকে যাচ্ছে। রৌদ্রোত্তাপের জন্য বাটীর জানালা কপাট এক প্রকার বন্ধ। আমি স্বীয় কক্ষে ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় পত্রিকা পাঠ কচ্ছি। মাতৃদেবী সাংসারিক কি কার্য্যে যেন নিযুক্ত।

গাড়ী দরজায় লাগ্‌তে না লাগ্‌তেই মা তাড়াতাড়ি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। একটু পরেই শুন্‌তে পেলাম, খোকা খোকা বলে তিনি ব্যাকুলভাবে উচ্চৈঃস্বরে আমায় ডাক্‌ছেন। আমি দৌড়িয়ে দরজার কাছে গেলাম।

তারপর যা দেখলাম, তা বল্‌তে হৃদয় বিদারিয়া যায়। বাবা গাড়ী হতে অতি কষ্টে কানাই দাদার হাতে ভর করে গৃহের সিঁড়ীতে পা দিলেন

ও তৎপরে মার দিকে বাহু বিস্তার করে তাঁকে বল্লেন, গেলুম, মাথা গেল, বাঁচাও। কথা মুখ হতে বের হতে না হতেই তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। আমরা ধরাধরি করে তাঁকে স্বীয় শয়নকক্ষে নিয়ে গেলাম।

বাটীতে হুলুস্থুল পড়ে গেল। আমি মামা বিনয় বাবু ডাক্তারের উদ্দেশে পাগলপ্রায় হয়ে ছুটলাম। মিনিট কয়েক পরেই তাঁকে নিয়ে ফিরে এলাম। তখন নয়ন সম্মুখে যে দৃশ্য দেখলেম, তা আর এ জন্মে ভুলতে পারিনি। পিতৃদেব অজ্ঞানাবস্থায় শায়িত, নয়নদ্বয় বিস্ফারিত, রক্তাভ। মামা বাবু, নাড়ী চক্ষুদ্বয় বক্ষস্থল ভাল করে পরীক্ষা কল্লেন। তৎপরে ঘাড় নেড়ে বলেন, মাথায় রক্ত উঠেছে, পীড়া শক্ত। তাঁর উপদেশ মত তৎক্ষণাৎ অন্যান্য বড় বড় ডাক্তারের জন্য নানা স্থানে লোক প্রেরিত হলো। নানা উপায়ে সংজ্ঞা উৎপাদনের চেষ্টা হলো কিন্তু কিছুই ফলবতী হলোনা। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সব শেষ হয়ে গেল! সন্ধ্যা ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই তাঁর প্রাণ বায়ু দেহ পিঞ্জর পরিত্যাগ করে চলে গেল!

অকস্মাৎ কোথা হতে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হলো এবং সোণার সংসার ছারখার হয়ে গেল। এমন তীক্ষ্ণ প্রখর বুদ্ধি, কার্য্যকুশলতা, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞান, অনিন্দ্য চরিত্র, এমন ভালবাসা-ভরা প্রাণ আরতো এজীবনে দেখতে পাব না। প্রাণ তাঁর জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছিল, নির্ম্মম সংসার বলছিল, তিনি চিরজন্মের মত চলে গেছেন, আর কখনো তাঁর সাথে দেখা হবে না! রহিল তাঁর স্মৃতি। তাহাই আমার জীবনে মরণে অমূল্য সম্পদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর শত চেষ্টা করেও পেলেম না।

কে বল্‌বে পাপ কি, পুণ্য কি? ভাল কি, মন্দই বা কি? দুঃখই বা কি, সুখই বা কি? অস্তিত্ব কি, অনস্তিত্বই বা কি? জন্মই বা কি, মৃত্যুই বা কি?

কে আমায় এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে, আমার প্রাণের ক্ষুধা নিবৃত্ত করবে?

ভগবান আছেন কি? যদি থাকবেন, তা হলে আমার কাতর ক্রন্দন উপেক্ষা করে তিনি কেমন করে অকালে আমার দেবতুল্য পিতৃদেবকে অপসারিত কল্লেন? আমাদের এ বিলাপধ্বনি কি কিছুই নয়? জগতের নিয়মের পরিবর্ত্তন করতে একটুও সক্ষম নয়? যদি তাই হয়, তা হ'লে ভগবানের কাছে কেঁদে কি লাভ? আমাদের দুঃখ সুখ কি কিছুই নয়? তা হলে এ ভগবানকে ডাকার কি প্রয়োজন?

মূর্খ মানব—বোঝেনা। তাই অকারণ কেঁদে কেটে আকুল হয়। মিছামিছি ভগবান ভগবান করে নিজে আকুল হয়, অন্যকে ও অস্থির করে তোলে। যখন জন্মগ্রহণ করেছি, তখন মৃত্যুমুখে পতিত হতেই হবে। যার আরম্ভ আছে, তার শেষ হবেই। কেঁদে ফল নেই। হৃদয় কঠিন কর, যেন একবিন্দু জল ও চক্ষু হতে ক্ষরিত না হয়। ভ্রান্ত মানব! জীবন সংগ্রামে ইহাই তোমার একমাত্র সহায়। অন্য কথা, অন্য শিক্ষা—সব মিথ্যা, মিথ্যা।

জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। ফল ফুল, লতা পাতা, বৃক্ষ, নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রতিমুহূর্ত্তে সবই পরিবর্ত্তিত হচ্ছে।

আমার দেহ, তাহার ও দিন দিন কত পরিবর্ত্তন হচ্ছে, আজ এ বেশ, কাল এ বেশ ধারণ কচ্ছে। আমার মন, সেই কি নিশ্চল? বাল্যকালের আশা আকাঙ্ক্ষা, কোথায় এখন? তখনকার ভাল, এক্ষণ মন্দে পরিণত হয়েছে।

পাপ পুণ্য করে কে? মরে কে, মারে কে?—আত্মা? কোথায় আত্মা? এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর জগতের সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত আত্মা নামে অবিনশ্বর কিছু আছে কি? কই, কেহ তাকে দেখেছে কি? শুনেছে কি? অনুভব করেছে কি? কেমন, সে কি প্রকার?

রজনীর প্রথম প্রহরে যে আলো জ্বল্‌ছিল, দ্বিতীয় প্রহরে ও সেই আলোই জ্বল্‌ছে, তৃতীয় চতুর্থ প্রহরে ও সেই প্রকার। কিন্তু প্রথম প্রহরের আলো ও অন্যান্য প্রহরের আলো কি এক? এক নয় কিন্তু লোকে ভাবৃছে একই আলো জ্বল্‌ছে। এই যে প্রথম ও চতুর্থ প্রহরের প্রজ্বলিত আলো—ইহাদের ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট এমন কি আছে, যে কারণে উভয়ে একই আলো স্বরূপে বিবেচিত হচ্ছে? আত্মা? না, কিছুই নয়। তবে কেন এমন উপলব্ধি হচ্ছে? ইহার কারণ, তৈল শলিতা বায়ু অগ্নি ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের সংযোগ-বিয়োগে দীপশিখা জ্বলছে, তারা এত দ্রুতগতিতে ফল প্রসব কচ্ছে এবং একটী কার্য্যের সহিত পরবর্ত্তী অন্যটীর এত নিকট সম্বন্ধ—যে মানুষ ভ্রান্তিবশে ভাবে পূর্ব্বাপর একটী আলোই জ্বল্‌ছে। ইহাই কি সঠিক উত্তর নয়? জগতের সকল বিষয়ই এই প্রকার। আমার 'আমি'ও এই প্রকার।

সবই পরিবর্ত্তন হচ্ছে—মরছে, বাঁচ্‌ছে, বাঁচ্‌ছে, মরছে—শুধু নামটার পরিবর্ত্তন হতেই একটু বিলম্ব ঘটে। প্রতিমুহূর্ত্তে নিখিল জগৎ পরিবর্ত্তিত

হচ্ছে, অথচ লোকে ভাবছে এই পরিবর্ত্তন-ক্রীড়ার ভিতর অপরিবর্ত্তনীয় অবিনশ্বর এমন কিছু আছে, যাকে ধারণ করে অন্য সব বিরাজ কচ্ছে, তাহাই আত্মা, তাহাই ভগবান। ভুল বিশ্বাস। দুঃখদাবদগ্ধ উপায়বিহীন মানবের পুঞ্জীভূত কাতর ক্রন্দনের মূর্ত্তি!

পিতৃদেব চলে গেলেন জন্মের মত। লোকে যাই বলুক, ধর্ম্মশাস্ত্র বড় গলা করে যাই প্রচার করুক, সাধু সন্ন্যাসীরা যতই বলুক, মৃত্যুর এ পারে কি ওপারে তাঁর সহিত আর দেখা হবে না। কে বল্‌বে, কোথায় কি অবস্থায় তিনি বিরাজ কচ্ছেন অথবা কচ্ছেন কি না?

মৃত্যু কিছু নূতন জিনিষ নয়। অহরহ তার বিকট লীলা দেখ্‌ছি। জানি, সকলকেই কালে তার কবলে পতিত হতে হবে। তবে কাঁদি কেন?

সবই বুঝ্‌ছিলাম অথচ বুঝ্‌ছিলাম নাও যেন। একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে মায়া। একটী অপসারিত কচ্ছে; অন্যটী সংসারের দিকে আকৃষ্ট কচ্ছে। এ মায়া কি? ভালবাসা কি? চক্ষের জল কি? বৃক্ষছেদন কল্লেও রস দৃষ্ট হয়। কিন্তু তার জন্য কে ভাবে? মানবের ক্রন্দন—এও কি তেমন কিছু একটা নয়? হৃদয় বেদনা কি? আমার চক্ষুজলে বিশাল পৃথিবীর কি ক্ষতিবৃদ্ধি? জগৎ পরিবর্ত্তিত হচ্ছে, মরছে, বাঁচছে,—বাঁচছে, মরছে। ধরিত্রী চিরযুবতী, বার্দ্ধক্য ইহার অঙ্গে স্থান পেয়েও পায় না। কি সুন্দর অথচ কেমন ভয়ঙ্কর এ পরিবর্ত্তন-লীলা, মৃত্যুলীলা। আত্মা মিথ্যা, ভগবান মিথ্যা, অন্ধ মানবের কল্পনা।

* * * * * *

মানুষ যতই কেন নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতে বিশ্বাস স্থাপন না করুক, সে ঘটনার দাস। নিজকৃত কার্য্য অপেক্ষাও যে সকল ঘটনার উপর কোনও হাত নেই, তাহাই তার জীবনের নিয়ামক।

বিলাত যাব, নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নবীন জীবন দেখ্‌ব—হৃদয় ছোট খাটো কত ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। সবই এক আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেল। বিলাত যাওয়াতো হলই না, এমন কি কলেজে পাঠ ও বন্ধ হবার উপক্রম হলো।

পিতৃদেবের অন্তর্ধানে সংসারের ভার অনেকটাই আমার উপর নিপতিত হলো। এতদিন বিদ্যাশিক্ষা করেছি, শুধু হেসে খেলে বেড়িয়েছি। চারিদিক আঁধার দেখ্‌তে লাগলাম।

ব্যবসায়—যা হতে গ্রাসাচ্ছাদন—কেমন করে চালাব? মা বারংবার সাহস দিয়ে বল্‌তে লাগলেন, ভয় কি বাবা? তাঁর আশীর্ব্বাদে তোমাদের কোন কষ্টই হবে না। তোমরা লেখা পড়া যেমন কচ্ছিলে তেমনি কর। গোমস্তা মথুরামোহন দ্বারাই কারবার চল্‌বে।

তাঁর বুদ্ধিমত্তায় আমার পূর্ণ বিশ্বাস কিন্তু এ বিষয়ে একমত হতে পাল্লেম না। এত বড় কারবার কি শুধু গোমস্তার দ্বারা চালান যাবে?

যা হৌক, পূর্ব্বেরই ন্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করতে লাগলাম।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শোক সন্তাপের ভিতর দিয়ে বৎসরেক কাল চলে গেল। নলিনী কয়েক মাস পরেই এফ, এ পরীক্ষায় পাশ হয়ে বৃত্তি লাভ কল্ল। আমিও ইংলিশে গোল্ড মেডেলিষ্ট ও এম এ উপাধি ভূষিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিষ্ক্রান্ত হলেম। সেবার কনভোকেশনের বক্তৃতায় আমার নামোল্লেখ করে, বড়লাট বাহাদুর কত সুখ্যাতি কল্লেন। আমি নবগৌরবে

বিমণ্ডিত হয়ে, হাস্যবদনে গৃহে এসে মাতার চরণে প্রণাম করতে, তিনি আনন্দবিহ্বলা হয়ে বারংবার স্নেহাশীর্ব্বাদ কল্লেন। কিন্তু, সেই মুহূর্ত্তে কোথা হতে অশ্রুরাশি উথলিয়া উঠিয়া তাঁর ও সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়নদ্বয় প্লাবিত করে দিল। আজ যদি পিতৃদেব জীবিত থাকতেন! Exp

* * * * * *

এ বিদ্যার বোঝা নিয়ে কি করব? সংসারের কোনও কাজেই তো ইহাকে লাগাতে পারব না। মনে হচ্ছিল কতকগুলি বোল আবৃত্তি কর্তে শিখেছি মাত্র। জীবন সংগ্রামে কয়টা তার কাজে লাগ্বে? ইংরাজী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি কিন্তু নিজের দেশের সাহিত্য, ইতিহাস, কাব্য, তার সম্বন্ধে কি জানি? নিজের দেশের বৃক্ষ লতা পাতা, কিছুই তো তার জানলেম না। বাঙ্গালী আমরা, কোথা হতে এলাম, কবে এদেশে এলাম, কোথায় আমাদের জাতির মূলশক্তি, কোথায় দুর্ব্বলতা, কিছুই তো জানলেম না। এই কি শিক্ষা? দেশের ভিতর আমি বিদেশী! 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মীঃ'—আমাদের দেশের প্রাচীন প্রবচন। বণিকের সন্তান হয়েও কই বাণিজ্যের তো কিছুই শিখ্লেম না। এ বিদ্যার জাহাজ নিয়ে কি করব? বুঝিবা শুধু এ বিদ্যার জ্বালায় অবশেষে সারা জীবন আমাকে অশান্তি, সংশয়, দুরাকাঙ্ক্ষা ও হিংসানলে জ্বলে পুড়েই মরতে হয়।

আমার পৈতৃক ব্যবসায়, তার কোন্ কাজে আমি লাগ্ব? মাল মসল্লার দর, দাদনদার, আরতদার ও দালালদের সহিত হিসাব নিকাশ, খরিদ্দার ও পাইকারদের সাথে দরদস্তুরি, আমি তো এ সকল কিছুই

জানিনে। যতই দিন যেতে লাগল, ততই স্পষ্ট বুঝতে লাগলেম, আমার দ্বারা এ ব্যবসা চালান দুষ্কর। আমার এত যত্ন কষ্টে অর্জ্জিত ইংরাজী-ভাষা ও ফিলছফির কোনও জ্ঞানই আমার কাজে আসবে না।

মা কিছুতেই ছাড়বেন না। লেকচার পূর্ব্বেই সম্পূর্ণ হয়েছিল। আমি আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেম।

ব্যবসায় গোমস্তার কর্ত্তৃত্বাধীনে এক প্রকার চল্‌তে লাগল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

এমন সময়, আর এক স্বপ্নাতীত বিপদ আমাদের শিরে নিপতিত হল।

বছর তিনেক হ'ল, শেখরনাথ বিলাত গিয়েছে। কত না আশা করে, তাকে সেখানে প্রেরণ করা হয়েছিল। অতিশয় বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ছাত্র বলে পূর্ব্বাপরই সে পরিগণিত। সকলেরই পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, সে বিনা ক্লেশে সিভিল-সার্ব্বিসে উত্তীর্ণ হয়ে আস্‌বে। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দুবার যখন তার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতার সংবাদ পৌছিল, তখন সকলেই তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌লো, এমন হবার কারণ কি?

যখন যে পরিমাণে অর্থ চাহিতেছে—মা অম্লানবদনে প্রেরণ কচ্ছেন। আমার বিলাত যাওয়া সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা অনেক দিন হতেই বন্ধ হয়েছিল কিন্তু তাঁর বড় আশা ছিল, জামাতা পরীক্ষা পাশ করে, তাঁর আনন্দবর্দ্ধন কর্‌বে। সে আশাও ভগ্ন হলো। জজ কিম্বা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়া শেখরনাথের পক্ষে আর সম্ভব রহিল না। যে সময়ের কথা বল্‌ছি, সে সময় সে ব্যারিষ্টারী পড়ছিল।

নলিনীকে বিবাহের পর হতে আগাগোড়া লক্ষ্য করে আস্‌ছি। আত্মীয় ও বন্ধুমহলে তাহার প্রখর বুদ্ধি ও সুচরিত্রের সুখ্যাতি ধরে না। স্বামীর অকৃতকার্য্যতার সংবাদে সে দিন দিনই ম্রিয়মানা হয়ে পড়ছিল। কি পিত্রালয়ে, কি শ্বশুরালয়ে কোথাও যেন সে আপনাকে আর পূর্ব্বের ন্যায় সুখী মনে করতে পাচ্ছিল না। তাহার কষ্টের বুঝি আরও একটী নিগূঢ় কারণ ছিল। কয়েক মাস হতে শেখরনাথের চিঠিপত্রের সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে আস্‌ছিল—এক প্রকার বন্ধ। দিন দিন আমার ভগ্নীর সুন্দর মুখখানি, আমার প্রাণকে ব্যথিত করে ম্লানভাব ধারণ কচ্ছিল

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ-প্রায়। আকাশ ভরা মেঘ। দুই এক ফোঁটা বৃষ্টির জল পড়ছে, বেশ জোড়ে বাতাস বইছে। আমি বাতায়ান সম্মুখে চেয়ারে উপবেশন করে আকাশে মেঘ ও জলের ক্রীড়া দেখ্‌ছিলাম, এমন সময় বাহিরে কে ডাক্‌লো, বাবু! টেলিগ্রাম।

ব্যবসায়ের সম্পর্কে টেলিগ্রাম প্রায়ই আস্‌তো—তাই তার নামে কখনও কোনও শঙ্কা হৃদয়ে স্থান পায়নি। কিন্তু, আজ যেন কোনও অনিশ্চিত বিপদের আশঙ্কায় প্রাণ দুর্ দুর্ কেঁপে উঠ্‌লো। খুলে দেখ্‌লাম বিষম সংবাদ। শেখরনাথে পীড়া, অবস্থা খারাপ—জ্বর ও যক্ষ্মাকাশ, টেলিগ্রামে টাকা পাঠাতে লিখিছে।

নিয়মিত সময়ে অর্থ প্রেরিত হলো, টেলিগ্রাম করা হলো, বিলাতে যে দু চারিজন আত্মীয় ছিলেন তাদের কাছেও টেলিগ্রাম করা গেল, আমাদের সাধ্য যাহা কিছুরই ত্রুটী হলো না। মাতৃদেবী আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে ভগবানকে ডাক্‌তে লাগলেন।

দিন কয়েক পরে আবার টেলিগ্রাম পেলাম, সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। শেখরনাথ ইহজগৎ পরিত্যাগ করে চলে গেছে!

সব কথা ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ল। শেখরনাথের আত্মম্ভরিতা ও দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাই তাহার অকাল মৃত্যুর কারণ। বিলাত যেয়ে সে নিজকে সংযতভাবে চালাতে পারেনি। শেষটা পাঠাভ্যাস অপেক্ষা শৌণ্ডিকালয় কি অন্যান্য কদর্য্যস্থানেই তাহার অধিক সময় ব্যয়িত হতো। ইহা হতেই তাহার পীড়া, পতন ও মৃত্যু!

* * * * *

মার কথা ভাবতে প্রাণ দুঃখে ফেটে যাচ্ছিল। এত আশা ভরসা সব ছারখার হয়ে গেল। একমাত্র কন্যা, তারও ঈদৃশ অবস্থা! কি বলে তাঁকে প্রবোধ দিব?

আর নলিনী! স্নেহময়ী ভগ্নী আমার! সরলতা ও পবিত্রতার মূর্ত্তি! তাকেই বা কি দিয়ে সান্ত্বনা দিব?

বালিকা, স্বামী কি ভাল করে বুঝল না, ভাল করে দেখ্‌ল না, অথচ তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাকে সমস্ত জীবন বৈধব্যযন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। হিন্দু শাস্ত্রমতে তার জীবনে এখন হতে আর কোনও উদ্দেশ্য নেই, শুধু যে স্বামীকে সে ভাল করে চিনল না, দেখল না, তার ধ্যান কর্‌তে কর্‌তেই জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করতে হবে। কদর্য্য বেশ ধারণ করে থাকৃতে হবে, কদর্য্য-আহার গ্রহণ করতে হবে—সমাজ হতে সে এক প্রকার অর্দ্ধ-বহিষ্কৃত। ইহাই ধর্ম্ম? আর ইহার মাহাত্ম্য প্রচারেই আমরা শতমুখ।

এমন অমানুষিক প্রথা জগতের কুত্রাপি নেই। যে সমাজে বিদেশ গমন কল্লে সমাজত্যাগী হতে হয়, যে সমাজের একশ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীকে কুকুর অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বিবেচনায় গৃহে প্রবেশ করতে দিতে পরাঙ্মুখ, মৃতস্বামীর সঙ্গে সঙ্গে যে সমাজে স্ত্রীকে ও চিতারোহণ কর্‌তে হয়,

এবং যে সমাজে বংশের ভবিষ্য-সন্তানগণের জননীকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর ন্যায় অজ্ঞানান্ধকারে আবদ্ধ করে রাখার নিয়ম, সে সমাজের চক্ষে অবশ্য রমণীর প্রতি ঈদৃশ ব্যবহার অস্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় না। কিন্তু জগতের অন্যান্য সভ্যজাতির লোকসমূহ দর্শনে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করে।

মা কাঁদ্‌ছিলেন। নলিনী আমার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বল্‌ছিল, দাদা! দাদা! আমার উপায় কি হবে? উপায়? উপায়?—মৃত্যু!

সকল বিপদের হাত হতে উদ্ধার আছে কিন্তু এ বিপদ হতে কোনও উপায় নেই। নলিনীকে কি দিয়ে প্রবোধ দিব?

* * * * *

মা ঠিক করেছিলেন, নলিনীকে আর কলেজে যেতে দিবেন না। আমি একমত হতে পাল্লেম না। আমি তাঁকে বুঝালেম, যদি নলিনীর পাঠের পূর্ব্বে কিছু প্রয়োজন ছিল, তবে এক্ষণে আর ও অধিক প্রয়োজন। পড়াশুনা নিয়ে থাক্‌লে, তাও দিনগুলি একপ্রকারে যাবে। একাকিনী, কাজকর্ম্মশূন্য অবস্থায় মৃত স্বামীর চিন্তা কর্‌তে কর্‌তে জীবন কর্ত্তন করা, ঈদৃশ আদর্শের ভিতর আমি কিছুই লোভনীয় দেখছিলাম না। কেবল পুরুষের সুখ বিলাসের জন্যই রমণীর সৃষ্টি? তার কি কোন স্বতন্ত্র সত্ত্বা নেই?

আমার পরামর্শ মতই কাজ হলো। নলিনী পূর্ব্বের ন্যায় কলেজে পাঠ করতে লাগ্‌ল। তার ম্লান মুখখানি দিন দিন আরও ম্লান হতে লাগল, কিন্তু পাঠের প্রতি মনোযোগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হলো। অভাগিনীর তাহাই এক্ষণ একমাত্র শান্তির উৎস। হিন্দু-বিধবার ন্যায় আশা আকাঙ্ক্ষা শূন্য দুঃখজীবন কার?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সময়ে সবই সহিয়া যায়। জল যেমন, প্রাণও বুঝি অনেকটা তেমনি, কোনটাই ভেঙ্গেও ভাঙ্গতে জানে না।

পিতৃদেবের অকস্মাৎ তিরোধান,—শেখরনাথের অকাল মৃত্যুতে সংসার চারিদিক আঁধার বোধ হচ্ছিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত একটা দুঃখের বোঝা সকলের হৃদয়ের উপর চেপে রইল।

ধীরে ধীরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখবেগ হ্রাস-প্রাপ্ত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সকলেই যেন বুঝিতেছিল, যে বিরহ-দুঃখ সহ্য কর্‌তেই হবে, যার উপর হাত নেই, তাকে উপেক্ষা করাই জ্ঞানীর কাজ! দুঃখকে মনে মনে বাড়াইয়া তোলায় কিছুই লাভ নেই।

ক্রমে মাতৃদেবীর অশ্রুবিসর্জ্জন কমে এল। নলিনী—সুশীলা, মাধুর্য্যময়ী, স্নেহময়ী—কয়েকদিন কেঁদে কেটে স্বীয় পাঠে পূর্ব্বাপেক্ষা মনোনিবেশ কল্ল।

আমি আবাল্য কলকাতাবাসী। প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্পর্কে আসা আমার পক্ষে কঠিন। সুন্দর বৃক্ষ, সুকুমার লতাপাতা, বিশাল নদী, সমুন্নত পর্ব্বত, শস্যপূর্ণ মাঠ, প্রাণী-জগতের প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনানিচয় দর্শনের আমার তেমন সুযোগ ছিল না। তথাপি কি জানি কেন প্রাণটী আমার চিরকাল প্রকৃতির পদতলেই পড়ে ছিল। কলকাতার রাজপথের পার্শ্বস্থিত বৃক্ষমাঝে কচিৎদৃষ্ট হল্‌দে পাখীটি দেখ্‌লে আমার হৃদয়তন্ত্রী আনন্দে বেজে উঠতো, লালদিঘীর পারে ও ইডেন উদ্যানে শীতসমাগমে যখন নানাজাতীয় লাল, নীল, সবুজ রঙ্গের মরসুমি ফুলগুলি ফুটে উঠ্‌তো, তখন আমি পুলকিত হতেম।

জীবন

মাস কয়েক হলো, কলেজের কোনও কার্য্যোপলক্ষে একটা স্থানে মাটী কেটে গর্ত্ত করা হয়েছিল। তখন চারিদিকের সৌন্দর্য্যের ভিতর, সেই শূন্যস্থানের কদর্য্য নগ্নতা আমাকে যেন বড়ই প্রপীড়িত কচ্ছিল। তার পর, সমস্ত বর্ষা কালটা গেছে, আমার সে দিকে যাওয়া ঘটে ওঠেনি।

আজ আশ্বিনের প্রভাতে কোনও কারণে সেখানে ভ্রমণ করতে যেয়ে দেখলাম, মানুষ যার কোনও সংবাদ নেয়নি, সেইস্থানটীকে প্রকৃতি এ কয়মাসের ভিতর কেমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে।

স্থানটীর দিকে দৃষ্টি কচ্ছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে নিজ জীবনের কথা মনে হচ্ছিল। প্রকৃতির নিয়মই এপ্রকার। একহস্তে ভাঙ্গে, আর একহস্তে গড়ে। কারো জন্য সে বসে থাকে না। নীরবে ফুল ফুটছে, নীরবে ঝড়ে পড়ছে, আবার ফুটছে। এক হাতে যদি বা ব্যথা দিচ্ছে, অন্য হাতে চোখের জল মোছাচ্ছে। অশান্তি সেই আনয়ন কচ্ছে, আবার শান্তিবারিও সেই প্রক্ষেপ কচ্ছে।

অনুমান তিনটা বেজে গেছে। এমন সময় কলেজের গাড়ী হতে নেমে এসে নলিনী সহাস্যবদনে আমায় বল্লো, দাদা! শুনেছ, গত মাসের মান্থলি (monthly) তে আমি ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ দুটাতেই ফার্ষ্ট হয়েছি, ফিলছফিতে সেকেণ্ড হয়েছি।

নলিনীর মুখে হাসি, আবার যে দেখব, ইহাতো আমি কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। তদ্দণ্ডে আমি আকাশের দিকে চাচ্ছিলাম এবং প্রভাতে দৃষ্ট সে স্থানটীর কথা ভাবছিলাম। সত্যই প্রকৃতি যাদুকর। দুঃখ ইহার বক্ষে স্থান পায় না। নলিনীর সীমন্তের সিন্দুর-বিন্দু বহুদিন হতে অন্তর্হিত হয়েছে, হৃদয় দুঃখে ভরা। কে ভেবেছিল, আবার তার অধরপ্রান্তে সোণার হাসি দেখা দিবে?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আমার প্রাণটী কি এক নূতন ধাতুতে গড়া। সংসারের দুঃখ কষ্টে তেমন বিচলিত হত্ত না। আমার মন আপনা হতেই বুঝে নিয়েছিল, এ সংসারে থাক্‌তে হলে প্রিয়জন-বিরহ সহ্য করতে হবেই; অনেক সময়ই কণ্টকে চরণ বিদ্ধ হবে, তজ্জন্য অনুশোচনা বৃথা। মনে করোনা ভালবাসা-শূন্য ছিলাম। তা হলে, আমি হেমকে এত ভালবাস্‌তাম কেমন করে? ক্লাশের এতগুলি ছাত্রই বা আমাকে ভালবাসার জন্য এমন ব্যাকুল হবে কেন?

সব সময়ই, সকল বিষয়ের আমি ভাল দিকটা দেখ্‌তাম। তেমন বিপদের ভিতর ও তাই বুঝি কিছু না কিছু সান্তনার জিনীষ খুঁজে পেতেম।

হেম এইজন্য আমায় কত না প্রশংসা কত্ত। সে বল্‌তো, ধনীর ছেলে, দুঃখের মুখ কখনো দেখিনি, তাই আমার মনের ঈদৃশ ভাব। ইহা বোধ হয়, তার ভুল ধারনা। যে ধনী, সে দুঃখে নিপতিত হলে যাতনায় অস্থির হয়, ইহাইতো সচরাচর দেখছি। আমার মতো আমি কাহাকেও বড় দেখ্‌তেম না।

ইহার কারণ আমি যা ঠিক করেছি, তাহা এই। কেন যেন সংসারের অনিত্যতার অসারতার ভাবনা আমাকে সর্ব্বক্ষণই অনুসরণ কর্‌তো। প্রথম প্রথম বড়ই বিশ্রী লাগ্‌তো কিন্তু শেষে দেখলাম, এভাবনা যতই ভাবি, ততই প্রাণের ভিতর কেমন একটা শান্তির ভাব এসে উদয় হয়, মৃত্যুচিন্তা দূরে সরে যায়।

বোধ হয়, বাল্যকাল হতে অর্থের সম্পর্কে এসে তার প্রতি অনেকটা আকাঙ্ক্ষা-শূন্য হয়ে পড়েছিলাম। যার যা আছে তাতে কেহ সন্তুষ্ট নয়। আমার অর্থ সম্পদ ছিল, হাতে ধরতেই দেখলাম, দূর্ব্বাদলোপরি কুয়াশার আবরণের মত উড়ে গেল, কিছুই নয়। মানুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা মিটাতে ইহাদের ক্ষমতা কই?

কিন্তু ইহাও দেখ্‌ছিলাম, জীবনের অসারতার কথা ভাবতে গিয়ে, আমার কার্য্যকরী শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে আস্‌ছিল। পাঠে পূর্ব্বের ন্যায় মন বস্‌তনা। দিন দিন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছিলাম।

এমন সময়ে কোথা হতে মানবের বিচিত্রতাময় লীলা-উজ্জ্বল এক অভিনব আদর্শ আমার হৃদয়পটে জেগে উঠলো। কত আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে, সাহস ও বীর্য্যের উপর নির্ভর করে বিশ্বসভায় কতজাতির কতলোক যেয়ে স্থান নিয়েছে। অজানিত, অবহেলিত পরপদদলিত যারা ছিল—তাদের বিজয় গর্ব্বে চতুর্দ্দিক মুখরিত। আমার স্থান কই? শুধু গৃহ কোণে, মায়ের দুলাল আমি, তাঁর আঁচল ধরে ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ নিয়ে পড়ে আছি। সংসার অসার অনিত্য কে বলে? যে দরিদ্র, দুঃখপীড়িত, বুভুক্ষিত তার পক্ষেই সংসার অসার। ভিক্ষান্নজীবী, জটাবল্কলধারী ব্রাহ্মণের পক্ষেই সংসার অসার, মানবরাজের পক্ষে নয়। কেন জড়িমাজড়িত তনু নিয়ে, কীটানু হয়ে থাকব? এই গৃহ কোণই কি আমার স্থান? তা হলে মানব হয়ে কেন জন্মে ছিলাম?

পিতৃদেব চলে গেছেন, নলিনী বৈধব্য-যন্ত্রণা-ক্লিষ্টা—এসব মহাকষ্টের বিষয় সন্দেহ নেই কিন্তু এর জন্য এত চিন্তা ভাবনার কি প্রয়োজন? বিশাল প্রাণী জগৎ, প্রাণময় উদ্ভিদ জগৎ—কই তাদের দুঃখে কয়জন কাঁদে? কাঁদবার কি দরকার? এক হস্তে চক্ষুর জল মুছতে হবে, অন্য

হস্তে কর্ত্তব্যের লাঙ্গল চালিত করতে হবে? যতদিন বেঁচে থাকব, নিজকে ফুটিয়ে তুলব। কেঁদে কেটে কি লাভ?

আমার স্নেহময়ী ভগ্নীকে কি আর সুখী দেখতে পাব না? হয়েছে বিধবা—স্বামী ব্যতীত কি রমণীর জীবনযাপন অসহনীয় বা অসম্ভব?

চেয়ে দেখলাম, জগৎ ব্যাপিয়া রমণীগণ অসংখ্যভাবে অসংখ্য কাজে নিজ নিজকে নিয়োজিত করে সুখী ও ধন্য হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে যে দেশে তাদের জন্ম তাকে গৌরবান্বিত কচ্ছে। কেবল কি পূণ্য বঙ্গভূমিতেই রমণীজীবন পুরুষের স্বার্থরূপ মহাযজ্ঞে চিরকাল ভস্মীভূত হবে? কেবল কি পুরুষই স্বাধীনতার মুক্তবায়ু উপভোগ করবে, জ্ঞানবৃক্ষের সুমধুর ফল আহরণ করে ধন্যজীবন হবে, জগতের বক্ষে কীর্ত্তিচিহ্ন রেখে যাবার সুযোগ পাবে—আর রমণী তার পদোদক পান করতে করতে অথবা তার দেহাবসান হলে, তার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আশাশূন্য অদ্ধমৃত অবস্থায় জীবন যাপন করবে?

মানব সভ্যতার উন্মেষ হতেই—পুরুষ রমণীর উপর সর্ব্ববিষয়ে অত্যাচার করে আসছে। গো মহিষের ন্যায় তাহাকে ক্রয় বিক্রয়ের পদার্থরূপে ব্যবহার করে এসেছে। শুধু শারীরিক পাশবিক বলের চক্ষেই ঈদৃশ নীতি অনুমোদিত। তা না হলে, এমন কি অধিকার রয়েছে তাহার, তাকে চিরকাল এমনভাবে অত্যাচারিত করবার, পদদলিত রাখবার? অন্যত্র তাও রমণীজীবন পূর্ব্বাপেক্ষা কথঞ্চিৎ ক্লেশশূন্য হয়েছে—কিন্তু মোহান্ধ কুসংস্করাচ্ছন্ন ভারতভূমিতে তাহার অবস্থা পূর্ব্বাপর প্রায় একই রয়েছে।

না, স্নেহময়ী ভগ্নী! তোমার দেশের শাস্ত্রকারগণ যাহাই বলুক না কেন, তুমি শুধু পুরুষের হস্তে ক্রীড়নক হয়ে থাকবার জন্য সৃষ্ট হয়ও নি।

তোমারও জগতে ভিন্ন স্থান রয়েছে, স্বাধীনভাবে অস্তিত্ব অনুভব করবার ক্ষমতা রয়েছে। শেখরনাথ গিয়েছে তার জন্য দুঃখ কচ্ছি কিন্তু কেবল তার জন্য দুঃখ বা চিন্তা করা, অথবা শ্বশুরালয় বা ভ্রাতৃগৃহে অর্দ্ধ দাসীরূপে জীবন যাপন, তোমার জীবনের কর্ত্তব্য আমি মনে করি না।

যাহা হবার হয়েছে। অতীতের জন্য দুঃখে লাভ নেই। এস, তুমি তেমার এবং আমি আমার ভাবে মানুষ হই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সুন্দর শরৎকাল এসে উপস্থিত হলো। বর্ষার বারিধারা বন্ধ হয়ে এল। শুভ্র খণ্ড মেঘের অন্তরালে সোণার তপন দেখা দিল। প্রকৃতি নবভাব ধারণ কর্‌তে লাগ্‌লো।

পূর্ব্বেই বলেছি, প্রতিবৎসর এ সময় আমরা কলকাতা হতে অন্যত্র বেড়াতে যেতাম।

এ কয়েক বৎসর যাবৎ, এ শারদোৎসব উপভোগ আমাদের বন্ধ হয়েছে। কারও মনেই সুখ নেই, বিশেষতঃ শেখরনাথের অকাল তিরোধানে সকলেই নিতান্ত ম্রিয়মান। কোনও প্রকারে কলকাতাতেই আমাদের জীবন অতিবাহিত হচ্ছিল।

শেষে সে জীবন অসহনীয় হয়ে উঠ্‌লো। দুঃখের বোঝা আর কত কাল বহন করা যায়?

এবার আশ্বিন মাস আস্‌তেই মাকে বল্লাম, মা, এবার চল একটু বেড়িয়ে আসি। আর তো কলকাতা ভাল লাগে না।

নলিনীরও আপত্তি নেই কিন্তু মাতৃদেবী যেন প্রস্তাবটী তেমন প্রীতিপদ মনে কল্লেন না।

কারণ বুঝতে বিলম্ব হলো না। বিধবা কন্যা নিয়ে কোথায় যাবেন? লোকের সম্মুখে মুখ দেখাতে ক্ষোভে লজ্জায় চক্ষে আপনা হতেই জল উথলিয়া উঠে!

যা হোক, অবশেষে তিনিও সম্মতি জ্ঞাপন কল্লেন। ঠিক হলো, আমরা পুরীতে যেয়ে মাসেক কাল বাস করবো। বাড়ীভাড়া করবার জন্য নিতাইদাদা ও আর একজন লোককে পাঠিয়ে দিলাম।

ক্রমে যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হয়ে এলো। ঠিক হলো, কলকাতা হতে চাঁদবালি পর্য্যন্ত ষ্টীমারে ও তৎপরে জাহাজে যেতে হবে।

বেলা অনুমান চারি ঘটীকা। বাটীর চাকর চাকরাণী জিনীষ-পত্রাদি গোছাইতে ব্যস্ত। দ্বারদেশে গাড়ী সজ্জিত। কিন্তু কারও হৃদয়ে তেমন আনন্দ নেই। মার দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম তাঁর চক্ষু জলভারাক্রান্ত। সকলেই যেন কাহার অভাব অনুভব কচ্ছিল। মা ও নলিনী কাঁদছিল।

বাড়ীঘর, ধনসম্পত্তি সবই পূর্ব্বের ন্যায় রয়েছে অথচ একজনের অন্তর্ধানে কিছুই যেন আর আনন্দ দান কচ্ছে না।

কিছুই বুঝ্‌তে পারি না,—সুখই বা কি দুঃখই বা কি? কেনই বা কাঁদছি, কেন হাস্‌ছি? এই যে চক্ষের জল, হৃদয়ের হা হুতাশ, এতে জগতের কি? বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কি? মেদিনীর বক্ষভেদ কল্লে সলিল রাশি উদ্গত হয়, মানুষের হৃদয়ভেদ কল্লেও চক্ষে জল দেখা দেয়, কে বল্‌বে উভয়ে কি পার্থক্য? অন্যান্য প্রাণীসমূহের ন্যায় মানবের শোক-দুঃখও তাহার দেহ ও মনের ধর্ম্ম, তাহার দ্বারা জাগতিক কোনও নিয়মের কোনও বৈলক্ষণ্য সম্পাদন কভু হয়েছে কি?

কিন্তু কৈ, এ বিজ্ঞান নিয়ে তো সংসারে চলা যায় না। তা হলে যে সংসারের সুখ আশা উদ্যম সবই এক ফুৎকারে উড়ে যায়, জীবন উদ্দেশ্য বিহীন হয়ে পড়ে। ভুলই দুঃখ, ভুলই সুখ।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই ষ্টীমারে উঠ্‌লেম। কতকক্ষণ পরই ছেড়ে দিল।

সন্ধ্যাকালীন গঙ্গার দুই পার্শ্বের গ্রাম সমূহের অপূর্ব্ব হরিৎ-শোভা দর্শনে আমার হৃদয় পুলকিত হচ্ছিল। মাঝে মাঝে নদী তীরবর্ত্তী সৌধ সমূহের দৃশ্য প্রীতি উৎপাদন কচ্ছিল। ক্রমে গ্রামের পশ্চাতে সূর্য্য অস্তমিত হলো।

জাহাজে তেমন লোক নেই। আমি একাকী সম্মুখভাগের ডেকের উপরে চেয়ারে উপবেশন করে শ্যাময়মানা সান্ধ্য প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হচ্ছিলাম।

সন্ধ্যা শান্তিদায়িনী—হৃদয়ের উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার কর্‌তে লাগ্‌লো। দিবসের কোলাহল কমে আসছিল—আমার হৃদয়ের কোলাহলও হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল। একা সে অবস্থায় থাকৃতে থাকৃতে মনে হচ্ছিল, জীবন কি মধুর! চারিদিকের আঁধারে আলোতে মিশ্রিত ম্লানময়ী প্রকৃতি কেমন উপভোগ্যা! এ দৃশ্যটী, এ ভাবটী যদি চিরকালের জন্য তিষ্ঠিয়া যায়। কিন্তু কৈ, তাহা হয় কৈ?

দেখ্‌তে দেখ্‌তে, রজনী এসে উপস্থিত হলো। তখন একটু জোড়ে বাতাস বহিতেছে। আঁধারের ভিতর ফেনাঙ্কিত তরঙ্গরাশি ভেদ করে শব্দমুখর জাহাজখানি দ্রুতবেগে চলেছে। মাঝে মাঝে আকাশে নক্ষত্র নিচয় দৃষ্ট হচ্ছে। প্রবলবেগে বায়ু এসে মুখে চোখে লাগ্‌তে লাগ্‌লো। ক্রমে, আকাশপটে মেঘখণ্ড সমূহ দৃষ্টিগোচর হতে লাগ্‌লো—সব দিক দেখে বোধ হতে লাগল—শীঘ্রই ঝড় আসবে। শেষে ডেকে থাকা দুষ্কর হলো। কক্ষে ফিরে এলাম।

তার পরদিন, চাঁদবালি এসে ভিন্ন জাহাজে আরোহণ কল্লেম। জীবনে আমার এই প্রথম সমুদ্র দর্শন। ইহার পরেও কতবার এ দৃশ্য দেখেছি, হৃদয় একই ভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। জ্ঞানও কাব্যের মহা সম্মিলন স্থান—সাগরের বেলাভূমি। সম্মুখে দিগন্ত প্রসারিত নীল সলিল শোভা, উর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, তরঙ্গ ভঙ্গে সমুদ্রবক্ষ আলোড়িত এবং তটদেশে সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে তরঙ্গসমূহ ভেঙ্গেচুরে অস্থির হচ্ছে। জাহাজের উপর দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখছিলাম—সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয়াভ্যন্তর ও সম্মুখস্থ অনন্ত বিস্তৃত বিরাট দৃশ্যের অনুরূপ কি এক বিরাট ভাবের দোলায় দুলিয়া উঠিতেছিল। আমি যে ক্ষুদ্র—তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেলাম।

কতকক্ষণ পরে জাহাজ ছেড়ে দিল। একদিন একরাত্রি বিনা বিশ্রামে চলে তৎপর দিবস প্রাতে পুরীতে জাহাজ লাগ্‌লো।

লোকজনের পূর্ব্ব হতেই বন্দোবস্ত ছিল, চিন্তার কোনও প্রকার কারণই ছিল না। জাহাজ হতেই দেখে মনে হলো কানাই দাদা তীরে দাঁড়িয়ে আছে।

একটু দৃষ্টি কত্তে দেখ্‌লাম, তার পার্শ্বে একটী ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে তার সাথে কথাবার্ত্তা বল্‌ছে। লোকটীকে যেন চেনা চেনা বোধ হচ্ছিল। প্রথমত ভাল করে মুখ দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম না। বাইনকুলারটী একটু ঘুরিয়ে ধরতেই দেখলেম—আর কেউ নয়—হেম। কয়েক মাস যাবৎ তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ নেই। সে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হতে পাশ করে, আসামের দিকে নিজ ভাগ্য পরীক্ষার জন্য চলে গেছে। তাহার পিতাও অন্যান্য অনেকে চাকরীর চেষ্টা কর্‌তে বলে ছিলেন—কিন্তু সে ঘৃণায় সে সব উপদেশ প্রত্যাখ্যান করেছে। আমার সাথে আলাপে একদিন

বলেছিল, চাকরীতে কি সুখ তা বাবার জীবন দেখেই বুঝতে পাচ্ছি। না খেয়ে মরব তাও কারো চাকর হব না। হেমেরই উপযুক্ত কথা। তার দর্শনেই কি এক সুখতরঙ্গ দেহের ভিতর দিয়ে খেলে গেল। এখানে যে তাকে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। আমরা যে পুরীতে যাচ্ছি এ সংবাদ অবশ্য তাকে দিয়েছিলাম কিন্তু সে যে এসে উপস্থিত হবে—তা কখনো মনে স্থান দেইনি।

জাহাজ লাগতেই সে তড়িৎ পদে উপস্থিত হলো। দেখ্‌লেম ইউনিভার্সিটীর অত্যাচারেও যে দেহকে তেমন দুর্ব্বল করতে পারেনি, তাহা এক্ষণে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ভাব ধারণ করেছে। স্বাস্থ্যসম্ভূত একটী প্রীতিপদ ভাব সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাচ্ছে।

পূর্ব্বেরই ন্যায় তার হাস্যবদন—সর্ব্ববিষয়ে নিশ্চিন্ততার ভাব। মাকে এসে প্রণাম কল্ল, আমাকে বিজয়ার আলিঙ্গন দিল, কিন্তু নলিনীর দিকে চাহিতেই কেমন এক বিষাদের ছায়া তার বদনের উপর এসে পড়লো। এমন বুদ্ধিমতী, সরলা, স্নেহশীলা, সুকুমারী। তার দুঃখ দর্শনে কার্ না হৃদয় দুঃখে উচ্ছলিত হয়ে উঠ্‌বে?

সমুদ্র-তীরেই ছোট্ট বাসাটী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সম্মুখে ক্ষুদ্র বাগান। আমাদের সকলেরই বড় মনোমত হলো।

আমাদের সুখের পক্ষে যা প্রয়োজন, সবই যেন তখন একত্রিত হয়েছিল।

গৃহের সম্মুখেই মহাসাগরের মনোমোহন দৃশ্য, সুন্দর সৈকত ভূমি, প্রকৃতির অপরূপ প্রকাশ। প্রত্যূষে সমুদ্র-গর্ভ হতে অরুণ তপনের আবির্ভাব, ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণীব্যাপ্ত সাগরবক্ষে ধীবর বালকগণের কৌতুকময় জলক্রীড়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সারাদিবসের পর সমুদ্রের কোলে

অকস্মাৎ সূর্য্যের অস্তগমন, সবই আনন্দদায়ক। প্রভাত ও সান্ধ্য অনিল কেমন স্বাস্থ্য ও আনন্দে ভরা। আমি ও হেম প্রায়ই সন্ধ্যার সময় সমুদ্র-উপকূলে বেড়িয়ে বেড়াতেম। নলিনীও মাঝে মাঝে যোগদান করত।

হেম মহা তুষ্ট—আমাকে না জানিয়ে সপ্তাহ পূর্ব্বে পুরীতে এসে বসে আছে।

যেখানে সে,—সেখানেই আমার স্বর্গ। সে না থাক্‌লে যে পুরীর জীবন কতটা ভাল লাগ্‌তো—বল্‌তে পারি না। সে ডাক বাঙ্গলায় বাস কচ্ছিল, আমাদের বাসায় নিয়ে এলেম।

জীবনটী যেতে লাগ্‌লো—বেশ। ঘুম হতে উঠে চা পান শেষ করে আমরা ভ্রমণে বহির্গত হয়ে যেতেম। কখনও বা সমুদ্র তীরে, কোনদিন বা মন্দির সম্মুখে, কখনও বা অন্যত্র বেড়াতেম। সাড়ে নয়টার সময় গৃহে প্রত্যাগমন। তখন আমার সুচতুরা স্নেহময়ী ভগ্নী দ্বারে প্রতীক্ষা করে থাক্‌তো। তৎপরে হেম ও আমি যে যার কক্ষে চলে যেতাম। সেখানে পত্রিকা পাঠ, চিঠিলেখা ইত্যাদি কাজে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত চলে যেত। তার পর স্নানাহার। অবশ্য টেবিলে বসেই খেতাম, মাটীতে খাওয়া অনেকদিন হতেই উঠিয়ে দিয়েছি। দরিদ্র ভিক্ষাবৃত্তিপ্রধান ব্রাহ্মণের শিক্ষায় কি সব কুপ্রথাই সমাজে স্থান নিয়েছে? এ-সব ভুলতেও আমাদের কত বছর যাবে? হেমের সাথে এক টেবিলে বসে আহার করতে কত আনন্দ। মা কাছে বস্‌ত, নলিনীও এসে বস্‌ত। গল্পসল্প ও আমোদ আহ্লাদের ভিতর আহারটী শেষ হতো।

আহারের পর বারটা হতে দেড় ঘটীকা পর্য্যন্ত যার যার কক্ষে বিশ্রাম। তৎপরে আমি নলিনীর কক্ষে যেতাম। সে কখনও সূঁচি শিল্পের কার্য্যে অথবা কোনও চিত্রাঙ্কনে নিযুক্ত থাকৃত। উভয় কার্য্যেই

তার আশ্চর্য্য নিপুণতা ছিল। মাঝে মাঝে আমিও চিত্রাঙ্কনে চেষ্টা কত্তাম।

বেলা তিনটায় হেমের ঘরে একত্র হতাম। তখন আবার চা পরিবেশন হতো, জল খাবারও বিশেষ বন্দোবস্ত থাকৃত। নলিনীই সব পরিবেশন করত, মাও চেয়ারে উপবেশন করে গল্পে যোগ দিতেন।

বেলা পড়ে আসতেই ভ্রমণে নির্গত হতেম। সন্ধ্যায় গৃহে ফিরে আসতাম—তখন প্রায়ই গান বাজনা হতো। নলিনীর সুমিষ্ট স্বর আমাদের চিত্ত বিমোহন করত। যে দিন গান না হতো সেদিন রজনীতে ইজিচেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় উপবেশন করে কথাবার্ত্তায় রত থাকৃতেম। রাত্রি দশটার সময় যে যাহার শয্যায় আশ্রয় নিতো। বিদেশে জীবন যাপনের সুখই এই যে, সংসারের প্রাত্যহিক জীবনের চিন্তা হতে একটু দূরে থাকা যায়।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কয়েক মাস হতেই মাঝে মাঝে একটা কথা শুনতে পাচ্ছিলাম—আমার বিবাহ।

মা আমাকে এ বিষয়ে এতদিন একবারও জিজ্ঞাসা করেননি। কিন্তু, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহার ব্যবহারে নিতান্ত আশ্চর্য্যান্বিত হচ্ছিল। বাঙ্গালীর ছেলে, এম, এ, পাশ, ধনী অথচ বিবাহের কথাটী মাত্র নেই—এ কি অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যাপার। মা কিন্তু সকলকে একই উত্তর দিতেন, নিতান্ত ছেলে মানুষ, বয়স হোক,

লেখা পড়া শেষ হোক, সংসারের কাজ কর্ম্ম বুঝে নিক, যখন ইচ্ছে হয় নিজেই দেখে শুনে বিয়ে করবে, তার জন্যে এমন চিন্তা কি ?

বেশ ছিলাম। কিন্তু পুরী আগমনের পর হতে বিবাহ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা প্রায়ই কর্ণে পৌঁছতে লাগ্‌লো। কারণ খুঁজতেই দেখ্‌লাম—এ সব হেমেরই কাজ। সে বুঝি নিতান্ত বিনা মতলবে এবার আমাদের এখানে আসেনি।

ব্যাপারটা শেষটা অসহ্য হয়ে উঠ্‌লো। গোপনে অস্ত্রপ্রয়োগ হচ্ছে। মনে মনে ঠিক কল্লাম, দরকার কি এমন ভাবে এক পক্ষ হতে কেবল নীরবে অস্ত্রাঘাত ভোগ করা।

সে-দিন বৈকালে জল যোগের পর আমি হাস্‌তে হাস্‌তে পিরাণের আস্তিন গুটিয়ে হেমকে বল্লাম, যুদ্ধং দেহি।

সে হেসে বলে উঠ্‌লো,—কিসের যুদ্ধ? আমি উচ্চৈস্বরে বল্লাম, কাপুরুষ! কায়স্থ কুলাঙ্গার! তোমার ঈদৃশ কীর্ত্তি? গোপনে গোপনে যে বাণ নিক্ষেপ কচ্ছ, তা বুঝি জান্‌তে আমার বাকী আছে? বল, তোমায় কি শাস্তি বিধান করব?

হেম বুদ্ধিমান্, বুঝ্‌তে তিল-বিলম্ব হলোনা। সে হেসে বলে উঠ্‌লো, নরাধম! বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক! চতুর্বিংশ বৎসর প্রায় উত্তীর্ণ হতে চল্লো, তথাপি তুমি পবিত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে না। ভীষণ পুন্নাম নরক হতে ত্রাণ পাবার কি উপায় করেছ? বঙ্গ মাতার কুসন্তান! দেশ-জননী তোমার দিকে কি সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন,—অপদার্থ! তুমি কি তার কোন সংবাদ রাখো? বাঙ্গলায় হিন্দুর জন সংখ্যা দিন দিন হ্রাস প্রাপ্ত হচ্ছে, তার বৃদ্ধির সাপক্ষে তুমি কি কল্লে? এই ভাবে বিবাহ না করে, শস্য-শ্যামলা মলয়জশীতলা বঙ্গভূমিকে তুমি জন-শূন্য

শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্যে পরিণত করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছ? ধিক্ তোমার বিদ্যায়! ধিক্ তোমার জ্ঞানে! ধিক্ তোমার স্বদেশহিতৈষণায়!

সুর নামিয়ে হেসে বল্লাম, তুমি তো বেশ চালাক দেখছি, নিজে বিয়ে করবেনা অথচ আমার জন্য মাকে বারংবার বলা হচ্ছে। এ সব কেন?

হেম। বলব না?—একশবার বলব। যা তোমার জন্য সুরেশ! এবার দেখে এসেছি, দেখ্‌লে তুমি পাগল হয়ে উঠ্‌বে। এমন সুন্দরী মেয়ে আমি তো দেখিনি, তুমিও দেখনি, বুঝি কেহ কখনো দেখেনি।

আমি। তা হলে তুমিই কেন নুরজাহানকে গ্রহণ কর না? আমার প্রতি এত অনুগ্রহ কেন?

হেম। তাও কি সম্ভব? আর তা হলে বন্ধুর প্রতি ভালবাসা দেখান হলো কৈ?

আমি। আমি বিয়ে কচ্ছি না, তুমি যতই কেন লোভ না দেখাও।

হেম উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, করবে, করতে বাধ্য।

একটু অপেক্ষা করে সে আবার বল্ল, কেন হে সুরেশ! এমন অন্যায় আপত্তি? পড়া প্রায় শেষ হয়েছে, টাকা পয়সার অভাব নেই, বিশেষত মার সুখের জন্যে ও তো তোমার বিয়ের দরকার।

আমি। ওসব বদারেসেনের ভিতর আমি যেতে চাই না। বেশ আছি—কোথা থেকে আবার আপদ এসে জুটবে।

সে বারংবার বিবাহের কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। আমার মানসপটে তখন আমার ভগিনীর বিষাদময়ী মূর্ত্তিখানাই ভেসে উঠ্‌ছিল। যে গৃহে তার বাস, সেখানে বিবাহোৎসব, নববধূর আবির্ভাব, অসম্ভব!

হেম অনুরোধ করতে লাগ্‌লো, আমিও প্রতিবারই অসম্মতি প্রকাশ করতে লাগ্‌লেম। অবশেষে আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, পরের উপর

তো খুব জোড়ে বক্তৃতা হচ্ছে, তুমি নিজে বিয়ে কর না কেন ? তোমার ও তো বয়স হয়েছে—তোমার বিয়ে হচ্ছে না কেন ?

কি আশ্চর্য্য ! প্রফুল্ল-বদন হেমের মুখ হঠাৎ কালকাদম্বিনীর ন্যায় গম্ভীর ভাব ধারণ কল্ল। একটু বিলম্ব করে সে কাতর ভাবে আমার দিকে চেয়ে বল্ল, সুরেশ ! ভাই ! আমার কথা বলোনা। আমি বিয়ে করব না। এখন তো নয়ই, যদি কখনো করি, তোমায় জানাব। আমায় মাপ কর ভাই !

ভাল করে কিছুই বুঝিতে পাল্লেম না। সে তো এ পর্য্যন্ত আমার কাছে কোন কথাই গোপন করেনি। আজ কেন তার ঈদৃশ ভাব ? কি জানি, বছর খানেক দেখা হয়নি, হয়তো বিবাহ সম্বন্ধে হৃদয়ে কোথায়ও আঘাত পেয়েছে, যার জন্য সে কথা উত্থাপিত হতেই, প্রাণে ব্যথা পায়। বাল্যকালেই মাতৃহীন, সংসারে বিমাতা। পিতার ভালবাসা হতেও একপ্রকার বঞ্চিত। ভাবলেম, হয়তো বা তাদের সঙ্গে তার কোন মতদ্বৈত হয়েছে। আমি আর কোনও উত্তর করলাম না।

আলোচ্য বিষয়টীকে অন্যদিকে একটু ঘুড়িয়ে বল্লাম, বিবাহ আমাদের দেশের সর্ব্বনাশের একটী প্রধান কারণ। পরিনাম না চেয়ে বিবাহ এবং বাল্য বিবাহ হতেই আমাদের সমাজের শোচনীয় অবস্থা।

হেম হেসে বল্ল, তোমার সম্বন্ধে তো আর এসব কথা খাটে না। যে সমাজে যে সকল রীতিনীতি আছে, তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে।

আমি। আছে বৈ কি ? তোমার এ সম্বন্ধে মত কি ? আমার তো বোধ হয় ইহার কারণ, আমাদের শাস্ত্রকারগণের সতীত্বের, নারী জীবনাদর্শের অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা। রমণী জিনিষটী, পুরুষের চিরকালই মহা

লোভনীয়। পূর্ব্বকালে একটী দুটী করে যিনি যতটীর অধিকারী হতে পারতেন, ততই আপনাকে ভাগ্যবান্ ও সুখী মনে করতেন। কিন্তু, কষ্টের বিষয় এই জন্তুটাকে পোষমানান সব সময় সহজ ব্যাপার নয়। তাই তাকে জোড় করে ঘরের ভিতর পুরা হয়েছে। কিন্তু শুধু হাত পা বাঁধলে হবে কি, সঙ্গে সঙ্গে মনটাও বাঁধার দরকার। তাই তার কাছে অহরহ প্রচার হচ্ছে—স্বামীই তার দেবতা, তার শ্রীচরণ সেবাই তার একমাত্র কর্ত্তব্য, তাতেই তার মুক্তি, মোক্ষ লাভ। কি দেবতা রে? বাহিরে সারাদিন যেখানে সেখানে লাথি গুঁতো খেয়ে বেড়াচ্ছে—যেই বাড়ীর ভিতর পদার্পণ, অমনি দেবতায় পরিবর্ত্তন। ঘরে ঘরে এসব দেবতাদের অবস্থান। স্ত্রীর সতীত্ব নিয়েই ইহারা অস্থির,—নিজের সৎ হওয়ার কোনও দরকার নেই। পুরুষের পক্ষে বহু স্ত্রী গ্রহণ—এতো নিতান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার—এতে আর আপত্তির কি আছে? বাল্যকালে বিয়ে না হলেই রমণী কুলটা হয়ে পড়্বে, তাই যত শীঘ্র পারা যায়, তাদের বিয়ে দিয়ে খাঁচায় পুর্তে হবে। লেখা পড়া? দরকার নেই তার। তা হলে যে তাদের চোখ ফুটবে, নিজ নিজ অধিকার বুঝ্বে, স্বাধীনতা চাইবে, ঘরের বাহির হয়ে পড়্বে। আর Improvident marriageর প্রধান কারণ—একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা। ইহা অনুন্নত সমাজ সমূহের প্রথা—অলসতার মহাপৃষ্ঠপোষক। কোনও চিন্তে নেই, বিয়ে কর, এক গুষ্টি ছেলে মেয়ের বাপ হও,—বাবা আছেন, দাদা আছেন, জ্যাঠা কাকা আছেন, সংসার ভরণ পোষণের চিন্তা কি? এমন সমাজ জগতে আর দুটী নেই। এদেশ ব্যতীত কোন সুসভ্য দেশে এমন বাল্যবিবাহ প্রচলিত? বিধবাবিবাহই বা কোথায় প্রচলিত নেই? জোর করে রমণীদের এমন কোথায় ছোট করে রেখেছে?

হেম ঈষৎ নিস্তব্ধ থেকে বল্ল—সত্যিই ভাই! এমন বিকট, কিম্ভূত কিমাকার আচার ব্যবহার—সহমরণ, আজীবন বৈধব্য, বাল্যবিবাহ, জাতিভেদ, সমুদ্র পার হলে সমাজ হতে বহিষ্করণ, এদেশ ছাড়া জগতের কোথায়ও নেই। যে সকল কারণে দুর্ব্বলতা আস্‌তে পারে, সমাজ নির্জীব ও বিকলাঙ্গ হতে পারে—সমস্ত ব্যবস্থাই বর্ত্তমান।

আমি। ভাই! এদেশ ছাড়া কে কোথায় শুনেছে সমাজের ভিতর দুই চারিটী বর্ণ ব্যতীত, অন্য বর্ণ লেখা পড়া কর্‌তে পারবে না, করলে প্রাণ পর্য্যন্ত হারাতে হবে? কে কবে অন্যত্র দেখেছে, একটী লোক ঘরে প্রবেশ কর্‌লে অন্যের পক্ষে অভ্যন্তরস্থিত সমস্ত জিনীষ অস্পৃশ্য হয়ে ওঠে? কে কবে শুনেছে, মানুষ মরলে সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রীকে ও পুড়ে মরতে হবে? এই ভয়াবহ সতী ধর্ম্মের এবং এই ক্ষুদ্র স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত চাতুর্ব্বর্ণ্য ধর্ম্মের এখনও বাহাদুরী নেওয়া হচ্ছে। ব্যাস মুনি গীতায় লিখেছেন,—ভগবান নাকি "গুণকর্ম্ম-বিভাগশ" এই চাতুর্ব্বর্ণ্য সৃষ্টি করেছেন। ভগবানের তো আর কাজ ছিল না? আমরা ব্যাকুবগুল এসব বিশ্বাস করে, নিজ উন্নতির মাথায় কুঠারাঘাত কচ্ছি।

হেম। তুমি আর আমি ভাব্‌লে কি হবে? কত কোটী কোটী লোক এখনও পুঞ্জীভূত কুসংস্কার সমূহের ভিতর ডুবে আছে। কত কোটী কোটী লোকের বিশ্বাস, ব্রাহ্মণের পদধূলি স্বর্গ প্রাপ্তির মহাপথ,—স্বামীর পদোদক-গ্রহণ রমণীর মোক্ষ লাভের উপায়। আর তুমি আমিই বা কি? আমরা শিক্ষিত বলে লম্ফ ঝম্ফ করি, আমরাই বা কি? কয়জনের প্রকৃত জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়েছে? প্রচলিত অসংখ্য কুসংস্কারের হাত হতে রক্ষা পেলেম কৈ? সাহস করে এসব পরিত্যাগ কর্‌তে পাল্লেম কৈ?

আমি। যাই বল, আর যেন সহ্য করা যায় না। যতদিন বুঝতে পারিনি, বুঝবার উপায় ছিল না, তাও একরকম ছিল। এখনও কি চাতুর্ব্বণ্য নিয়েই থাকৃতে হবে? যখন দেখি বৃদ্ধ কায়স্থ নত জানু হয়ে বালক ব্রাহ্মণের পদধূলি নিচ্ছে—আমি লজ্জায় মরে যাই; ঐ নতজানুর সঙ্গে মানবত্বের মূলে কি কুঠারাঘাত হচ্ছে,—সে কি কেউ ভাবে? যুগে যুগে এ ভাবে নানাদিক হতে মনুষ্যত্ব-হারা হয়ে—ভারতের নর-নারী দুর্ব্বল, উদ্যমশূন্য ও সাহসবিহীন হয়ে আছে। দূর যাউক জাতিভেদ! তাহা জন কতক স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণের পক্ষে মহা-সুবিধার কারণ হতে পারে—অন্য কারো পক্ষে নয়। আমাদের চেয়ে কিসে বড় তাহারা? তারা অন্যান্যকে পদধূলি দিয়ে বেড়াচ্ছে—তারা তো কারো গ্রহণ কচ্ছেনা।

হেম। তাতো ঠিক কিন্তু এ সমাজ না ছাড়্লে, তাদের হাত ছাড়াও সহজ নয়। মাটীতে পড়ার পূর্ব্ব হতে তাদের হাতে পড়া—তার পরে উৎসবে আনন্দে সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাদের হাতে পড়ে থাকা, এমন কি মৃত্যুর পর পর্য্যন্তও তাদের হাত হতে উদ্ধারের কোনও উপায়ই তো দেখ্‌ছিনা।

আমি। তা কি করা? এসব ছাড়্তেই হবে। আগে মানুষ—তার পর ধর্ম্ম। যদি ধর্ম্ম রক্ষা অর্থে মনুষ্যত্ব লোপ বুঝে নিতে হয়,—তা হলে তা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়। আমি যতই ভাব্‌ছি, ততই আমার মনে এই ধারণা জেগে উঠছে, যে ধর্ম্ম কথাটা এখন উঠে গেলেই মঙ্গল হতো। জগতের এত কোটী কোটী লোক সবকে জোড় করে বেঁধে রাখবার চেষ্টা হচ্ছে—পাঁচ সাতটী ধর্ম্মের গণ্ডীর ভিতর। এতে, তাদের উন্নতি অনেক সময়ই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তা ছাড়া, ধর্ম্মে ধর্ম্মে কত বিরোধ দাঁড়িয়ে গেছে, ধর্ম্মই এখন মানবের মিলনের মহা অন্তরায়।

যতদিন লোকে অশিক্ষিত ছিল,—ততদিন পূর্ব্বের নিয়মাদি দ্বারা লোক একপ্রকার চল্‌ছিল : এখন কি আর সে দিন আছে? চারিদিকই জ্ঞানের আলোক ছড়িয়ে পড়ছে—এখনকার দিনেও পূর্ব্বকার তিন হাজার বছরের প্রাচীন কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বার্থান্ধ বা অর্দ্ধশিক্ষিত কুসংস্কারগ্রস্ত মুনি ঋষিদের মতামতের দিকে চেয়ে যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌বে—সে নিতান্তই দয়ার পাত্র। যে জাতি এ ভাবে চল্‌বে তার ভবিষ্যৎ মহা অন্ধকারাচ্ছন্ন। প্রাচীনের অন্ধ অনুসরণের ফল যাহা হয়েছে—আমাদের বর্ত্তমান জীবনই তার দৃষ্টান্ত। এখন, এস ভাই! নবীনকে বরণ করে নি। সব কুসংস্কারের হাত হতে মুক্ত হয়ে, নব জীবনে প্রবেশ করি। জাতির ভেদ করে ভাই! জাতিসৃষ্টি হয় না।

হেম। আমরা তো মরার মত দিন কাটাচ্ছি। এত বড় দেশ, এত ধন জন, সম্পদ, কিছুই কাজে লাগ্‌লোনা—শুধু আমাদের কিম্ভূত কিমাকার আচার ব্যবহার রীতি নীতির দরুণ। কিন্তু আমি তো ভাই! কোনও উপায়ই দেখ্‌ছিনা। আমার বিশ্বাস, যতদিন দুই জন হিন্দু ও বেঁচে থাকবে—ততদিন এ সকল নিয়ম বর্ত্তমান থাকবে। হিন্দু জাতিকে শেষ না করে, এ হিন্দুধর্ম্ম যাবে না।

ব্রাহ্মণদেরই বা কি দোষ দিব? তাদেরই তো রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, তাদেরই তো শিবনাথ। তারাই তো সর্ব্বাগ্রে জাতিভেদরূপ মহাপাপের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হয়েছে। শিক্ষিতের ভিতর কে না বুঝ্‌তে পার্‌ছে, জাতিভেদ, জাতিধ্বংসকারী সমাজধ্বংসকারী দেশধ্বংসকারী মহাব্যাধি? কিন্তু তাও সাহস করে প্রকাশ্যে এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যেন ভয়ে মরে যায়। কি জানি কি একটা অনির্দ্দিষ্ট, অজানিত ভয়ে সকলেই প্রপীড়িত।

আমাদের দেশে যদি কোনও গুণের উৎকর্ষের প্রয়োজন হয়ে থাকে তবে এই সাহসের। আর যদি কোনও দোষের মূলোচ্ছেদের দরকার হয়ে তবে ভীরুতা ও কপটতার।

আমি। ঠিকই বলেছ ভাই! কত চেষ্টা করি, কুসংস্কারের হাত তো এড়াতে পার্‌ছিনে। এই ধর না নলিনীর বিষয়টা। নিতান্ত কচি মেয়ে, কেমন সুন্দরী বুদ্ধিমতী মিষ্টি চরিত্র। কিন্তু সবই না কি তার মাটী হলো স্বামীর মৃত্যু দরুণ। বিলাত হলে কি ভাবতে হতো? লেখাপড়া শিখ্‌তো, কাজ কর্ম্ম করতো, নিজেই মনোমত স্বামী গ্রহণ করত, স্বামীর মৃত্যু হলে এবং ইচ্ছা হলে, পত্যান্তর গ্রহণ করত। সে সব জায়গায় রমণী সর্ব্ব বিষয়েই স্বাধীন, মানুষ হবার শত সহস্র পথ উন্মুক্ত। আর ভেবে দেখ দেখি নলিনীর কি অবস্থা? ঘরের বাহিরে যেতে পারবেনা। লেখাপড়া শিখ্‌তেই বা কত বাঁধা বিঘ্ন, আর দ্বিতীয়বার বিবাহের কথা উত্থাপন কল্লেই তো দেশ শুদ্ধ লোক জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, দেশ গেল, বলে চীৎকার করে উঠ্‌বে। পুরাণ আমলের তন্ত্র মন্ত্রে পুষ্ট অর্দ্ধ শিক্ষিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপত্তি করে তাও বরং সহ্য হয়, দুঃখ এই যে যারা পাশ্চ্যাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তারাও এসকল আন্দোলনে মহা উৎসাহের সহিত যোগ দেয়। নলিনী তো দুঃখে জীবন কাটাবেই, সঙ্গে সঙ্গে মাও যে তার চিন্তা ভাবনায় শেষ হতে চল্লেন, এ দুঃখ কাকে বুঝাব?

মনের আবেগে আরো অনেক কথা বলে ফেল্লাম। দেখ্‌লেম, আমার সঙ্গে সঙ্গে হেমের হৃদয় ও বিক্ষোভিত হয়ে উঠেছে।

এই জন্যইতো তাকে আমি এত ভালবাসি, সে আর আমি যে এক।

মুখ ফুটে কোনও উত্তর দিল না। কেবল বিষাদ-ম্লান মুখে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ এই প্রকার নীরবতার ভিতর চলে গেল। জীবনের এই সব নীরব মুহূর্ত্তই আমার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। কথা কেহই কহিতে ছিলাম না কিন্তু বুঝিতেছিলাম, হেমের হৃদয়নিঃসৃত ভাব-তরঙ্গ ভালবাসারূপ স্রোতের উপর দিয়ে আমার হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ কচ্ছিল। তাহার প্রফুল্ল-বদন ক্রমে ক্রমে এক দিব্য ম্লান বিভায় বিমণ্ডিত হয়ে উঠ্‌ছিল। কিয়ৎকাল পরে সে আমায় ডাকিল, সুরেশ !

হৃদয় সব বুঝিতেছিল। সেই একটী কথার ভিতর কি প্রগাঢ় সহানুভূতি, অপার ভালবাসা এবং মঙ্গলকামনা নিহিত ছিল, তাহা স্পষ্ট অনুভব কচ্ছিলাম। আমার ভাই নেই কিন্তু সে আমায় যেমন ভালবাস্‌তো তেমন ভালবাসা সহোদর হতেও কেহ কখনো পায়নি। আর সে আমার কি ছিল, তা কি বল্‌তে হবে ?

বসে আছি, এমন সময় নলিনী কক্ষে প্রবেশ কল্ল। সে হেমকে উদ্দেশ্য করে বল্ল, কই হেম দা ! তুমি তো আমায় Beauties of Nature বইখানা এনে দিলেনা ? তোমার কেবলই গল্প।

হেম। আমি তো চেষ্টার ক্রটী করি নি। সারদাকে লিখেছিলেম, সে লিখে পাঠিয়েছে স্কুলের একজন মাষ্টার মশায় পড়্‌তে নিয়েছেন, স্কুল খোলার পূর্ব্বে আর পাওয়া যাবে না। তাই আমি কলকাতায় থেকারের বাড়ীতে লিখেছি, বোধ হয় দুই একদিনের ভিতরই পাব।

নলিনী (হেসে)। যা হোক, তাও বইখানা দেখ্‌তে পাব, আশা আছে।

আমি বল্লাম, Nature র Beauties দেখবার জন্য বইয়ের কি দরকার ? সম্মুখেই যে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার পরে রয়েছে, সারা জীবন দেখলেও যে অফুরন্ত থেকে যাবে।

নলিনী। তুমি দেখি দাদা! তোমার সমুদ্র নিয়ে পাগল হয়ে পড়্‌লে। এর সুখ্যাতি যে তোমার মুখে ধরেনা।

আমি। পাগল হবার জিনীষ বলেই পাগল হয়ে পড়েছি। রবি বাবুর 'পুরীতে সমুদ্র দর্শন' কবিতা মনে পড়ে কি? আজ আবার পড়া যাবে।

হেম। সবই সুন্দর। লতাটী, ফুলটী, পাখটী সবই, যদি দেখার মত দেখা যায়। যে বই খানার কথা বলছিলাম, তাতে এসকল বিষয়ের কথা এত প্রাণ দিয়ে লিখেছে যে পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। দেখ্‌বে বই খানা এলে কেমন চমৎকার।

নলিনী। দাদা আছে সমুদ্র নিয়ে, তুমি আছ গল্প নিয়ে,—আমার ও বই আর আস্‌ছে না।

হেম। আস্‌বে, সপ্তাহের ভিতর নিশ্চয়ই আস্‌বে।

নলিনী। সে যাই হোক, আজ আমাকে তোমাদের সাথে বৈকালে বেড়াতে নিয়ে যাবে?

হেম। আমার আপত্তি নেই, যদি সুরেশের মত হয়।

আমি। আমার অমত কি? তবে ওকে নিয়ে যেতে মাঝে মাঝে ভয় হয়, পাছে বা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে দিন যে মেঘ করে এসেছিল, তাতে আমার বড্ড ভয়ই হয়েছিল, বুঝিবা ওকে নিয়ে সময় মত বাসায় ফির্‌তে পারব না।

নলিনী। (হেসে) তোমার দাদা! মিছে ভয়। আমার তো কিছুই পরিশ্রম হয় না। বরং সন্ধ্যার সময় হেটে আস্‌লে শরীরটা বেশ ভাল লাগে। কলকাতায় গেলে আবার সেই কুয়র বেঙ্গইতো হতে হবে, এখানে যে কয়দিন বেড়িয়ে নেওয়া যায়।

আমি। মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে হয় না? মা কিছুতেই বেরুতে চায় না, আমি কত বলে দেখেছি। তুমি ভাই! একবার বলে দেখ না?

হেম স্ফূর্ত্তির সহিত বলে উঠ্‌লো, বেশতো তাই হোক, আজ চারজনে বেড়াতে যাব। মার মত, তা আমি এখনই নিয়ে আস্‌ছি।

সে উঠে চলে গেল। নলিনী আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তার দিকে চাইতেই প্রাণ আপনা হতেই কেঁদে ওঠে। বিশেষত সে যে তার নিজের দুঃখ বোঝে না, হেসে খেলে দিন কাটায়, এতে যেন আরো কষ্ট হয়। তার হাসিভরা মুখখানার দিকে দৃষ্টি কল্লে আমার সব সময়ই মনে হয়, হায়! সরলা মূঢ়া ভগ্নী! তুমি তো এখনও বুঝিতেছনা, তোমার ভবিষ্য জীবন কেমন সুখ-শূন্য, দুঃখে ভরা।

তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, নলিনী! তোর পুরীর জীবন কেমন বোধ হচ্ছে? সে চিন্তামাত্র না করে উত্তর কল্ল, বেশ, ভারি চমৎকার। কলকাতায় সারাদিনই লোকের গঞ্জনা, গোলমাল। এখানে সবই শান্ত, সুন্দর। এমন মধুর ভাবে আর কখনো সময় কাটাই নি।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈকালের দিকে মাকে নিয়ে, আমরা সমুদ্র তীরে বেড়াতে বাহির হ'লাম। সন্ধ্যাকাল, ধীরে ধীরে বাতাস বইছে। শরতের নীল নির্ম্মল গগন, কোথায় ও মেঘখণ্ড নেই। নিম্নে সমুদ্রবক্ষ মৃদুহিল্লোলে তরঙ্গ ভঙ্গে ক্রীড়া কচ্ছে। বহুদূরে দুই একটা গমনশীল অর্ণবপোতের ধূমরাশি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। চারিদিক হতে নির্ম্মল প্রীতিধারা নিপতিত হয়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ কচ্ছিল।

ধীরে ধীরে মা চলেছেন, এক পার্শ্বে হেম, অন্য পার্শ্বে নলিনী। আমি তাদের হতে ঈষৎ দূরে দূরে চলেছি।

মাকে আমি প্রত্যক্ষ দেবী বলেই জান্‌তাম। এই যে দেবতুল্য স্বামী এবং জামাতা হারিয়েছেন, তথাপি তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত ভাবের একটুও যেন পরিবর্ত্তন হয় নি। শোক যা, হৃদয়েই গোপনে বহন কচ্ছেন। লোকের কাছে দুঃখ প্রকাশ—তাঁর চরিত্র বিরুদ্ধ। তাঁর ভালবাসামাখা স্নিগ্ধ উদার ব্যবহার—আমার হৃদয়োপরি সকল সময়ই শান্তি ও পবিত্রতার ভাব বহন করে আন্‌তো। মা! মা! আমার মাকে আমি কেমন করে সুখী করবো?

তাঁর মাতৃমূর্ত্তি যে দেখেছে সেই পদতলে ভক্তিভরে হৃদয় অবনত করে গেছে। সৌন্দর্য্য, সংযত ব্যবহার ও পবিত্রতার এমনই প্রভাব।

মার দুইদিকে হেম ও নলিনী। একজন বলদৃপ্ত, উজ্জ্বল নয়ন সমন্বিত, শক্তি ও তেজের আধার, অন্যজন মাধুর্য্যময়ী, রূপে গুণে অনুপমা। আমি চাহিতেছিলাম, সঙ্গে সঙ্গে পুত্রকন্যা পরিবেষ্টিতা ভগবতীর কথা মনে হচ্ছিল। সেই সঙ্গে একটা অনুশোচনার ভাবও হৃদয়ে ভরে উঠ্‌ছিল। নলিনী ও হেম, বুঝি একে অন্যের জন্যই সৃষ্ট হয়েছিল; আমরা না বুঝে একের জিনীষ অন্যের করে সঁপে দিলাম। এখন দুঃখ করা বৃথা!

মা হেমকে জিজ্ঞাসা কচ্ছিলেন,—তোমাদের ও জায়গা কেমন বোধ হচ্ছে? আমাদের একবার যেতে নিমন্ত্রণওতো কল্লে না।

হেম। বেশ জায়গা, চারিদিকে পাহাড় পর্ব্বত। এখানে সমুদ্রের শোভা; সেখানে পর্ব্বতের শোভা, নদ-নদীর শোভা, মাটীর শোভা, গাছ পাতার শোভা। সমস্ত আসাম প্রদেশটী যেন কবিতার লীলা ভূমি, ব্রহ্মপুত্র নদীর ধারে ধারে বনবিটপীসমাশ্রিত শ্যামল পাহাড় পর্ব্বতগুলি

কেমন সুন্দর, যেন পটে আঁকা ছবি সব। বেশ তো মা! শীতকালে আমার ওখানে তোমরা সকলে মিলে বেড়াতে যাবে, আমি কত সুখী হব। তবে, আমার ভয় হয় তোমাদের কষ্ট হবে, কারণ সব এখন ও তেমন গুছিয়ে নিতে পারিনি।

মা বল্লেন, এবার শীতকালটা কলকাতাতেই কাটাই, বর্ষাকালে যাওয়া যাবে। তখন তোমার পাহাড়ের শোভা, জলের শোভা দুইই দেখা যাবে। আর যাবই বা কি? এখন বড় সড় হয়েছ, দুপয়সা রোজাগারও কচ্ছ, ঘরে বৌ আন্‌ব, তা নয় তোমাদের দুজনার কি যে মত, বিয়ের নামটী কর্‌তেই যেন কেমন হয়ে পড়।

নলিনী বলে উঠ্‌লো—হাঁ হেম দা! তোমাদের আর, পি রায়ের মেয়ের সম্বন্ধে আর কোনও সংবাদ পেলে?

মা। (আমার দিকে চেয়ে) কোথায়, তোমার দাদার মত কোথায়?

নলিনী। কেন দাদা? তোমার এত আপত্তি কেন? বৌ-দি আস্‌বে, তাকে নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করব। দাদা! তুমি বিয়ে কর, আমার অনুরোধ।

আমি। বৌ-দি ঘরে এলেই বুঝি হলো। সে কেমন দাঁড়াবে, দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন হবে, চরিত্র কেমন হবে, লেখা পড়া জানবে কি না, তোর সঙ্গে বন্‌বে কি না,—তার ঠিক কি?

নলিনী। তার জন্য তোমার দাদা! ভাব্‌তে হবে না। আমি এসবের ভার নিলুম। যদি লেখা পড়া গান বাজনা তেমন না জানে, আমি শিখিয়ে নোবো। হেম দা বল্‌ছিলেন আর পি রায়ের মেয়ে নাকি ভারি সুন্দর।

আমি হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর কল্লাম, ও-সব হেমের বাজে কথা। ওকে ও লোকে বিশ্বাস করে? ভারি মিথ্যুক।

নলিনী। (হাস্‌তে হাস্‌তে) না, না দাদা! তোমার ভয় নেই। সত্যিই সুন্দর মেয়ে। আর সুন্দরী না হলে তো তোমায় কেউ বিয়ে কর্‌তে বল্‌ছে না।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সে বিষাদক্লিষ্টস্বরে বলে উঠ্‌লো, আর যে একলা বাড়ী ভাল লাগে না। বৌ-দি এলে আমাদের কত আমোদ আহ্লাদ হতো। মা ও অনেকটা সুখে থাক্‌তে পারতো।

নলিনী সরলভাবে কথাগুলি বলে যাচ্ছিল, এদিকে আমার হৃদয় কেঁদে উঠ্‌ছিল। ভগ্নী! তুমি বেঁচে থাক্‌তে, তোমার দাদা কোন্ প্রাণে কেমন করে বিবাহ করবে?

মা হেমকে উদ্দেশ করে জিজ্ঞাসা কল্লেন, হেম! তুমি বিয়ে কচ্ছ না কেন? আমি যতদূর জানি, তোমার বাবা ও মার তো নিতান্ত ইচ্ছা তোমার বিয়ে দাওয়া।

হেম আম্‌তা আম্‌তা করে বল্ল, এত তাড়াতাড়ির কি দরকার?

ততক্ষণ আমরা আমাদের গৃহ হতে প্রায় অর্দ্ধমাইল চলে এসেছি।

সমুদ্র তীরে সুন্দর একখানা দ্বিতলবাড়ী। কালও বাটিটী বন্ধ দেখে গেছি। আজ দেখলাম, জানালা দরজা খোলা। বুঝলাম বাড়ীতে লোক এসেছে। বারেন্দায় একটি ভদ্রলোক চেয়ারে উপবেশন করে ধূমপান কচ্ছেন।

তার দিকে দৃষ্টি করতেই হেমের মুখ আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল্। সে বলে উঠ্‌লো, ভাল, এ যে আমাদের মিষ্টার আর পি, রায়ই। তোমরা ধীরে ধীরে এগোও, আমি একটু দেখা করে আসি। সে চলে গেল।

দেখলাম, মিষ্টার রায় তাকে অতি আদর যত্ন করে বসালেন। কতকটুক কাল দুজনের ভিতর আলাপ সালাপ হলো, শেষে হেম হাস্‌তে হাস্‌তে ফিরে এলো।

দূর হতে সে স্ফূর্ত্তির সহিত বলে উঠ্‌লো, যা ভেবেছিলাম, তাই—আর, পি, রায়ই বটে। ছুটী নিয়ে সপরিবারে পুরীতে বেড়াতে এসেছেন।

নলিনী আনন্দসহকারে জিজ্ঞাসা কল্লো, লীলাবতীও তাহা হলে এসেছে?

হেম। হাঁ, এসেছে বৈ কি? দেখ্‌বে এখন, কেমন সুন্দরী। যাকে বলে প্রকৃত সুন্দরী।

আমি (হেসে)। নুরজাহান না ক্লিউপেট্রা?

তৎপরে সে নিজ হতেই বলে উঠ্‌লো, তোমরা হয়তো ভাবৃছ, আমিই তাকে যোগাড় করে এখানে এনেছি, তা নয়, তা নয়।

আমি হেসে বল্লাম, তা বোঝাই যাচ্ছে। ঠাকুর ঘরে কে? আমি—

হেম। না, না; দিব্যি করে বল্‌ছি ওঁর এখানে আসার বিষয় আমি ঘুণাক্ষরেও জানিনে। কয়েকদিন পূর্ব্বে গৌহাটীতে দেখা হয়েছিল, এই মাত্র। একদেশে বাড়ী, এই যা।

আমি। তাতো বটেই। তা থাক্‌ সে সবকথা। জিজ্ঞাসা করি, এই কি আমাদের ভবিষ্য মিসেস্‌ এইচ, সি, ঘোষ?

হেম। আমাদের পোঁছে কে হে?

আমি। এখন কি আলাপ হলো, তার কিছু আভাস পেতে পারি কি?

হেম। আলাপ আর এমন কি হবে? কালকে ভোরে তার গৃহে যেয়ে দেখা করতে বল্লেন। আমাদের ওখানে শীগ্‌গিরই বেড়াতে আসবেন। মার কথা, নলিনী ও তোমার কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন।

নলিনী বলে উঠ্‌লো, ভালই হলো। ওঁদের সঙ্গে আলাপ সালাপে বেশ কয়েকটা দিন কাটান যাবে।

সন্ধ্যা একটু গাঢ়ভাব ধারণ করতে লাগ্‌লো। পশ্চিমাকাশে পূর্ণিমার চন্দ্রের আভা দৃষ্ট হচ্ছে। ক্রমে সম্মুখস্থ নিলাম্বোপরি কিরণরশ্মি নিপতিত হয়ে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের স্বষ্টি হলো।

আমরা নির্ব্বাক হয়ে তন্ময়চিত্তে সেই ভুবনমোহন বিরাট দৃশ্যের দিকে দৃষ্টি করে রহিলাম।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে মা বল্লেন, ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা যারা দেখ্‌তে চায়—তারা এখানে আসুক। চৈতন্যদেব এই অপরূপ দৃশ্য দেখেইনা আত্মহারা হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন?

মৃদু হিল্লোলে ঈষৎ বিচিমালা-বিক্ষিপ্ত সলিলরাশি চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত হয়ে গলিত স্বর্ণের ন্যায় ঝক্‌ ঝক্‌ কচ্ছিল। মা তার দিকে অবলোকন কত্তে কত্তে বল্লেন, সত্যই এই অমৃত সাগরে ডুব দিলে, মানুষ অমর হয়ে যায়।

কথা কয়টী বল্‌তে বল্‌তে ভাবাবেশে তাঁহার কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে আস্‌লো।

কতটুকু পরে হেমকে উদ্দেশ করে নলিনী বল্ল, আচ্ছা হেম দা! আমাদের বাঙ্গলোর কাছে আর বাড়ী নেই?

হেম। কেন, কিসের জন্যে?

নলিনী। তা হ'লে আর পি রায়দের সেখানে নেওয়া যেতো। এ বাড়ীটা দূরে হয়ে পড়েছে।

হেম। এমন দূরই বা কি? ইচ্ছা কল্লে, বৈকালে, প্রাতে রোজই আস্‌তে পারবে।

নলিনী। ওঁদের মেয়েরা কি পুরুষের কাছে বেড়োন? শুনেছিতো তোমার কাছে মিষ্টার রায় অনেকটা সাহেবি ধরণের লোক, মেয়েরা কেমন?

হেম। আর পি রায়ের স্ত্রী অনেকটা, আর অনেকটাই বা বলি কেন, প্রায় ষোলআনাই পুরণধরণের। তবে লীলার লজ্জা সরমটা তত নেই। গৌহাটীতে মিস গিলবার্ট নামে এক মিশনারী মেম ছিলেন, তার কাছেই ওর অনেটা শিক্ষা হয়েছে। লেখা পড়া যে খুব ভাল জানে তা নয়, তবে মোটামুটি ধরণের মন্দও নয়। আমার সঙ্গে আর, পি, রায়ের পরিবারের বিশেষ মেলামেশা নেই।

আমি। না, তাতো নয়ই।

হেম। সত্যি কথা। তবে সাহস করে বল্‌তে পারি, ওঁরা লোক মন্দ নয়।

নলিনী। আচ্ছা, জল্পনা কল্পনা করে লাভ কি? দুদিন পরেই সব দেখা যাবে।

ইহার পরে আরও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আলাপ হলো। কথা প্রসঙ্গে হেম বল্ল, এই উড়িষ্যায় এসে, যতই ভাবছি ততই এদেশের লোকের প্রতি শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ও ঘৃণা হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ছে।

নলিনী বল্লো, কেন? কেন হেম দা?

হেম। দেখছ না—দেশটা ভরেই অতীত গৌরবের কত স্মৃতি চিহ্ন পড়ে রয়েছে? জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বর, কনারক, খণ্ডগিরি, উদয়গিরি, অশোকের শিলালিপি, এদেশে স্থপতি-বিদ্যার যেমন উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল এমন জগতের খুব কম জায়গাই হয়েছে। প্রাচীন কালের সামান্য যন্ত্র তন্ত্রের সাহায্যে লোকগুলি শুধু বুদ্ধি বলে যা করে গেছে বর্ত্তমান কালের ইঞ্জিনিয়ারগণ শত চেষ্টা করেও তা সম্পন্ন করতে পেরে উঠ্‌ছেনা। কিন্তু কি দেশটা কি শোচনীয় অবস্থায় এখন

পতিত হয়েছে। উড়ে কথাটীতো এখন কাপুরুষের ও অপদার্থের নামান্তরে পরিবর্ত্তিত হয়েছে।

আমি উত্তর কল্লাম, তা হবেনা ? তোমাদের বাঙ্গালীদেরই তো এ কীর্ত্তি। জাতটা ছিল বেশ সবল, সরল, সাহসী, উদ্যোগী, কোথা হতে বাঙ্গালার নেড়ামাথা নেংটীপরা নিরামিশাষী বৈরাগীর দল এসে এর রফা রক্ষা করে দিলে।

মা বল্লেন, কেবল কি শুধু বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই দোষ ?

আমি। তা বলছিনে। হিন্দু ধর্ম্মের জাতিভেদের ভিতরই জাতি-ধ্বংসের অসংখ্য বীজ নিহিত ছিল, তার সঙ্গে যখন বৈষ্ণব ভাব সংযোজিত হলো তখনই জাতিটার দফারফা হয়ে গেল। যে ধর্ম্মের প্রধান মন্ত্রই হচ্ছে, অহিংসা, তৃণের মত নীচ হয়ে থাকা, নিতান্ত অত্যাচারিত ও অপমানিত হলেও শত্রুর প্রতি বিনয় ব্যবহার করা এবং শুধু ভক্তির উপরেই যা প্রতিষ্ঠিত, তার ফল যে এমন হবে তার আর সন্দেহ কি ?

নলিনী বলে উঠলো, কেন ক্রিশ্চিয়ানিটী ও কি এসব মত প্রচার কচ্ছে না ? তারই তো শিক্ষা এক গালে চড় দিলে, আর এক গাল ফিরিয়ে দিতে হবে।

আমি। তবেই হয়েছে। যে এমন ভাবে গাল ফিরিয়ে দিবে, তার চিরকাল চড় খেয়েই যেতে হবে। পৃথিবী বোঝে মাত্র একটা জিনীষ—শক্তি। যে মানুষের এ আছে সেই রাজা ; যে জাতি এ মহাধনের অধিকারী, তারই জগতে প্রাধান্য। ইয়ুরোপ কি বাইবেলের নীতি কখনও অনুসরণ করেছে ? তাদের সভ্যতা প্রাচীন রোম ও গ্রীসের সভ্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত, যার প্রধান শিক্ষা ছিল রাজ্যলাভ, সাম্রাজ্য বিস্তার, স্বদেশপ্রীতি, সর্ব্ব বিষয়ে শক্তির চর্চ্চা ও বিকাশ। খৃষ্টধর্ম্ম হতে

যেটুক ভাল ও জীবনপোষক তা তারা নিয়েছে—যেমন ব্যক্তিত্বের স্বাধীনতা, একেশ্বরবাদ, বিবাহ বিধি ইত্যাদি। ধর্ম্ম তাই তাদের উন্নতির পথে সহায়; আর আমাদের ধর্ম্ম সমূহই আমাদের পতনের মূল কারণ।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকে নলিনী বল্ল, চল না দাদা! ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, এ সব স্থান গুলি ক্রমে ক্রমে যেয়ে দেখে আসি। মা! তুমি কি বল?

মা উত্তর কল্লেন, বেশ তো।

নলিনী। তবে হেম দা! তুমি দিন ঠিক কর, যাওয়া চাইই।

হেম। যাওয়াতো নিশ্চয়ই উচিত। উড়িষ্যায় এসে এসব না দেখে ফিরে গেলে লজ্জার সীমা থাক্‌বেনা। বেশতো, চল বাসায় যেয়ে প্রোগ্রেম ঠিক করা যাবে।

কতকক্ষণ পরে আলাপ সালাপ করতে করতে গৃহে প্রত্যাগমন কল্লেম। সে দিনকার সন্ধ্যাভ্রমণটি যেন বড়ই আনন্দদায়ক বোধ হচ্ছিল।

নির্ম্মল বায়ুসেবিত সাগরতীরবর্ত্তী বাটীতে বাস ও সকাল সন্ধ্যায় ভ্রমণ হেতু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সকলেই উন্নতি লাভ কচ্ছিলাম। কলকাতায় এমন প্রগাঢ় নিদ্রা ও অনাবিল বিশ্রাম উপভোগ করিনি। পুরীর জীবন যে এত সুখের হবে কল্পনাতীত ছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাত হতে না হতেই দেখি, আর পি রায় ওরফে রমেন্দ্রপ্রসাদ রায় গৃহে উপস্থিত। হেমের সাথে তাহার বিশেষ পরিচয় ও হৃদ্যতা। বিলাত ফেরৎ না হলেও ধরণ ধারণটা অনেকটা সেখান হতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের ন্যায়। পরিধানে প্যাণ্ট কোট্, মুখে চুরট। কথা বার্ত্তায়, পোষাক পরিচ্ছদে সকল বিষয়েই সাহেবদের অনুকরণাভিলাষী। তবে আসলে ও নকলে যে পার্থক্য, তাহাকে দেখ্‌লেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সাহেবী পোষাক পড়েছেন সত্য কিন্তু মূল্যবান নয়, তেমন পরিষ্কারও নয়। কোটটী ছিটের, বুঝি কেনেনোরের হবে; টেনিস সার্টটীর উপরই নেকটাই লাগিয়েছেন তাও ময়লা। হ্যাটটী যা ব্যবহার করেছেন তাও পরিষ্কার নয়। জুতা জোড়া কালি ব্রাসের কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্রাস হয় নি। প্যাণ্টটীও তেমন পরিষ্কার নয়, বোধ হয় আসামী ধোপার দোষ, কারণ দেখে বোধ হলো আজ প্রাতেই পরিধানের জন্য বাহির হয়েছে। প্যাণ্টের নীচ হতে সাদা মোজা দেখা যাচ্ছে, তাও বা যদি পরিষ্কার হতো! তাও হায়! দোভাজ অবস্থায় জুতার মাথায় কাছে জড়িত হয়ে, কৃষ্ণবর্ণ জানুদ্বয়ের অংশ বিশেষের দিকে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্ছে। পরে হেমের কাছে শুনেছি, তার ছোট ভাই বিলাতে গিয়েছিলেন, সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে বড় চাকরী করেন। সেই সম্পর্কে দাদাও সাহেবী পদে উন্নত হয়েছেন।

হেম আমার নিকট তাকে মিষ্টার আর পি রায় রূপেই পরিচয় করে দিল। এ নামেই তিনি সর্ব্বত্র পরিচিত। রমেন্দ্র বাবু রূপে অভিহিত হতে তিনি নিতান্তই নারাজ।

জীবন

বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ। গায়ের রং মেহগনি কাঠের ন্যায় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বল্লেও বোধ হয় দোষ হবে না, তবে অনেকটা মাঝা ঘসা। দাড়ি গোঁফ মুণ্ডিত কিন্তু ক্ষৌরকার্য্যের অনাবধানতাবশতঃ ক্ষুদ্রাংশসমূহ ধান গাছের অংশাবশেষের ন্যায় শোভা পাচ্ছিল। মুখখানা গোলগাল, মোটাসোটা, নাদুস নুদুস লোকটা, অনেকটা খর্ব্বাকৃতি।

কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, তেমন সরল প্রকৃতির লোক নন কিন্তু কথার ভিতরে বেশ একটু আকর্ষণী শক্তি আছে। ঠিক বাঙ্গালী ভাবাপন্ন বলে নিজকে পরিচিত করতেও যেন তিনি তেমন ইচ্ছুক নহেন। অনেক দিন হয়, তিনি ও তার ভ্রাতা ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পল্লীগ্রামস্থিত পৈতৃক আবাস পরিত্যাগ করেছেন। এখন কোনও নির্দ্দিষ্ট বাড়ী নেই। কলকাতায় কর্পোরেশন ষ্ট্রীটে ফিরিঙ্গি পাড়ায় একটা ভাড়াটীয়া বাড়ী আছে, বাড়ীর ছেলেরা সেখানে থেকে লেখা পড়া করে, প্রয়োজন হলে দু ভাইয়ের সেখানেই মিলন হয়।

ভাইয়ে ভাইয়ে যে বিশেষ মনের মিল আছে এমত নয়। একে অন্যের কোনও প্রকার সাহায্য করে না, দরকারও নেই। তিনি নিজে একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার, মাহিনা পান মাসিক সাত শত টাকা; ভাই দেড় হাজার টাকা পান। উভয়েই সঙ্গতিসম্পন্ন। তার পল্লী গ্রামের বাটীর বিষয় জান্‌তে চেয়েছিলেম, দেখলাম তাতে যেন তিনি লজ্জায় মরে যাবার উপক্রম হলেন।

অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো। পুরীর জলবায়ু কেমন, খাবার দাবার কেমন পাওয়া যায়, জজ ম্যাজিষ্ট্রেট (যাদের বিষয় আমরা কিছুই জানি নে) কি প্রকার লোক, কখন তাদের সঙ্গে দেখা করা যায় ইত্যাদি বিষয় জানবার জন্যই তার আকাঙ্ক্ষা দেখ্‌লেম। এ সব বিষয় ব্যতীত অন্য

কোনও বিষয়ের তিনি সংবাদ রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও অনুভব করেন না। আমি কোনও চাকরী গ্রহণ করব কি না এবং কল্লে কি চাকরী করব, তার বিষয়ও অনুসন্ধান কল্লেন।

প্রাতে আমরা চা পান করি। তবে আমি কি হেম চা-খোর নই। হেমের উপদেশ মত তার জন্য একটু বিশেষ ঘটার সহিত চা যোগাড় হলো। তিনি দিবসে দশ বার বার চা পান করেন। চা এর দেশে থেকে এর অপেক্ষা কম পান কল্লে তার প্রতি যে অবজ্ঞা দেখান হয়? কোনও কোন দিন তার উপরেও নাকি মাত্রা চড়ে যায়। ভাব গতিক দেখে যত দুর বুঝলাম, গোপনে দুই এক মাত্রা দেবীর প্রসাদ ও যে গলধঃকরণ না হয়, এমতও নয়। এই জন্যই বোধ হয়, এ বয়সেও শরীরটা বেশ চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রেখেছেন।

প্রত্যাগমনের সময়, আমাদিগকে তৎপর দিবস চার নিমন্ত্রণ করে গেলেন। কথাবার্ত্তায় বড়ই পরিপাটি, প্রত্যেকটী কথাই যেন ওজন করে বিশেষ ভেবে চিন্তে বলেন। মোটের উপর, তার সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ভালই লাগে। তবে কি বা চালচলনে কিবা কথাবার্ত্তায় সর্ব্ব বিষয়েই কেমন যেন একটা আন্তরিকতার অভাব।

তৎপর দিবস কথামত নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা তার গৃহে যেয়ে উপস্থিত হলেম। বাহির হতেই হারমোনিয়াম সংযোগে বামাকণ্ঠে গীত সঙ্গতী ধ্বনি শুন্‌তে পেলেম। গলা মিষ্ট তবে একটু অস্বাভাবিকরূপে চড়া। আর পি রায়ের কন্যা লীলা গাহিতেছিল। বোধ হয় আমাদের শোনাবার জন্যই এই গানের অবতারণা।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো। তাতে কোনও নূতনত্ব নেই। সেই জজ ম্যাজিষ্ট্রেট, মামলা মোকদ্দমা, আফিস, জলবায়ু ইত্যাদি বিষয় ব্যতীত

অন্য কিছুর তিনি ধার ধারেন না। যতদূর বুঝলাম, মরণ পর্য্যন্ত তিনি শুধু এ আলাপই করে যাবেন।

গল্পের শেষভাগে তার স্ত্রী, কন্যা লীলাবতী সহ উপস্থিত হলেন। একি, এ যে রীতিমত মেম সাহেব? সবুজ রঙের সিল্ক গাউনে শোভিত লীলাকে দেখাচ্ছিল অতি সুন্দর, তবে অত চকচকে রং যেন একটু চখে বাজিতেছিল। দেখে বোধ হলো, সতর আঠার বৎসর বয়স, নলিনীর সমবয়সী, কিন্তু নলিনীর ভিতর যে কোমলতা ও মাধুর্য্য বিরাজমান তাতে তার অনেকটা অভাব। গায়ের রং চাঁপা ফুলের ন্যায় তীব্র, উজ্জ্বল; নয়নদ্বয় তেমন সুবিস্তৃত না হলেও বড়; মুখখানি যৌবন সমাগমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে ও বেশ সুশ্রী; কপালখানি একটু বড়, তাতেই সৌন্দর্য্যের একটু ব্যাঘাত সম্পাদন করেছে—মোটের উপর চিত্তহারিণী। কোন্ যুবতী নয়? তাহার পার্শ্বে অর্দ্ধ দেশীয় অর্দ্ধ ব্রাহ্মিকা ধরণের পোষাক পরিচ্ছদে তাহার মাতাকে নিতান্ত সেকেলের মেয়েদের মত বোধ হচ্ছিল।

লীলাকে গাউনে শোভিত দেখে আমার মনটা প্রথম কেমন একটা বিদ্রোহভাব ধারণ করেছিল।

শেষটা মনে হলো, ভালই তো,—এইতো দরকার, সকল সভ্যসমাজই যখন এ পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করেছে, তখন আমাদের দেশের মেয়েরাই বা কেন করবে না? আমাদের প্রাচীনকাল হতে মেয়েদের জন্য যে পোষাক পরিচ্ছদ নির্দ্দিষ্ট, তা নিয়ে কি কোনও ভদ্র সমাজে কখনো বাহির হওয়া যায়? বডিস, সেমিজ, ব্লাউজ, পেটিকোট, বিলাতী সবই যখন গৃহীত হয়েছে ও হচ্ছে—তখন সাহস করে গাউনটা ধরতেই বা আপত্তি কি? ধরাইতো উচিত। কোমলতা ও লজ্জা, স্বীকার করি রমণী চরিত্রের ভূষণ, কিন্তু এ দুটী গুণ কি আমরা এমন অস্বাভাবিক

ভাবে তাদের ভিতর ফুটিয়ে তুলি নি, যে ফলে তারা জীবন সংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে অকর্ম্মণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মানবের ব্যক্তিত্বের বিকাশের যুগে রমণীকে ও বিশ্বমাঝে স্বীয় স্থান অধিকার করে নিতে হবে; পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে তাকেও জীবন সংগ্রামে নিযুক্ত হতে হবে। অনেক বিষয়ে লজ্জাশীলতা বিনয় ও কোমলতা পরিত্যাগ করে—তাকে স্বাবলম্বনশীলা সংগ্রামতৎপরা সাধিকারলাভে সমুৎসুকা হতে হবে। তা না হলে যে চিরকাল পুরুষের পদতলে পরে থেকে, তার মুখাপেক্ষী হয়ে, জীবনে অসফলতাকে বরণ করে নিতে হবে।

লীলার নয়নদ্বয় কি এক তীব্র জ্যোতিতে জ্বল্‌ছিল। প্রতিকথা হতে, প্রতিহস্ত সঞ্চালনে কেমন একটা তেজ আনন্দ ও উদ্যমের ভাব প্রকাশিত হচ্ছিল কিন্তু মাত্রাটা সব বিষয়েই যেন একটু বেশী। আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত কিন্তু আমার সঙ্গে এমন নিঃশঙ্কোচে আলাপ কর্‌তে লাগ্‌লো যেন কত দিনের পরিচিত। তা-ছাড়া, বোধ হল, আসামের মত লোকবিরল স্থানে বাস হেতু কথাবার্ত্তার ভিতরও যেন কেমন একটু মার্জ্জিত রুচির অভাব। মিশনারি মেমদের সাথে মিলা মেশার দরুণ তার প্রগলভতা ও লজ্জাশীলতার অভাবটাই বেশ চরিত্রে প্রকটিত হয়ে পড়েছিল—কিন্তু সে অনুপাতে মাধুর্য্যও কমনীয়তার যেন তেমন সমাবেশ হয়নি। লেখা পড়াও তেমন কিছুই জানে না, তাও কথাবার্ত্তায় সে সর্ব্বক্ষণই বোঝাতে চেষ্টা কচ্ছিল সে বিদুষী। বদনে যে পাউডার মেখেছিল তা যেমন তার দেহের সহিত ভাল করে মিশ না খাওয়ার দরুণ কেমন বিসদৃশ দেখাচ্ছিল,—তার কথাবার্ত্তার ভিতর ও অনেকটা সে প্রকার সহবতের অভাবের লক্ষণ পাচ্ছিলাম। তাও, তার সঙ্গে আলাপ করে ভালই লাগ্‌ছিল। তার মাতা অর্দ্ধবৃদ্ধ বয়সে স্বামীর উৎপাতে পড়ে অর্দ্ধ

ব্রাহ্মিকা সেজেছেন। মেয়ের গুনাপনাতেই তিনি মুগ্ধ, তার গুণগান কত্তেই অস্থির। এই যে বয়স হয়েছে তাও দেখ্‌তে বেশ সুন্দরী। কতকক্ষণ আলাপের পরেই বুঝলাম, যে স্বামীটী যতই কেন সাহেবী করুন না সর্ব্ব বিষয়ে এই বাঙ্গালী স্ত্রীটীর করতলগ্রস্ত। কোন্ বাঙ্গালীই বা নয়?

বুঝ্‌তে পাল্লেম, আর পি রায় কেন তার বাটীতে চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ করেছিলেন। শুধু বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্যেও বোধ হয় তিনি পুরীতে আসেন নি। কিন্তু ইহাও বুঝ্‌লাম, তিনি এবং আমার বন্ধুটী উভয়েই মহাভ্রমে নিপতিত হয়েছেন।

আমাকে নিয়ে হেমের এতঁ টানা হেঁচড়া কেন? আমার তো বিবাহে আমি কোন প্রয়োজনই দেখি না। বেশ চালাক লোক, আমার স্কন্ধে বেশ চাপিয়ে দূর হতে মজা দেখ্‌বে। তা হচ্ছে না।

ক্রমে ক্রমে আমাদের উভয় পরিবারের ভিতর বেশ মেলা-মেশা হয়ে পড়লো। মাঝে আর, পি, রায় স্ত্রীকন্যাসহ আমাদের বাসায় বেড়িয়ে গেলেন। মা এবং নলিনী ও তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে এলেন। দিন দিনই হৃদ্যতা ঘনীভূত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

নলিনী লীলার রূপে অভিভূত হয়ে পড়্‌লো। তার মুখে তার সুখ্যাতি ধরেনা। এমন সুন্দরী, এমন বুদ্ধিমতী এবং এমন সর্ব্ববিষয়ে তৎপরা মেয়ে নাকি এ পর্য্যন্ত তার নয়ন-গোচর হয় নি।

ইহার ভিতর একে অন্যের সহিত সই পাতিয়েছে। সর্ব্বক্ষণ তার রুবির (Ruby) প্রসঙ্গ শ্রবণ করতে করতে আমার কাণ ঝালাপালা হবার উপক্রম হলো।

এখন হতে প্রতি দিনই রজনীতে যখন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করতাম, তখনি নলিনী তার রুবি সম্বন্ধে কিছু না কিছু বলে যেতো। কোন দিন

বা তার হাতের লেখা, রচিত কোনও কবিতা এবং কোন দিন বা কারপেটের কাজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

কোন কোন দিন লীলা তাদের ভৃত্যকে সঙ্গে করে, দুপুর বেলা আমাদের গৃহে বেড়াতে আসতো। সে এলেই হাস্য-লহরীতে কক্ষ বিকম্পিত হয়ে উঠতো। তারপর আমাদের কক্ষে ও তার আগমন হতো। নিজ হতেই চেয়ার টেনে বসে পড়তো।

মিশনারী মেমদের হাতের মেয়ে। লজ্জার ভাবটা খুবই কম। কথাবার্ত্তায় বেশ একটু স্বাধীনভাবের পরিচয় তবে অভিজ্ঞতা নিতান্তই কম, এবং দেখাবার আকাঙ্ক্ষাটা সে তুলনায় বড় বেশী। হেমের সঙ্গে পূর্ব্বে অতি সামান্য ভাবের পরিচয় ছিল, কিন্তু এর ভিতরই তার সাথে এমনভাবে আলাপ করতে আরম্ভ করেছে—যেন মনে হয় কত দিনের পরিচিত।

মাঝে মাঝে সে আপনা হইতেই বিবাহ সম্বন্ধে কথা উঠিয়ে দিত। একদিন নিজের বিষয় উল্লেখ করে বল্‌লো—এ ঝক্‌মারি ব্যাপারেও মানুষ যায়। স্বাধীনভাবে জীবন যাপনটার ভিতর মনুষত্ব আছে, সুখ ও আছে। কোনও চিন্তা ভাবনা নেই, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও, যা ইচ্ছা কর। তা নয়, কোথাকার কোন্ স্বামী জুটিয়ে, শেষে তার গাল খেয়ে, লাথি খেয়ে মর। আমাদের মিস ডেনিস তো বিবাহের সম্পূর্ণ বিপক্ষ।

নলিনী তদুত্তরে বল্লো, লীলা! এ তোমার ভুল বুদ্ধি। স্বাধীনতায় যেমন সুখ আছে—বন্ধনের ভিতর ও আছে। বন্ধনের ভিতর এসেইতো মানুষ মানুষ হয়েছে, তা না হলে স্বাধীন প্রকৃতির পশুর সাথে তার কি পার্থক্য থাক্‌তো? বাপ, মা, ভাই, বোন, স্বামী, পুত্র, কন্যা এরা এক একটা আনন্দের খনি। এদের বাদ দিলে মনুষ্যজীবন কি?

"ভাই! তোমার ওসব বড় বড় কথা আমি বুঝ্‌তে পারি নে। তবে এই মাত্র বুঝি বিয়ে একটা মস্ত nuisance।"

নলিনী হেসে বল্লো, এখন তা মনে করতে পার কিন্তু যখন ছেলে বুকে ধরবে, তখন আর তা মনে হবে না। রমণী, জগতের মাতা, সন্তান সৃষ্টি রক্ষণ ও পালনেই তার জীবনের আনন্দ, স্ফূর্ত্তি।

আমাকে লক্ষ্য করে লীলা বল্ল, শুন্‌লেন তো সুরেশ বাবু বোনের কথা, তাকে আবার বিয়ে দিন। বিধবা বিয়ে কি হচ্ছে না?

কথা শুনে নলিনীর মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো।

এমন সময় হেম কক্ষান্তরে যাবার জন্য চেয়ার হতে উঠে দাঁড়ালো; তা দেখে লীলা বল্লো, এ কি, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? বসুন। আপনারা পুরুষ মানুষ, আপনাদের এত লজ্জা কেন? আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, আপনার এত বয়স হলো, আপনি বিয়ে কচ্ছেন না কেন?

এমন প্রশ্নের জন্য কেহই প্রস্তুত ছিল না। একটু স্তব্ধ থেকে হেম উত্তর কল্ল,—উত্তর তো আপনিই দিয়েছেন—এ ঝকমারি কাজেও লোক যায়।

লীলা উত্তর কল্ল, ঝক্‌মারি তো আমাদের মেয়েদের পক্ষে, আপনাদের পুরুষদের তো মহা ফূর্ত্তি। ঘরে এমন দাসী সকল সময় সেবার জন্য দণ্ডায়মান, মারুন কাটুন কেউ কিছু বল্‌বেনা। বরং যতই তাড়না করবেন ততই আপনার প্রতি তার শ্রদ্ধা ভক্তি বেড়ে যাবে। এমন দাসী হাতে পাবার সুযোগেও কেউ ছেড়ে দেয়?

হেম উত্তর কল্ল, তা বটে কিন্তু এখন কি আর সে রামচন্দ্রের দিন আছে—যে শত অত্যাচারের পরেও সীতা তার পদপ্রান্তে লুটাবার জন্য আকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকবে। এখনকার স্ত্রী কি আর দাসী পদ বাচ্য? বরং স্বামী বেচারীই দাস, স্ত্রীর মন যোগাতে গলদ ঘর্ম্ম।

লীলা বলে উঠ্লো,—তা কিছুটা সত্য বটে। রামচন্দ্র! ওঁর কথা বল্বেন না। বউটাকে নিয়ে সারাটা জীবন কি কাণ্ডটাই কল্লে। বুড় বাপ বিমাতার মন্ত্রণায় যেই বল্লেন, রাম! বাছা! বনে যাও, অমনি তথাস্তু বলে তিনি চল্লেন বনে। যাবার সময় কিন্তু দাসীটাকে সঙ্গে নিতে ভুল্লেন না। তার পর থেকে সে বেচারীর কি কষ্ট! কি দুর্দ্দশা! প্রথমতঃ আগুনে পোড়ান হলো, তারপর যদি বা গ্রহণ কল্লে, প্রজারা এসে যেই বল্লে, মহারাজ! আপনার স্ত্রী অসতী হয়েছে, অমনি কথা নেই বার্ত্তা নেই কোনও বিচার না করেই একাকী বনে পাঠিয়ে দিলে; তারপর তাকে এনে মাটিতে পুঁতে তার শেষ করে দিলে।

নলিনী। মাটীতে পুঁত্লে কে বল্ল?

লীলা। কেন, রামায়ণে নেই পৃথিবী দুভাগ হলো, সীতা পাতালে প্রবেশ কল্ল? পৃথিবী কি কারো কথায় এমন দুভাগ হয়? কথাটা হচ্ছে, গর্ত্ত করে তাকে পুঁতে ফেল্লে।

মিশনারী ভাবে পুষ্টা লীলার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হলেম। সত্যই কি সীতার পাতাল পুরীতে প্রবেশের এই সঠিক ব্যাখ্যা নয়?

লীলা বল্তে লাগ্লো, তা সীতাটীও ছিল এমন ধীর স্থির, লজ্জাশীলা যে, যে স্বামী এতদিন অত্যাচার করে গেল, একদিনও তার প্রতিবাদ কল্লে না। আমি যদি হতেম, অমন স্বামীর ঘর ছেড়ে ছুড়ে বাপের বাড়ী চলে আস্তেম। বাপ ও যে সে নয়—মিথিলার রাজা জনক। সেই বা মেয়েটীর জন্য কি কল্লে? কিছুই না। যেমন বাপ তেমনি স্বামী।

নলিনী। সীতার দৌর্ব্বল্যের ভিতরই শক্তি। তাই, সে আজ জগৎ পূজ্যা, রমণীর শিরোমণি। পৃথিবীতে সকলই কর্ত্তৃত্ব করবে এমন কিছু নয়। রমণী পুরুষের অধীন হয়ে চল্‌বে এই বাঞ্ছনীয়! তা না হলে, স্বভাবতঃ দুর্ব্বলা রমণীর উপায় নেই।

লীলা। আমার এ মত নয়। পুরুষের দিকে চেয়ে চল্‌তে হবে বলেই যে এতটা অধীন হব এমন আমি স্বীকার করি না। কেবল অধীনতা নয়, স্বাধীনতার সঙ্গে অধীনতা মিশিয়ে চল্‌তে হবে। যার যার স্থানে যে যে স্বাধীন অথচ একে অন্যের সুখ বিধানে তৎপর, উভয়ে সময় বিশেষে উভয়ের অধীন, এ না হলে উভয়ের পূর্ণ বিকাশ হবে না। বর্ত্তমানে সমাজে যে সকল আইন কানুন আচার পদ্ধতি প্রচলিত আছে তা সবই পুরুষের পক্ষে সুবিধাজনক, আমাদের স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটীও নয়। আমরা ঘরের বের হতে পারবোনা, কেন না আমরা অসতী হব। কেন, তোমরা পুরুষ যে কত সব কুকাজ কচ্ছ তার জন্য তোমরা কি রমণীর কাছে জবাবদহী? স্বামী মর্‌লে, স্ত্রী আর বিয়ে কত্তে পারবে না অথচ পুরুষ স্ত্রী বর্ত্তমানে যত ইচ্ছে পারবে, মর্‌লে তো কথা নেই। পুরুষ লেখা পড়া করবে, যেথানে সেথানে যাবে, আমাদের থাক্‌তে হবে সারাটী জীবন ঘরের ভিতর বসে। কেন? কত কি বল্‌ব? যতদিন পর্য্যন্ত পুরুষ ও স্ত্রী সমাজে সমান অধিকার না পাবে ততদিন এমন অত্যাচার চল্‌বেই।

লীলা চুপ কল্ল।

এ যে বিদ্রোহীর প্রতিমূর্ত্তি! বুঝলাম, মিস গিলবার্ট শিষ্যানীকে শিক্ষা দিয়েছেন ভালই। এরকমইতো দরকার। কেন স্বামীর দিকে চেয়ে রমণী নিজকে আজীবন সর্ব্ব বিষয়ে খর্ব্ব করে রাখ্‌বে? লীলার মত স্ত্রীর হাতে স্বামীও প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে উঠ্‌বে। কিন্তু তখনই আবার

মনে হচ্ছিল এমন স্ত্রীকে নিয়ে নির্ব্বিবাদে সংসার চালান কি যে সে স্বামীর পক্ষে সম্ভবপর ?

মোট কথা লীলাকে ভাল লাগ্‌তো অথচ কেন যেন তার প্রতি প্রাণ তেমন আকৃষ্ট ও হচ্ছিল না ! কি যেন কি তার ভিতর দেখ্‌তে পাচ্ছিলেম না। যেন চাল চলনে একটু মসৃণতার কমনীয়তার অভাব। তাহার সুগোল নিটোল মুখ খানা; লীলাচঞ্চল লালাসাদীপ্ত নয়নদ্বয়, কুঞ্চিত কেশদাম ; গৌরবর্ণ সুদীর্ঘ দেহ যষ্টি, দর্শনেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু ক্ষণেক পরেই মনে হয় কি একটু কিসের অভাব, যার জন্য সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়েও পৌছায় না। কথায় কথায় সুশ্রী দন্ত পংক্তি বিকশিত করে সে হাসির তরঙ্গে কক্ষ কম্পিত করে তোলে কিন্তু সে হাসিতে দর্শকের হৃদয় আনন্দ অপেক্ষা অশান্তির ভাবেই অধিক আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কথা যে উচ্চারণ করে তাতেও শক্তি এবং তীব্রতা যতটা প্রকাশিত হয় মাধুর্য্য তেমন নয়।

নলিনী সকল সময়ই তার রূপ গুণ ব্যাখ্যায় মুখরা। মাঝে মাঝে হেম ও তার সাথে যোগ দিতো।

শেষে যখন দেখ্‌লেম ব্যাপার নিতান্তই অসহ্য হতে চল্লো, তখন একদিন নলিনীকে বল্লাম, নলিন্ ! তোর দুটী হাতে ধরে বল্‌ছি, আমাকে আর জ্বালাস্‌নে।

সে উত্তর কল্ল, কেমন করে জ্বালালেম দাদা ! এমন সকল বিষয়ে চমৎকার মেয়ে, হাত ছাড়া কল্লে আর কোথায় এমনটী পাওয়া যাবে ? বাপ মার একমাত্র সন্তান। এখানে বিয়ে কল্লে কত আদরই না পাওয়া যাবে। (হেমের দিকে চেয়ে) কি বল হেম দা ?

হেম নিতান্ত ভাল ছাত্রটীর মত নিশ্চিন্ত মনে উত্তর কল্ল, তাতো ঠিকই।

আমি। তবে যা, তোর হেম-দাকে বিয়ে করতে বল্।

নলিনী। দাদা, তুমি ঠাট্টা কচ্ছ। আমার বড় ইচ্ছে হয়, লীলা আমাদের ঘরে আসে, তা হলে কত আনন্দের হয়। শেষে, কোন্ পাড়াগেঁয়ে গোঁড়া হিন্দুর মেয়ে এনে শান্তি স্বস্ত্যয়নে তুমি গোলমাল করে তুল্‌বে।

আমি। সে ভয় তোর নেই। বৌর মত আপদও ঘরে আনে?

নলিনী। কি যে তুমি বলো, দাদা, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে। তুমি কি কখনও বিয়ে করবে না, দাদা?

আমি। হেম আগে করুক, তারপর কর্‌ব। জানিস্‌নে, হেম আমার চেয়ে একমাসের বড়? বড় ভাইয়ের আগে ছোট ভাই কেমন করে বিয়ে কর্‌বে?

নলিনী (হেসে)। তা হলে হেম দা তোমায় বিয়ে কত্তে হচ্ছে।

দেখ্‌লাম, হেম তার কথায় ভাল করে উত্তর দিয়ে উঠ্‌তে পাল্লো না। তা দেখা যাবে, দেখা যাবে—এভাবে দুএকটী কথা বলে সে চুপ কল্ল। তার বদনের হাসি উৎসাহ মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হলো।

সঙ্গে সঙ্গে চেয়ে দেখ্‌লাম নলিনীর মুখকমলও শুষ্ক ভাব ধারণ কল্ল। উভয়ের নয়নদ্বয় অকস্মাৎ এক বিষাদমাখা ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো।

এ কি?

সে রজনীতে আমার শীঘ্র নিদ্রা হল না। একটী প্রশ্নই থেকে থেকে হৃদয়ে এসে আঘাত করতে লাগ্‌লো। আমরা কি তবে ভুল কচ্ছি? এমন ভাবে একটী যুবক ও বিধবা বালিকাকে মিল্‌তে মিশ্‌তে দিয়ে কি ভবিষ্য কোনও অনর্থের উৎপাদন কচ্ছিনা? সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথাও মনে জেগে উঠ্‌ছিল। নলিনীর কি পুনর্ব্বার বিবাহ হতে

পারে না? পূর্ব্বে যদি কোনও প্রকার ভুল হয়ে থাকে, তাহা কি সংশোধনের এই সুযোগ নয়? কিন্তু আবার মনে হলো—মা কি সম্মত হবেন?

সঙ্গে সঙ্গে লীলার কথাও মনে হচ্ছিল।

যতদূর জানতে পেরেছি, আমরা যাই কেন আগে না ভেবে থাকি; শুধু আমাদের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়েই আর, পি রায় পুরীতে আসেন নি। তবে এতদিনের কথাবার্ত্তায় যতদূর বুঝতে পেরেছি তিনি এবং তার স্ত্রী লীলার বিবাহের জন্য একটু চিন্তান্বিতা হয়ে পড়েছেন। যতই কেন সাহেবি করুন না—মেয়ের বয়স আঠার পার হতে চল্লো—এ অবস্থায় আর তাকে কোথায়ও বিয়ে না দিলে ভাল দেখাচ্ছে না। কিন্তু কাকে তিনি চান—আমাকে না হেমকে? আমার অর্থ আছে, কিন্তু মানসিক শক্তির অপ্রতুলতা বশতঃ সংসারক্ষেত্রে একপ্রকার অকর্ম্মণ্য। হেম, শক্তির উদ্যমের উৎসাহের পরিপূর্ণতায় চিত্তাকর্ষক। সাংসারিক অবস্থা ভাল নহে—কিন্তু, চাকরী জীবন তুচ্ছজ্ঞানে এই অত্যল্প কাল মধ্যে সে সুদূর আসামে যেয়ে শুধু একমাত্র নিজের চেষ্টায় যেমন ভাবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সূচনা করেছে—তাতে ভবিষ্যতে যে তাকে অর্থকৃচ্ছ্রতায় কষ্ট পেতে হবে না নিঃসন্দেহ। এমত অবস্থায় হেমকে পরিত্যাগ করে—আমার প্রতিই বা আর পি রায় কেন আকৃষ্ট হবেন? আর লীলা? তার মত প্রখরচেতনা উদ্দাম জীবনের বহ্নিতে পরিপূর্ণা, লালসাময়ী রমণীর পক্ষে আমার মত ভাবের কীটকে কি ভাল লাগ্‌বার কথা? হেমেরই উপযুক্ত সঙ্গিনী সে—যার সাহায্যে সে আনন্দভরে বিনাক্লেশে তার জীবন-রথ ঘর্ঘর শব্দে চালিয়ে যেতে পারবে। আর হেম? তারও কি প্রাণ তার দিকে আকৃষ্ট হয় নি?

এমন 'মনোরমা,—সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি। সেদিন বিবাহের কথা উঠ্‌তে হেম লীলার কাছে এমন ম্রিয়মান হয়ে পড়লো কেন? এতে কি বুঝাচ্ছে? তার প্রতি আশক্তি নয় কি? হেম ও আমার জীবনের মাঝে লীলা এসে কি শেষে একটা বিরোধের ভাব সৃষ্টি করার উপক্রোম কল্লো—না এ শুধু শুভ্রখণ্ড মেঘবিশেষ, দুদিন পরেই কোথায় অন্তহিত হবে?

আমার যদি বিবাহ করতেই হয়, তা হলে লীলাবতী যে অতি অভীপ্সিত পাত্রী তার সন্দেহ নেই। সত্যিই নলিনী বলেছে শেষে কোন্ পাড়াগেয়ে অশিক্ষিতা মেয়ে এনে জীবনটাকে দুর্ব্বিষহ না করে তুলি। বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কবি আমি—কোন খেয়ালের বশবর্ত্তী হয়ে কখন কি করে বসি—তাহার নির্ণয় নেই। লীলার রূপ কাকে না আকৃষ্ট করেছে? একটু অহঙ্কারের ভাব, একটু প্রগলভতা, তাহা সেরে নিতে কয়দিন? আর, পি রায় এবং তার স্ত্রীও লোক মন্দ নন। লীলা তাদের একমাত্র আদরের সন্তান। বিবাহ করতে হলে, উপযুক্ত পাত্রীই বটে।

কিন্তু আমি বিবাহ করব কি প্রকারে? সে কথা মনে হতেই যে হৃদয়তন্ত্রী বজ্রপীড়নে কেঁদে ওঠে।

*　　*　　*　　*　　*

সেদিন বৈকালের দিকে বেশ মেঘ করে এসেছে। আমি বাহিরে ঘাসের উপর ইজি-চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় একখানা মাসিকের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। চারিদিক আঁধার হয়ে আস্‌ছে—দূরে সমুদ্র বক্ষ আসন্ন ঝড়ের প্রতীক্ষায় নিস্তব্ধ মূর্ত্তি ধারণ করে আছে।

এমন সময়, অকস্মাৎ বই হতে মাথা উঠিয়ে দেখ্‌লাম,—যষ্টি হস্তে আর, পি রায় আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

আমি গাত্রোত্থান করে সসম্মানে তাকে চেয়ারে উপবিষ্ট হতে অনুরোধ কল্লাম। উপবেশন কর্‌তে কর্‌তে তিনি বল্‌তে লাগলেন,—আমরা আর দিন কয়েক পরেই চলে যাচ্ছি। ছুটী যা নিয়েছিলেম, তা ফুরিয়ে এলো। এখান হতে কলিকাতায় যেয়ে দিন কতক থেকেই গৌহাটীতে ফিরে যাব। এ কয়দিন তোমাদের সাথে আলাপ সালাপ বেশ থাকা গেছিল। বেশ তোমাদের ক্ষুদ্র পরিবারটী। তোমার মা, তিনিতো যেন সাক্ষাৎ দেবী; কোন গোলমালে নেই, শান্ত, শিষ্ট। নলিনীর কথা আর কি বল্‌ব? লীলার মুখে তার সুখ্যাতি ধরে না। মার জন্য ভাইর জন্য পাগল। আর তুমি? হেমের কাছে পূর্ব্বেও শুনেছিলেম, এখানে এসেও দেখ্‌লেম, বংশের সুসন্তান।

তিনি এত দীর্ঘ ভূমিকা করে কেন যে গল্প আরম্ভ কল্লেন,—প্রথমটা বুঝ্‌তে পাল্লেম না—কিন্তু শীঘ্রই সব প্রকাশিত হয়ে পড়্‌লো—লীলার সহিত বিবাহ প্রস্তাব।

অনেকক্ষণ ধরে আলাপ হলো। আমার যে বিবাহে সম্পূর্ণ অসম্মতি তাহা নিয়ে বাদানুবাদ হলো। যদি বিবাহ করা ঠিকই হতো তা হলে, তার পরিবারে বিবাহে কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার পক্ষে বিবাহ অসম্ভব।

বারংবার সে কথা তুলে তিনি আমার ক্ষতস্থানে আঘাত দিচ্ছিলেন। কিন্তু, উপায় কি? যতদিন বেঁচে থাক্‌ব, ততদিনই বুঝি এ যাতনা ভোগ কর্‌তে হবে।

আর লীলা? তারই কি বিবাহে মত আছে? আমার যেন মনে হচ্ছিল, আর পি রায় কন্যাকে ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পুরী, জগন্নাথক্ষেত্র হিন্দুর মহাতীর্থ। বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বলে বাঙ্গালীর চক্ষে ইহা এক মহাগৌরবের স্থান।

পুরীর প্রধান দ্রষ্টব্য সমুদ্র। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে তাহা অপেক্ষাও আর একমহত্তর দৃশ্য আছে, জগন্নাথদেব ও তাহার মন্দির।

আমরা মন্দিরে মাঝে মাঝে বেড়াতে যেতাম। কিন্তু সত্য বল্‌তে কি, কি দেবতা কি তাহার মন্দির দর্শনে, একবিন্দু ভক্তিও আমার হৃদয়ে কখনো দেখা দেয়নি।

দেব-দেবীর পূজা, পরমেশ্বরের গুণগরিমাদি সম্বন্ধে স্তোত্রপাঠ আর আমার হৃদয়ে শান্তি আনয়ন করতনা। বরং শিক্ষিত কোনও লোককে এসব ব্যাপারে নিযুক্ত দেখ্‌লে মনে কেমন একটা কষ্টের ভাব উদয় হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তুপাকার কুসংস্কারের সঙ্গে যুদ্ধ করে সর্ব্বত্রই যে জ্ঞান পরাজিত হচ্ছে একথা ভেবে হৃদয় বিক্ষোভিত হয়ে উঠ্‌তো। হায়! মানুষের জ্ঞান-নেত্র কি খুলবে না? সে ও যে পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদির ন্যায় বৃহৎ প্রাণীজগতের একাংশ বিশেষ, সৃষ্টিব্যাপারে তার সুখস্বচ্ছন্দতা-বিধানের জন্য যে বিশেষ কোনও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় নি, 'আত্মা' নামে যে বিশেষ কোনও পদার্থ তার জন্য প্রস্তুত হয়নি, সমস্ত জীব-জগতের সঙ্গে সেও যে একই জড়ামরণ-ব্যাধির নিয়মাধীন এবং তাহাকেও যে অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জীবনসংগ্রামে স্বজাতিও পরজাতির সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে জয়ী হতে ও প্রাণরক্ষা করতে হবে, শুধু কাল্পনিক সৃষ্টিকর্ত্তা সৃজন করে, তার উদ্দেশে কাপুরুষের ন্যায় চীৎকার কল্লে যে কিছু হবেনা, এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করে কবে সে উন্নতির পথে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হবে? সংসার,

পরের বৃথা অনিষ্ট না করা, সাহস শক্তি উদ্যম, প্রেম ইত্যাদি ভাবকেই আমি ধর্ম্মজীবনের প্রধান অঙ্গ মনে কর্‌তাম এবং তাহাদের পরিপুষ্টি সাধনের জন্যই বরং আমি চেষ্টা কচ্ছিলাম। ভগবানে আমি ক্রমে ক্রমেই বিশ্বাস-হীরা হয়ে পড়ছিলাম।

হেম এবং আমি যে দিন মন্দির দর্শনে গমন কল্লাম, সেদিন দেবতার সান্ধ্য-বন্দনার জন্য মন্দিরাভ্যন্তরে ধুমধাম লেগে গেছে। শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গাদির ধ্বনিতে সন্ধ্যাকাশ পূর্ণ হচ্ছে।

দেবতার অসংখ্য ভক্তগণ সারি সারি ভাবে করযোড়ে মন্দিরের ভিতর ও বাহিরে দণ্ডায়মান। আমি দেখ্‌ছিলাম আর ভাবছিলাম, এমন করেতো কতবর্ষ ধরে মানুষ তাপিত, ব্যথিত, ক্লিষ্ট ও দিশহারা হয়ে এক ফোঁটা দয়ার প্রত্যাশায় মন্দিরের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু কই দেবতা কারো কখনও উপকার সাধন করেছেন কি? তার আশীর্ব্বাদে দরিদ্র ধনী হয়েছে কি? পীড়িতের পীড়া সেরেছে কি? পুত্রহারা জননী আবার সন্তানের সাক্ষাৎ পেয়েছি কি? বন্ধ্যা পুত্রধন লাভ করে মাতৃত্বের ক্ষুধা মিটাতে পেরেছে কি? কি হিতসাধন করবে দেবতা? দেবতা নিজে কি? মানুষের হাতে গড়া কাঠের টুক্‌রা।

মানুষই গড়েছে, মানুষই আবার ইহার কাছে করযোড়ে কাতর ভিক্ষা কচ্ছে। সামান্য অকিঞ্চিৎকর প্রাণশূন্য জড়পিণ্ড কাষ্ঠখণ্ডের এমন কি সাধ্য যে কাকেও কোন বিপদে কোনও প্রকার সাহায্য করে?

শুনছি, কেহ বল্‌ছে কাষ্ঠখণ্ডে মন্ত্রদ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং ভগবানের তাহাতে অধিষ্ঠান হয়েছে। এই প্রকার ক্ষুদ্র সংস্করণের প্রাণ কোথায় ছিল তবে? এখনই বা আসিল কেমন করে? সামান্য মানব কর্তৃক দুই একটী বাধা স্তোত্র পাঠ করতেই যাহা উড়ে এসে জুড়ে বসে,

ঈদৃশ প্রাণের নিকট প্রার্থনা করেই বা কি লাভ? কই কালাপাহাড় তার দেহের উপর এমন অত্যাচার করলো, তারতো তিনি কিছুই করতে পারলেন না? অথচ যে ভক্ত তার পূজার সামান্য ত্রুটী করে, তার সর্ব্বনাশ সাধন হতে নাকি একটুও বিলম্ব হয় না। আর ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, মানুষ শত চেষ্টা করেও যে দেবতাকে একবার হৃদয়াভ্যন্তরে বা নয়নসম্মুখে আনয়ন করতে পারেনা, সেই মানুষই কোনও প্রকারে মন্ত্রটী উচ্চারণ করলেই দেবতা চলে আসেন।

সব ভ্রান্তি! সব ভুল! কি এখানে কি জগতের অন্যত্র মানুষ দেবতা-জ্ঞানে আসৃষ্টি মানুষেরই পূজা করেছে। দেবতা বা পরমেশ্বর তাকে সৃষ্টি করেনি, সেই তাদিগকে সৃষ্টি করেছে। কবে এ মহাভ্রান্তি দূর হবে? কবে মানুষ নিজ পায় সাহসে ভর করে দাঁড়াতে শিখ্‌বে? কবে বুঝ্‌বে, সংসারে তাকে সাহায্য করবার জন্য ভগবানও নেই, কেহই নেই, শুধু আছে তার নিজ বুদ্ধি ও শক্তি?

করযোড়ে গললগ্নীকৃতবাসে দণ্ডায়মান সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ লোক-সমূহের দিকে চাহিতেছিলাম, আর ভাবছিলাম, মানবের কি শক্তিরই না অপচয় হচ্ছে। দেবতার একবিন্দু কৃপাকণা ভিক্ষাস্বরূপে পাবার আশায় সে যে অর্থ সামর্থ্য ব্যয় কচ্ছে, তা যদি জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনে, দৈহিক ও মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য এবং সমাজের হিতসাধনে নিয়োজিত করতো, তা হলে মানবজাতি আজ কি উন্নতির শিখরেই না অধিষ্ঠিত হতো?

অস্বীকার করিনা, ভগবানে বিশ্বাস সময় বিষয়ে মানবের মঙ্গল সাধন করেছে। এভাবে অন্যান্য ভুল বিশ্বাস হতেও অনেক সময় অনেক উপকার লাভ হয়েছে। কিন্তু এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিনে, কেন্ মানুষ এই

অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করে, জীবন অর্থশূন্য লক্ষ্য শূন্য করে রাখবে ? চেয়ে দেখনা কেন, যে সমাজ যত ভগবানের হাত, ধর্ম্মের হাত হতে মুক্ত হয়েছে, সেই সমাজই সর্ব্ববিষয়ে তত উন্নতির পথে এসে দাঁড়াচ্ছে। বিজ্ঞান, যার কল্যাণে আজ মানব আপনাকে বিশ্ববিজয়ী মনে কচ্ছে তার কোন্‌টী ভগবানের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস করে চলেছে ?

আমরা ধর্ম্মের ছায়ায় পড়ে আর বড় হতে পারছিনে। সর্ব্বত্রই দেবতা, সর্ব্বত্রই ভগবান, সকল কাজেই পাপের বিভীষিকা, নিজের অস্তিত্ব নেই বল্লেই চলে, সকল ব্যাপারেই 'যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি'-র ভাব, চল্‌তে ফিরতে সকল সময়ই ধর্ম্মের সুদৃঢ় শৃঙ্খলে বদ্ধ। তেত্রিশকোটী দেবতাতো রয়েছেনই, তা ব্যতীত ব্রাহ্মণ দেবতা, পতি দেবতা, বৃক্ষ দেবতা, জল দেবতা, পশু দেবতা, দেবতা নয় কে, নয় কোথায় ? এত দেবতার ভিতর, সামান্য মানুষ বড় হবে কেমন করে ?

ইয়ুরোপ দিন দিনই ধর্ম্মের হাত, পরমেশ্বরের হাত হতে মুক্ত পাচ্ছে, নিজ শক্তির উপর নির্ভর করতে শিখ্‌ছে এবং ভগবানকে ত্যাগ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছে। যে দিন হতে তার নিজ শক্তিতে আত্মপ্রত্যয় জন্মেছে, সেদিন হতে তার সর্ব্ববিষয়ে অতিদ্রুতগতিতে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যে সমাজ ভগবানে বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত করে জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় এবং সাম্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমাজে পরিণত হবে। সমস্ত মানব সমাজই অলক্ষিতে ধীরে ধীরে সে দিকেই অগ্রসর হচ্ছে !

*   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *

সন্ধ্যায় মন্দির দৃশ্য কি সুন্দর !

জীবন

সে-দিন একাই মন্দির দর্শনে গিয়েছি। অসুস্থতা-নিবন্ধন হেম আস্‌তে পারেনি। কি-যেন একটা পর্ব্বদিন, লোকের ভিড় অত্যন্ত অধিক। কত লোক মন্দিরে প্রবেশ লাভ কচ্ছে, কত লোক চলে আস্‌ছে। এক এক স্থানে এমন ভিড় হচ্ছে, যে লোকের তা হতে বাইরে আসা কষ্টকর। আমি দু-এক জনকে হাত ধরে টেনে বাহির কল্লাম, কাকেও অন্য প্রকারে সাহায্য কল্লাম।

ঈষৎ দূরে দাঁড়িয়ে আছি। সেই জনসংঙ্ঘ হতে এমন সময় 'মা, মা গেলুম' এমন ভাবে কোনও বিপন্না রমণীর কাতর ধ্বনি শুন্‌তে পেলাম। লোকে লোকারণ্য, এমন ভিড় ও ধাকাধাক্কি যে ভিতর হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

কালবিলম্ব না করে আমি সেই লোকরাশির ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়্‌লাম। অনেক কষ্টে দুই হাতে লোক সরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে দেখ্‌লাম, লোকের ভিড়ে একটী রমণীর প্রায় মরবার উপক্রম হয়েছে। তার অবসন্ন দেহ এলাইয়া পড়্‌ছে। আমি যেয়ে তাকে ধর্‌লাম এবং অতিকষ্টে ধরাধরি করে বাহিরে আন্‌লাম। রমণী তখন অজ্ঞান।

সম্মুখস্থ প্রস্তর বেদীর উপর শয়ন করিয়ে জলধারা হতে হস্তে জল নিয়ে, তার মুখে চোখে দিলাম। তৎপরে আমার আঁচলের সাহায্যে তাকে বাতাস দিতে লাগ্‌লাম। এমন করে, কতকটুকু সময় চলে গেল।

ক্রমে আমার হৃদয়ে অপার আনন্দ উৎপাদন করে সে চক্ষু মেলিল এবং বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চারিদিকে চাইতে লাগ্‌লো। অপরিচিত লোকের সম্মুখে নিজকে তদবস্থায় দেখে সে নিতান্ত ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল।

আমি তাকে বারংবার আশ্বাস দিয়ে বল্লাম, কোনও ভয় নেই আপনার। আপনি নিরাপদ স্থানেই আছেন।

রমণী উঠে বসলো এবং তৎপরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বল্ল, যেই হোন আপনি, আমায় রক্ষা করুন। আপনার পায়ে পড়ি।

আমি বল্লাম, কোনও ভয় নেই। আপনি যেখানে যেতে ইচ্ছা করেন, সেখানেই এখনি পৌঁছে দোব। আপনার যা ইচ্ছা আমাকে অনুগ্রহ করে জানতে দিন।

জন কয়েক দর্শক বিস্ময়াপন্ন হয়ে, রমণীর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছিল। আমি তাদিগকে দূরে সরিয়ে দিলাম।

রমণী বলতে লাগলো, আমাদের বাড়ী কলকাতায়। মামার সাথে আমরা পুরীতে বেড়াতে এসেছি। মা আর ঝির সঙ্গে আজ মন্দিরে আরতি দেখতে এসেছিলুম। লোকের ভিড়ে তারা যে কোথায় গেল, আমি কিছুই ঠিক কত্তে পাল্লুম না।

আমি তার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করলাম, এবং পুরীতে তারা কোথায় বাস কচ্ছে জানতে চাইলাম। তদুত্তরে সে যা বল্লে, তাতে আমি যুগপৎ আনন্দ এবং বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লাম।

রমণী আর কেহ নয়, পিতৃদেবের বন্ধু নীলমণি বাবুর কন্যা—সরোজ কুমারী, নলিনীর বাল্যের খেলার সাথী।

যখন তাকে শেষ দেখেছিলাম, তখন তার বয়স বছর তের। এণ্ট্রেন্স ক্লাশ পর্য্যন্ত পড়েই পড়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন বোধ হয় ষোড়শ সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করেছে।

সরোজকে এক সময় বড়ই ভাল লাগতো। আজ অনেকদিন পরে এ-বস্থায় তার সন্দর্শন লাভে স্বার্থপর হৃদয় কি এক আনন্দে নেচে উঠলো।

তাকে আমার পরিচয় দিয়ে বল্লাম, তোমার কোনও ভয় নেই। চল, আমাদের বাসায়। সেখানে মা আছেন, তোমার সই নলিনী আছে, কোনও কষ্ট হবে না। আমি গাড়ী করে তোমাকে তোমাদের বাসায় পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব। তুমি যখন বাসার ঠিকানা বল্‌তে পাচ্ছনা, তখন খুঁজে বের করতে একটু সময়ও লাগ্‌বে। এই লোকের ভিড়ের ভিতর যে তোমার মাকে খুঁজে বের কর্‌তে পারব—অসম্ভব।

সরোজ ও তাতে সম্মতি জ্ঞাপন কল্ল। কেবল একবার বল্ল, মা ও মামাকে সংবাদ না পাঠালে, তাঁরা যে বড় অস্থির হয়ে পড়বে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সে তাদের পুরীর বাসার কোনও ঠিকানাই বল্‌তে পাল্লনা।

গাড়ীর জন্য অনুসন্ধান কল্লাম কিন্তু পেলাম না। অগত্যা উভয়ে রওয়ানা হলাম।

অন্ধকার পক্ষ। ঘুট্‌ঘুটে আঁধার। আকাশে চাঁদ দেখা দেয়নি। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। আমি সরোজের হাত ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগ্‌লাম।

হৃদয়ের ভিতর কি এক ভাবের স্পন্দন অনুভব কচ্ছিলাম। কেন, কি কারণে এমন হচ্ছিল, বুঝ্‌তে পাচ্ছিলাম না।

সরোজকে মহাবিপদ হতে উদ্ধার করে মহা সৎকার্য্য করেছি, তাই কি এমন অপার আনন্দ অনুভব কচ্ছিলাম? কি বলবো কেন এমন হচ্ছিল?

সরোজ আমার অতি নিকটে, আমারই পাশাপাশি হয়ে চলেছে। তাও যেন, মনে হচ্ছিল কত দূর। আমি বারংবারই তাকে বল্‌তে লাগলাম, তোমার ভয় নেই। কি বলবো প্রতি মুহূর্ত্তে দেহ ও মনের

ভিতর দিয়া, এক বিদ্যুৎ শিখা ক্রীড়া করে যাচ্ছিল। মাঝে মাঝে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও সেই অন্ধকার রজনীতে তার বদনের দিকে চাহিতেছিলাম। একবার মনে হলো, সেও আমার দিকে, তার কৃষ্ণতারকাখচিত নয়ন স্থাপন করে চেয়ে রইলো।

তাকে পূর্ব্বে কতকবার দেখেছি, সে তখন বালিকা। এ কয়েক বৎসর ভিতর তার কি অপরূপ পরিবর্ত্তন হয়েছে। দেহলতিকা নাতিদীর্ঘ ধরণের, সুন্দর বদনখানি আসন্ন যৌবনের লাবণ্যে বিকাশোন্মুখ কমল-কলির ন্যায় সুশ্রী এবং কথার ভিতর কেমন একটু মিষ্টত্ব, শুনলেই চেয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে। নব বসন্তের প্রথম হিল্লোলে যেমন বাগানের মল্লিকা মালতীর প্রাণ শিহরিয়া ওঠে, আমার হস্তে স্থাপিত তার কোমল সুগোল মাংসল অঙ্গুলিনিচয়ের সংস্পর্শে আমারও হৃদয় তেমনি স্পন্দিত হচ্ছিল। সরোজ ও কি তার প্রাণের ভিতর এমনি কোন স্পন্দন অনুভব কচ্ছিল না?

রাস্তার পার্শ্বে একটা শাখা-পত্র-বহুল প্রাচীন বটগাছ। নিম্ন প্রদেশ ঘন অন্ধকারাবৃত। দূর হতে স্থানটী দেখলে পথিকের প্রাণে আপনা হতেই ভয়ের সঞ্চার হয়। সেই স্থানে এসে সরোজ যেন ভয়ে জড়সড় হয়ে পড়্‌লো। আমি তাকে কাছে এনে বল্লাম, ভয় নেই তোমার, ভয় নেই সরোজ।

সেই আকস্মিক ভাবের প্রাবল্যে,—সে যেন আমার বক্ষের দিকে ঈষৎ লতাইয়া পড়লো, আমি তাকে ঈষৎ আকর্ষণ করে, তার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করে বল্লাম, ভয় নেই তোমার সরোজ, ভয় নেই। কথা কয়টী বল্‌ছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, আহা! সারাটী জীবনই যদি উভয়ে উভয়ের দিকে এমন ভাবে চেয়ে থাকৃতে পারি!

আর কতকটুক। তার পরেই আমরা গৃহে পৌছলাম।

দেখ্‌লাম, হেম তার কক্ষে ইজি চেয়ারে হেলান দিয়ে 'বেঙ্গলী' পাঠ কচ্ছে, মা ও নলিনী শুনছে। আমার বিলম্ব দেখে তারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ছিল এবং বারংবার সদর দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কচ্ছিল।

সরোজ সহ আমাকে গৃহে প্রবেশ করতে দেখে, তাহারা আশ্চর্য্যে অভিভূত হয়ে পড়ল এবং একে অন্যের দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর্‌তে লাগ্‌লো।

আমি বিনা বিলম্বে সমস্ত ব্যাপার খুলে বল্লাম। সরোজ একটু পশ্চাতে ছিল, তাই নলিনী ভালরূপে দেখ্‌তে পায়নি। এক্ষণ আমার মুখে তার বিবরণ জান্‌তে পেরে, আনন্দে অধীরা হয়ে তার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুইজনে দুজনকে এতদিন পরে পেয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লো।

সরোজের সন্দর্শনে মার ও আহ্লাদের সীমা নেই। তিনি তাকে আশীর্ব্বাদ করে বল্লেন, মা তোমার কোনও চিন্তে নেই। আমি এখনই সুরেশকে দিয়ে তোমার মা আর মামার কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছি। এ বাড়ীতো তোমার নিজ বাড়ী। কোনও লজ্জা বা ভয়ের কারণ নেই, মা।

আমার আর বিশ্রাম নেই। সরোজকে রেখে তার নিকট হতে তার মামার আবাস স্থলে সম্বন্ধে যে কিছু সংবাদ পেলাম, তার সাহায্যেই তার বাটী খুঁজে বাহির কর্‌তে যত্ন পর হলাম।

রাস্তায় মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষীণদীপ্তি আলো জ্বল্‌ছে। আমি যে পাড়ায় গিয়েছিলাম, সেখানে অনেক বাটীতে অনুসন্ধান কল্লাম কিন্তু কোথায় ও সরোজের মামা গোবিন্দ বাবুর সংবাদ পেলাম না। অবশেষে নিরাশ হয়ে, রাত্রি দ্বিপ্রহরের পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লাম।

ততক্ষণ বাটীর সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। হেমের শরীর ভাল নয়, সকালেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নলিনীর সহিত সরোজ নিদ্রাভিভূতা। কেবল মা আমার প্রতীক্ষায় জেগে রয়েছেন।

আমাকে প্রত্যাগত দেখে তিনি বল্লেন, কি খোকা, বাসা খুঁজে পেলে?

'না মা, অনেক চেষ্টা কল্লুম, পেলুম না। বোধ হয়, সরোজ ঠিক সংবাদ দিতে পারে নি।'

'যাক্, তার জন্যে তুমি চিন্তা করোনা। কাল দিনের বেলা খুঁজে বের করতে কোনও কষ্ট হবে না। এসো, এখন খাওয়া দাওয়া করে শোওগে। অনেক রাত্রি হয়েছে।'

আহারে বস্‌লাম, তেমন খেতে পাল্লেম না। পরিশ্রান্ত হয়েছিলাম, তাই বলে কি? কি জানি, কেমন করে বল্‌বো? কোন প্রকারে, আহার শেষ করে শয্যার আশ্রায় গ্রহণ কল্লাম।

নির্জ্জন-চিন্তা আমার জীবনের চিরমধুময়ী সহচরী। কৈশোরের দিন হতেই তাকে কত আদর যত্ন করে আস্‌ছি। সমস্ত দিবসের ভিতর আমার সেই সময়টাই ভাল লাগ্‌তো, যখন একাকী বসে বসে আমি তার স্নেহ-সুকোমল হস্তে নিজকে সঁপে দিতে পারতাম। তার মৃদু স্পর্শে, ধীর শান্ত-সুগভীর বাণীতে আমার দিবসের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহ ও প্রাণ পুনঃ নব আশায় ও বলে সঞ্জীবিত হয়ে উঠ্‌তো।

অনেক দিন হয়, সেই চিত্তহারিণী কল্পনা দেবীর সাক্ষাৎ লাভ হয়নি। আজ শয্যার আশ্রয় গ্রহণ কর্‌তেই, সরোজরূপিনী অপ্সরার স্বর্ণোজ্জ্বল পক্ষপুট আশ্রয় করে, সে আমার হৃদয়াকাশে দেখা দিল।

সরোজের কথা মনে হতেই হৃদয়াভ্যন্তর হতে সুখধারা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছিল। বর্ষার পূর্ণিমা রজনীতে যেমন তরঙ্গিনী কানায় কানায় সলিল

রাশিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তেমনি আমার দেহ মন ও অমৃতধারায় ভরে উঠ্‌ছিল। মনের অকস্মাৎ এ কি ভাব? ভীতিবিহ্বলা সরোজের কথা কয়টী, অন্ধকার রজনীর ক্ষীণ আলোতে আঁধারে মেশা ফুল্ল মুখখানা, দীপ্ত্যুজ্জ্বল চাহনটী, এবং সর্ব্বোপরি আমার প্রতি তার নিঃশঙ্কোচে আত্মসমর্পণ, মনে পড়্‌ছিল। আমি বারংবার নিজ অন্তরের দিকে চাহিতেছিলাম, আর তখনই মনে হচ্ছিল, শেষে কি আমি সরোজের ভালবাসায় বাঁধা পড়্‌লাম?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটী রমণীর কথাও মনে হচ্ছিল। সে সরোজ অপেক্ষাও অধিকতর সুশ্রী।—কিন্তু কৈ, লীলাকে দেখেতো প্রাণ তার প্রতি আকৃষ্ট হলনা? তাকেতো আমার প্রাণ চাহিতেছে না।

সরোজ কি তবে লীলা অপেক্ষা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ? কেমন করে বল্‌ব? না সে পূর্ব্ব হতে পরিচিত বলেই, তার দিকে প্রাণ অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছিল?

তুলনায় শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট নির্ণয় সুকঠিন। দেহের যেমন ক্ষুধা, আত্মারও বুঝি তেমনি ক্ষুধা আছে। হয়তো, আর একজনের বুভুক্ষু হৃদয় লীলাকে লাভ করে, তার আজন্ম ক্ষুধাতৃপ্তি সাধনে সক্ষম হবে। জগতে বুঝি এমন কোনও রমণী নেই, যে কখনও অন্য আর একজনের হৃদয়ে প্রেমের তরঙ্গ উত্তোলিত করেনি।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক মনে নেই। 'দাদা, দাদা—বেলা হয়েছে, উঠ্‌বেনা ?'—বলে নলিনী দরজায় ডাক্‌ছে।

চক্ষু মেলে দেখ্‌লাম,—রৌদ্র উঠেছে এবং সূর্য্য-রশ্মি এসে, জানালার ফাঁক দিয়ে, বিছানার উপর পড়ছে।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। কতকটুক পরেই চা এবং জলযোগ করে ঘরের বাহির হয়ে পড়লাম। আমার চালচলতির ভিতর কি কিছু ব্যাগ্রতার ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল ? তাই বুঝি হেম ধীরে ধীরে চার পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ঈষৎ হেসে বল্লো, বলি সুরেশ বাবু, বড়ই যে অস্থির দেখা যাচ্ছে ? এমন কার্য্যতৎপরতা তো কখনো দেখিনি। ব্যাপারখানি কি একটু খুলে বল্‌তে কোন আপত্তি আছে কি ?

'কই, কিছুই নয়।'

হেম হেসে বল্ল, তাতো দেখ্‌তেই পাচ্ছি, তবে এত যে তাড়াতাড়ি ?

'দেখছনা, ব্যাপারটা কি ? হয়তো সরোজের মা কেঁদে কেটে আকুল হচ্ছে। একটু সংবাদ দিয়ে যদি তাদের এমন চিন্তা দূর করা যায়, তা হলে তা করা যে সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য, তা বোধ হয় তুমি অস্বীকার করবে না।'

'তাতো ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ যে এরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতার আবির্ভাব হলো—এই তো আশ্চর্য্য। যাক্‌—তোমার কর্ত্তব্য কার্য্যে আমার বাধা দেওয়া ভাল দেখাচ্ছেনা। যাও,—তোমার মনোরথ পূর্ণ হোক।'

আমি হেসে বল্লাম, সে আবার কি? তোমার অর্থ কি? মনোরথ ঠনোরথ কি সব বল্‌ছ—বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

তুমি এমন কবি—মনোরথ অর্থ বুঝতে পাল্লে না? এই,—তোমার মন যা চায়, তাই। অর্থাৎ, তোমার সুহৃদবর প্রার্থনা কচ্ছে,—তুমি যা চাচ্ছ—তা যেন লাভ করতে সক্ষম হও।

'সে কি? তোমার কেবল ঠাট্টা বিদ্রূপ।'

'তা তুমিই জান।'

আমি 'দুষ্টু' বলে হাস্‌তে হাস্‌তে ঘরের বাহির হয়ে পড়্‌লাম।

সে কেমন করে এমন ভাবে আমার প্রাণের পরিচয় পেলো? আমি তো তাকে কিছুই বলিনি। না, সে শুধু অর্থশূন্য ঠাট্টা বিদ্রূপই কচ্ছে?

সে-দিন আমি ঠিক কল্লাম, সমস্ত পাড়ার সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করব। কার্য্যতঃ ও তাহাই আরম্ভ কল্লাম।

অনেক বাটীতে গেলাম, অনেক খুঁজলাম,—কিন্তু সরোজের মাতুল গোবিন্দ বাবু বা তার মাতার কোনও সংবাদই পেলাম না। পরিশ্রমের কোনও ফলই হলোনা। দ্বিপ্রহরের পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কল্লাম।

কিন্তু তথাপি আমি নিরাশ হলাম না। ঠিক হলো, বৈকালে আবার অনুসন্ধানে নির্গত হব।

আহারও বিশ্রামের পর, হেমের কক্ষে উপবেশন করে কথোপকথন কচ্ছি, এমন সময় নলিনী সরোজ সহ সেই গৃহে প্রবেশ কল্লো।

সরোজ আমাদের নিতান্ত পরিচিত। বাল্যকালে আমি ও হেম তাকে নিয়ে কত ঠাট্টা হাসি তামাসা করেছি। কিন্তু কেন যেন আজ তাকে দেখে লজ্জা এসে দেখা দিল। সে আমার দিকে মাঝে মাঝে

অপাঙ্গে দৃষ্টি কচ্ছিল,—মাঝে মাঝে চারি চক্ষের মিলন হচ্ছিল, আনন্দ ও হচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে লজ্জায় ও যেন মরে যাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল সে এখন উঠ্‌লেই বাঁচি।

চারিটা বাজিতে না বাজিতেই আবার ঘরের বাহির হয়ে পড়লাম। ভাবলাম, এবার যেমন করেই হোক, তার মামার সন্ধান করবই।

মা আমার রৌদ্রক্লিষ্ট বদনের দিকে চেয়ে দুঃখ প্রকাশ কচ্ছিলেন কিন্তু আমি নিজে কোনও প্রকার কষ্টই অনুভব কচ্ছিলাম না। বরং বেশ একটু আনন্দই বোধ হচ্ছিল।

আর এক পাড়া হতে খুঁজতে আরম্ভ কল্লাম। এ বাড়ী সে বাড়ী অনেক বাড়ীই খুঁজলাম। পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সকল বাড়ীতেই আমাদের ঠিকানা রেখে আস্‌তে লাগলাম।

এই দুই দিন পুরীর এমন গৃহ নেই, পাণ্ডাদের আশ্রম নেই, যেখানে সরোজের মাতুল ও তার মার অনুসন্ধান করিনি কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাদের কোনও প্রকার সন্ধানই পেলেম না।

সেই দিবস প্রাতে কলকাতায় নীলমণি বাবুর বাটীতে টেলিগ্রাফ করা হয়েছিল। যখন নিতান্তই অকৃতকার্য্য হয়ে পড়লাম, তখন মনকে এই বলে প্রবোধ দিলাম, অন্ততঃ কলকাতা হতে নেবার জন্য শীঘ্রই লোক আস্‌বে।

ক্রমে ঘোর অন্ধকারে জগৎ পরিব্যাপ্ত হল। মিউনিসিপ্যালিটির আলোকে ক্ষীণদীপ্ত রাজ-পথ দিয়ে আমি তখনও গৃহ হতে গৃহাভ্যন্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

ঘড়ী খুলে দেখলাম—রাত্রি নয়টা। ঠিক করলাম, আর একবার কতকটা জায়গা অনুসন্ধান করে, সে দিনকার কাজ শেষ করবো।

ক্রমে দশটাও বাজিল। তথন অনন্যোপায় ও বিফলমনোরথ হয়ে গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। বাসায় আস্তে বিশেষ বিলম্ব হলোনা।

গৃহে প্রবেশ করতেই নলিনী হর্ষোৎফুল্ল মুখে বল্ল, দাদা! তোমার জন্যে যে আমি নিতাই দাদাকে পাঠিয়েছি, তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়নি বোধ হয়। সন্ধ্যার কিছু পরেই টেলিগ্রাফের উত্তর এসেছে—সরোজের মা ও মামা কলকাতা গেছেন, সরোজকে নিতে গোবিন্দ বাবু রববার দিন আস্‌বেন।

আমার হৃদয় হতে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল কিন্তু সত্যি বল্‌তে গেলে,—আমাব অনুসন্ধান তৎপরতার ফলেই যে সরোজের সঙ্গে তার মাতার সাক্ষাৎ লাভ হলোনা এতে মনটায় একটু গ্লানির ভাব দেখা দিল।

তা যাই হোক, ভালই হলো। নলিনীকে উদ্দেশ করে বল্লাম, তা বেশ। এখন তোমার সখীকে নিয়ে কয়েক দিন আমোদ আহ্লাদ কর।

নলিনী উৎফুল্ল হয়ে উত্তর কল, তাতো নিশ্চই। পুরীর জীবনটা যে এমন সুখের হবে ভাবিনি। ভগবানের মহা অনুগ্রহ। সুদূর আসাম হতে এসে জুটল রুবি, আর কলকাতা হতে কেমন করে সরোজই বা এসে উপস্থিত হলো। কালকে দাদা! তোমার একটু সকালে বাজারে যেতে হবে, ভাল কিছু মাছতরকারী ফল-ফলারি আন্‌তে হবে, আমি আমার দুই সইকে খাওয়াব। এমন সুযোগ আর হবে না। (মার দিকে চেয়ে) কি বল মা! তুমি?

তিনি হেসে উত্তর করলেন, বেশতো। তোমাদের যাতে আনন্দ হয় তাই করো। এ কয়টা দিন যে এখানে থাক্‌তে পারবে তাতে সরোজও বা কত আনন্দিত হয়েছে। বড় ভাল মেয়ে, সরলপ্রাণ, মিষ্টিহাসি, মিষ্টি কথা, দেখলেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছে করে। এখন বয়স হয়েছে তাও মনে

হয়—প্রাণটার কোনও পরিবর্ত্তন হয়নি—তেমনি সাদাসিধে, কোমল। (আমার দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন) তা সুরেশ, কাল ভোরে উঠেই সরোজের বাবার কাছে একটা টেলিগ্রাম পাঠিও যে সরোজ এখানে বেশ ভালই আছে, চিন্তাভাবনার কোন কারণ নেই।

আমি 'আচ্ছা' বলে উত্তর করলেম।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন মহা আনন্দের ভিতর নিমন্ত্রণ ব্যাপার সমাধা হয়ে গেল। হেমন্তের ক্ষুদ্র বেলা যখন প্রায় পড়ে এসেছে, তখন আমার ও হেমের জন্য বেশ ঘটার সহিত চা পানের বন্দোবস্ত হতে লাগ্‌লো। নলিনী হেসে হেসে বল্‌তে লাগলো, দাদা! তুমি ও বেলা বড্ড খেটেছ, এবেলা একটু বসে গল্পসল্প কর, একটু চা-পানের বন্দোবস্ত করা গেছে।

আমি বল্লাম, তাতো বেশ।

বারেন্দায় টেবিল সাজান হলো, আমি ও হেম যেয়ে চেয়ারে উপবেশন কল্লাম, নলিনী ও লীলা পরিবেশন কর্‌তে লাগলো, সরোজও সাহায্য কর্‌তে লাগ্‌লো। মা সম্মুখে এসে বস্‌লেন।

লীলা বলে উঠলো, এভাবে জীবন যাপনটা মন্দ নয়। কোনও কাজ নেই, বেশ বসে বসে গল্প করা, বেড়ান ও খাওয়া দাওয়া। এভাবের স্বাধীন জীবনের ভিতরই আনন্দ।

নলিনী উত্তর করল—তুমি তো রুবি কেবল স্বাধীনতা, স্বাধীনতা করেই অস্থির। দুর্ব্বল রমণীর কেন এত স্বাধীনতা?

হেম তাহার কথায় সায় দিয়ে বল্ল, সকল কাজেই যখন রমণীকে পুরুষের দিকে চেয়ে থাকৃতেই হবে, তখন এত স্বাধীনতার প্রচার কি তার পক্ষে ভাল ?

লীলা একটু উত্তেজিত হয়ে, তার সুগোল শুভ্র বাহু ঈষৎ উত্তলন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণচুড়ী বাজিয়ে বল্ল,—তা, কে বলে স্ত্রীলোককে সব বিষয়ে পুরুষের দিকে চেয়ে থাকৃতেই হবে ? এই যে এত ইংরাজ মিশনারী মেম গুলো আছে, কোন্ পুরুষের উপর নির্ভর করে তারা চলেছে ? ছেলেবেলা হতে কাজেকর্ম্মে শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয়ে আমরা পুরুষের পরাধীন, এ শিক্ষা পেতে পেতেই আমাদের এক্ষণে এ অবস্থা দাঁড়িয়েছে, নড়তে চড়তেই আমাদের সর্ব্বক্ষণ ভয়, কখন কি হয় ? (সরোজের দিকে চেয়ে) কি বল সরোজ ? তোমার মত কি ?

সে কি বল্বে ? মুখ তুলতেই,—আমার নয়নের সহিত তার নয়ন মিলিত হলো। লজ্জায় এবং মনে হলো যেন আনন্দের ভাবে গণ্ডস্থল আরক্তিম হয়ে উঠ্লো। সে ধীরে ধীরে উত্তর করলো,—আমারও অনেকটা নলিনীর মত। ইহাই আমাদের দেশের প্রাচীন শিক্ষা—এই ভাল।

আমি বলে উঠলাম, স্বাধীনতাকে আমি খুবই ভালবাসি। তবে সমাজে থাকৃতে হলে,—এই স্বাধীনতাকে কিছু খর্ব্ব করে নিতে হয়। আমারও বিশ্বাস—আমাদের দেশের রমণীদের আমরা জোড় করে খর্ব্ব করে রেখেছি। পুরুষও রমণী দুইজনেরই পূর্ণবিকাশ প্রয়োজন, তা না হলে সমাজের উন্নতি হবে কি করে ? উদ্দাম স্বাধীনতাও চাইনে আবার আমাদের মত ঘরের ভিতর মেয়েদের ভয়ে রাখতেও ইচ্ছা করিনে।

মা হেসে বল্লেন,—তাও কি সম্ভব ?

আমি উত্তর কল্লেম,—সম্ভব নয় কিনা, কেমন করে বলব? কোনও সমাজেই স্ত্রী পুরুষের জীবন কি ভাবে চালিত হওয়া উচিত তাহা এপর্য্যন্ত ভালরূপ বিবেচিত হয়নি। সর্ব্বত্রই পুরুষের সুবিধার দিক হতেই সমাজ চালিত হয়েছে,—রমণীর সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি করেনি।

হেম। আমি এত কিছু বুঝিনে। তবে এই মাত্র বুঝ্ছি,—সরোজ যে সন্দেশ তৈয়ের করেছে,—তা খুবই খেতে ভাল হয়েছে। এই বলে সরোজের দিকে চেয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে একখানা সন্দেশ মুখে দিলো।

লীলা হেসে বল্ল,—সরোজ! সরোজের কথা বল্ছেন? ভারি বুনিয়াদি ঘরের মেয়ে, এত সবও জানে। নলিনীও কম নয়। আমি ভাবি এত সব ঘরকন্না ওরা শিখ্‌লো কেমন করে? আমার এসব হয়ে ওঠেনা, উঠ্‌বেও না।

এই প্রকার নানা আলাপ সালাপ কথাবার্ত্তার ভিতর সন্ধ্যাটী বেশ আনন্দে অতিবাহিত হয়ে গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসা—ভালবাসা করে লোক সকল পাগল কিন্তু কেহ বল্‌তে পারে কি—জিনিষটা কি?

মানুষ ক্ষুধা পেলে খায়, পীড়িত হলে যাতনায় অস্থির হয়। এ সকল তার দেহও মনের ধর্ম্ম। সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে। সকলেরই মূল কারণ দেহ ও মন।

ভালবাসাও কি মানবের এই প্রকার একটী দৈহিক ধর্ম্ম নয়? তাই যদি না হবে, জীবনের সকল সময় সে এর চর্চ্চায় সুখ পায়না কেন?

এ ভাব দেখাই বা দেয়না কেন? অশীতিবর্ষের বৃদ্ধকে কেহ প্রেম-পাগল দেখেছ কি?

জীবনে এমন একটী সময় আসে যখন পুরুষ ও রমণী একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে, আত্মহারা হয়ে পড়ে। ইহা একটী পীড়া বিশেষ—যদি দূরীভূত হয় মঙ্গল, না হলে জীবন এক মহাবিষে জর্জ্জরিত হয়ে থাকে।

ভাল না বাস্‌লে কি হয়? সরোজকে এত ভাল লাগ্‌ছে কেন? যদি তাকে ভুলে যাই, তা হলেই বা ক্ষতি কি?

কেমন করে বল্‌ব, কোথা হতে এই ভালবাসার বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে নিপতিত হয়। সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি যে কোনও রমণীর জন্য অস্থির হব, স্বপ্নেও ভাবিনি। আর আজ সরোজ সরোজ করে হৃদয় আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ছে।

সারাটী রজনী ধরে তাকেই স্বপ্ন দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, সেও আমারই কথা ভাব্‌ছে। কোন্ সুদূর হতে, পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়ে, অনন্ত আকাশের ভিতর দিয়ে, কাহার তাপিত তৃষিত প্রাণ আমার প্রাণের ভিতর ব্যাকুলভাবে এসে আশ্রয় গ্রহণ কচ্ছে? সেই প্রাণটুকু হাতে নিয়ে দেখ্‌ছিলাম, কেমন সুন্দর! স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, নির্ম্মল! আমারি ভালবাসার গোলাপীরঙ্গে রঞ্জিত! সরোজ যে আমাকে ভালবেসেছে, আমার প্রাণই যে তা বলে দিচ্ছিল।

কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সুখ-স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। হৃদয় আঁধার করে কেবলই বাণী উত্থিত হচ্ছিল, সরোজ আমার হবে না।

না হোক সে আমার। আমি যে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত জনকে পেয়েছি—ইহাই যথেষ্ট।

মন্দির হতে যখন তাকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কচ্ছিলাম, তখন ভীতার্ত্তা সরোজ যে বিষাদ-মাখা প্রীতিমাখা দৃষ্টিতে আমার দিকে বারংবার চাহিতেছিল, থেকে থেকে সেই দৃষ্টিটিই আমার মনে জাগছিল। জগতে এমন সুন্দর মধুর বুঝি কিছুই নয়।

রজনীর শেষভাগেই ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। শয্যায় শুয়ে শুয়ে নানা কথা ভাবছিলাম। ক্রমে প্রভাত হলো। জানালার ফাঁক দিয়ে গৃহে আলো প্রবেশ কর্‌তে লাগলো, আমি গাত্রোত্থান কল্লাম।

হেম ও আমি উভয়ে মিলে চা পান কচ্ছি এমন সময় সে অকস্মাৎ বলে উঠ্‌লো, কি হে সুরেশবাবু! ডুব দিয়ে জল খাওয়া হচ্ছে, আর মনে মনে ভাবছ কেহ কিছু দেখ্‌ছেনা। Rascal! স্বীকার কর, তুমি সরোজকে ভালবেসেছ, বল ঠিক কি না?

মনের ভাব ঈষৎ গোপন করে বল্লাম, বা! তুমি তো বেশ লোক! এ খেয়াল আবার কোথা হতে গজাল? ভাল বুঝেছ তুমি!

যতই কেন চেষ্টা কচ্ছিলামনা, বেশ বুঝিতেছিলাম, মনের ভাবটী ঠিক গোপন করে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে।

হেম বল্ল, এতে আর আশ্চর্য্য কি? চিরকালই তো এরূপ, যার সঙ্গে যার মজে মন কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। এমন সুন্দরী লীলা, যার তুলনা নেই, পায়ে পড়ে লোটাচ্চে, তার দিকে দৃষ্টি নেই, তুমি কিনা পাগল হলে সরোজের জন্য।

আমি। বেশ, এ দেখি ভাল মুস্কিলেই পড়া গেল। কেই বা তোমার লীলার জন্য পাগল, কেই বা সরোজের জন্য। ও সবে আমার প্রয়োজন নেই। আর কে বল্লে তোমাকে, লীলা পায়ে পরে গড়াগড়ি যাচ্ছে? ও মেয়েটীকে তুমি বোঝ নি?

হেম। কেন, আর পি রায় কি কোন প্রস্তাব তোমার কাছে করেন নি ?

আমি। আর পি রায়ের মত হলেই কি হলো ? লীলার মত আছে কি ? আমার তো মনে হয় না। জলের মত তার প্রাণ, তোমার আমার কাজ নয় তাতে কোনও দাগ বসান।

হেম। হ্যাঁ, তার আবার মতামত ? শত হলেও তো হিন্দুর মেয়ে, বাপ মার কথা না শুনে কি উপায় আছে ?

আমি হেসে বল্লাম, এ সব বাড়ীঘর রাস্তা পোল তৈয়ারী করা নয় হে, প্লেন করা গেল, ইট সুরকী চূণ আনা গেল, মুটে মজুর লাগান গেল, বিনা কষ্টে দালান তৈয়ার হয়ে গেল। তোমার ইঞ্জিনিয়ারি মোটা মগজে এসব ব্যাপার ঢুকবে কিছু কম।

হেম বাধা দিয়ে হেসে বল্ল, স্বীকার কল্লাম, তোমরাই ভালবাসার চাষ করেছ বেশী কিন্তু কথাটী হচ্ছে কি, এমন ভাবে তুমি আর কত কাল চল্‌বে ? যদি বল, না হয় সরোজের সঙ্গেই যোগাড় করি। সেই বা এমন মন্দ কি ? মানাবে বেশ।

আমি। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার কোথা থেকে এলো ?

হেম। দুর্ব্বুদ্ধি কি, যা হয় ঠিক করে ফেল, শেষে আপশোষ কর্‌তে হবে।

আমি একটু চুপ করে ছিলাম। হেম বল্ল, কোনও উত্তর নেই যে ? কি ভাব্‌ছ ?

আমি। আমার মনের ভাব তুমি এখনও বুঝ্‌লে না। আমি কখনও বিয়ে করব কিনা তার ঠিক নেই।

সে ঈষৎ ব্যাঙ্গস্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল, তোমার মনের অবস্থা কেন এমন হলো, সখী? বিয়ে না করে বঙ্গযুবক এই ভীষণ রমণীসঙ্কুল দেশে একাকী নির্ব্বিঘ্নে কতকাল জীবন কর্ত্তন কর্‌তে সক্ষম হবে?

আমি হেসে বল্লাম, তোমার সবতাতেই রসিকতা; একটু থাম না ভাই!

হেম। তুমি কি আমায় পেঁচকের মতন গম্ভীরমুখ হয়ে থাক্‌তে বল? বেশ, ব্যাপার মন্দ নয়। তোমার কিসে মঙ্গল হবে, তার জন্য ভেবে চিন্তে আমি আকুল, আর তুমি কিনা আমাকে অপদার্থ আখ্যা দেবার যোগাড় কচ্ছ। একেই বলে, যার জন্য করি চুরী, সেই বলে চোর। এই ঘোর কলিকালে লোকের ভাল করা কিছ নয়।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

সরোজ কাল চলে যাবে। এ কয়দিন বেশ আমোদ আহ্লাদেই কাটান গেছে। তার সঙ্গে আলাপ খুব বেশী সময় হয়নি কিন্তু যখনই হয়েছে তখনি তার নয়নের ভিতর আনন্দের তরঙ্গলীলা দেখে আকৃষ্ট হয়েছি।

সে দিন সন্ধ্যাকালে একাকীই বেড়াতে বেরিয়েছি। কিছুই যেন ভাল লাগ্‌ছিল না—অথচ খারাপ লাগ্‌ছিল এমতও বল্‌তে পারবনা। থেকে থেকে একখানা মুখই হৃদয়পটে ভেসে উঠ্‌ছিল, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হচ্ছিল, সে আমার হবে না।

অনেক দূর চলে গেলাম, ফিরে আস্‌তে একটু বিলম্ব হলো। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতেই হেম হেসে বলে উঠলো, এইতো আমাদের সুরেশবাবু,

কাজের সময়ই নিরুদ্দেশ। কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? এইমাত্র গোবিন্দবাবু এসে সরোজকে নিয়ে গেল!

আমার প্রাণটা ধক্ করে উঠ্‌লো। একটু হেসে বল্লেম, যাও, ঠাট্টা কচ্ছ না কি? হেম উত্তর কল্ল, আমিতো মিথ্যাবাদীই, তোমার বোন কি বলে শোন।

কথা না বল্‌তে বল্‌তেই নলিনী এসে কক্ষে প্রবেশ করে বল্ল, দাদা! গোবিন্দবাবু এইমাত্র সরোজকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। তাকে কত বল্লাম, সরোজের ও ইচ্ছা ছিল কাল যাবার জন্য। তা তিনি শুনলেননা। সরোজকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়েই, তাঁকে নাকি পশ্চিম কোথায় যেতে হবে। এদিকে জাহাজের সময় চলে যায়, তিনি থাক্‌তে পার্‌লেন না।

একমুহূর্ত্তে কোন্ স্বর্গ হতে আঁধারগর্ভে নিপতিত হলাম। পৃথিবীর সমস্ত আলো যেন আমার চক্ষের সম্মুখ হতে অপসারিত হলো। আকাশ-কুসুম ভেঙ্গে গেল। অন্ধকারাচ্ছন্ন মেঘগম্ভীর আকাশে ক্ষণকালের জন্য হৃদয় মন মোহিত করে সরোজরূপিণী দামিনী কোথায় অন্তর্হিত হলো!

আর কি দেখা হবে? কেমন করে বলব? গোবিন্দবাবুর উপর বড়ই ক্রোধ হলো। অকৃতজ্ঞ!

চেষ্টা করেও হেমের কথায় কোন উত্তর দিতে পাল্লেমনা। আমার মনের গলা কে যেন চেপে ধর্‌ছিল, শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল।

অবসন্নমনে সে রজনীতে শয্যার আশ্রয় গ্রহণ কল্লাম। সারা রজনী থেকে থেকে একজনের মুখ-স্মৃতিই হৃদয়ে জেগে উঠ্‌ছিল।

প্রাতে হাতমুখ ধুয়ে টেবিলের কাছে এসে বসব, এমন সময় কানাই দাদা হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্ল, বিছানা ওঠাতে যেয়ে বালিশের নিচে পেলাম।

একি ? তারই যে লেখা। চেয়ারে বসে চোখ বুলিয়ে গেলাম। সরোজ লিখ্‌ছে।

সুরেশবাবু ! ক্ষমা করবেন। যাবার সময় আপনার কাছে কৃতজ্ঞতাটুকু প্রকাশ করে যাবারও সুযোগ হলোনা।

হতভাগিনী সরোজ

আবার সেই মধুরমূর্ত্তি হৃদয়াকাশে ভেসে উঠ্‌লো। দেখলাম, প্রাণ অভ্যন্তর হতে যা বল্‌ছিল ভুল নয়। সরোজ অকৃতজ্ঞ নয়।

সেই ক্ষুদ্র লিপিখানা বার বার অনেকবার পড়লাম। শেষে পিরাণের বুকের পকেটে রেখে দিলাম। থাক্‌, এখানেই তাকে রাখবার স্থান।

তখনই আবার মনে হলো, ছি ! ছি ! কি নরাধম আমি ! কি সব ভাবনা ভাবছি ! এর চেয়ে মরা ও যে আমার পক্ষে শতসহস্রগুণে শ্রেয় ছিল।

* * * * *

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের পুরীর জীবন ফুরিয়ে এল। লীলা ও তার মাকে সঙ্গে করে ভুবনেশ্বর, খণ্ডগিরি, কনারক ইত্যাদি দর্শনীয় সব স্থান দেখে এলাম। কিন্তু কিছুই তেমন ভাল লাগছিল না। এখন থেকে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের আয়োজন চল্‌তে লাগ্‌লো।

প্রবাসে অল্পেতেই আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব জমে ওঠে। যে সকল পরিবারের সঙ্গে আমরা একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হয়েছিলাম, তাদের সহিত দেখা-শুনা শেষ হলো।

আর পি রায় সদলবলে এসে দেখা করে গেলেন। চা পান, নিমন্ত্রণ, বনভোজন উপলক্ষে লীলার সাথে অনেকবার দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে কিন্তু সে যে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে—এমনতো বোধ হয় না।

বরং আমার অপেক্ষা হেমের সহিত অধিক সময় কথাবার্ত্তায় তাকে নিযুক্ত থাক্‌তে দেখতাম। তাহার ভিতর লজ্জাশীলতার একটু অভাব, স্বাধীনতার ভাব অনেকটা অত্যধিক কিন্তু বল্‌তে কি, তাও তাকে আমার ভালই লাগ্‌তো। তার ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষত্ব আছে, সহজ সতেজ ভাব আছে, অন্যের সঙ্গে বা যুদ্ধ করে নিজ স্থান অধিকার করে নিতে পারে। এমনই তো হওয়া উচিত রমণীর। পদে পদে কেন সে পুরুষের মুখাপেক্ষী হয়ে থাক্‌বে? লজ্জাবতীলতার মত গায়ে বাতাসটী লাগতে না লাগ্‌তেই নিজ অস্তিত্ব মুছিয়ে ফেলবার চেষ্টার কি দরকার? পুরুষ ও রমণী দুজনকেই নিজ নিজ ভাবে একই রূপে জীবন যুদ্ধে গা ঢেলে দিতে হবে। বর্ত্তমান জগৎ আর পূর্ব্বের ন্যায় তেমন কবিতার জগৎ নয়। পূর্ব্বের সে গোলাপ ফুল, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনী, কোকিলের কুজন সবই আছে সত্য কিন্তু এ সকলকে উপভোগ কর্‌তে হবে এখন সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, অবসরে। ঘর্ম্ম-সিক্ত কলেবরে যেয়ে প্রিয়ার ওষ্ঠাধর হতে চুম্বন গ্রহণ কর্‌তে হবে। যে বীর সেই তার বিজয়মাল্য পাবে, আর সেই রমণীই পুরুষের গ্রহণীয় হবে, যে হাস্যবদনে নির্ভয়ে নিঃশঙ্কিতচিত্তে তার পার্শ্বে এসে দণ্ডায়মান হবে। ভীরু পুরুষ, কিম্বা সাহসশূন্যা পদে পদে ভীতার্ত্তা রমণীতে আর প্রয়োজন নেই।

সত্য কথা বলতে কি, আমার দর্শনে লীলার নয়নদ্বয় আনন্দোজ্জ্বলভাব ধারণ করত। আজ যখন আমি ও হেম রিটার্ণ ভিজিট উপলক্ষে আর পি রায়ের বাটীতে উপস্থিত হলাম এবং বিদায়ের পর চলে এলাম, তখন বোধ হচ্ছিল যেন তার বদনকমল কি এক বিষাদের কালিমায় ব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। সত্যই কি তবে সে আমায় ভাল বেসেছে। ভাবতে হৃদয়ে আনন্দও হচ্ছিল, আবার দুঃখের ভাবে পূর্ণ হয়েও উঠ্‌ছিলো।

তৎপর দিবস আর পি রায় হতে আর একবার বিবাহ সম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ পেলাম। 'দেখব' বলে কোনও প্রকারে নিষ্কৃতি পেলাম।

কয়েক দিন পরে আমরা কলকাতায় ফিরে এলাম। দিন চারি পরে হেম আসামের দিকে চলে গেল। যাবার সময় দেখলাম, সে আকুল নেত্রে কাহার দিকে মাঝে মাঝে চাহিতেছে। দ্বিতলের বাতায়ন-সম্মুখে ম্লানমুখী নলিনী দণ্ডায়মানা। নলিনীর প্রাণও কি তাহাকে চাহিতেছিল?

চাহিবে, তাতে আশ্চর্য্য কি? স্বামীকে সে কয়দিনই বা দেখেছে? তাকে ভালবাসার তো কোন সুযোগই তার হয়ে ওঠেনি! বিবাহের পূর্ব্বেও দেখেছি—হেমের সান্নিধ্যে সে যেমন আনন্দময়ী হয়ে উঠ্‌তো এমন আর কারো কাছে নয়। দৈব দুর্ব্বিপাকে অভাগিনীর প্রাণ যাকে চাচ্ছিল—তাকে বুঝি সে পায়নি।

আর হেম? অনেক দিন পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম, সে নলিনীকে ভালবেসেছে—কিন্তু একদিন ও তো মুখ ফুটে আমায় জানাল না। হেমের তুলনা নেই, বাসনাকে কেমন সে সংযত করে রেখেছে। সে তেজের আধার, শক্তি সাহসের উৎস—তাকে দেখে আমার জীবন উপভোগ্য বলে মনে হয়। বৃথা কথার আড়ম্বর নেই—নিজ নির্দ্দিষ্ট কাজ করে যাচ্ছে—দৃঢ়চিত্ত, দৃঢ়পণ।

ভেবে দেখ্‌লাম, আমারই দোষ। মুখ ফুটে সে বলেনি সত্য কিন্তু আমি কি তার মনের আভাস কিছুই পেয়েছিলাম না? যদি আর একটু সাহসী হতাম, বাবাও মাকে সব কথা খুলে বল্‌তাম, তা হলে নলিনীর সাথে তার সম্মিলন কি সংঘটিত হতে পারত না? কোথা হতে শেখরনাথ এসে সব গোলমাল বাঁধিয়ে চলে গেল। থাক্—যা হয়েছে—এক্ষণে অনুশোচনা বৃথা।

* * * * * *

হেম যাবার পর, আমাদের জীবন পূর্ব্বের ন্যায় ধীর মন্থরগতিতে চল্‌তে লাগ্‌লো। নলিনী কলেজে যেতে লাগ্‌লো। আমি ও আমার পাঠ গৃহে গ্রন্থরাশিপূর্ণ টেবিলের পার্শ্বে আসন পাতলাম।

লেখাপড়া শিখলাম, এখন কি যে করব তাহাই ভাব্‌তে লাগলাম। ওকালতী? আইন পড়ছিলাম সত্য কিন্তু সে ব্যবসার জন্য কি আমি উপযুক্ত? সে ক্ষেত্রে কি আমি কিছু কর্‌তে পারব? আর, সমস্ত দেশইতো মুখ বেচে খাচ্ছে।

আমাদের দোকান গোমস্তা মথুরামোহনের অধীনে একরকম চল্‌ছিল। বিশ্বাসী কর্ত্তব্যপরায়ণ কর্ম্মচারী—তার বড় সাধ আমি ও পিতার ন্যায় কায়মনোবাক্য হয়ে দোকানের কাজকর্ম্মে নিজকে নিয়োজিত করি। কিন্তু বল্‌তে লজ্জা বোধ হয়, দোকানের নাম উঠ্‌তেই সঙ্গে সঙ্গে সেই অন্ধকারপূর্ণ কুটীর, মসল্লার তীব্র গন্ধ, লোকের গঞ্জনা ও চীৎকার মনে পড়ে তার দিক হতে আমার মন প্রতিনিবৃত্ত হতো।

ভাবতে লজ্জা বোধ হচ্ছিল—সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রতি ঘৃণা ধিকারের ভাবে হৃদয় ভরে উঠ্‌ছিল। এ বিদ্যার বোঝা নিয়ে বড়বাজারে মসল্লার দোকানে কি বিসদৃশ দেখাব? আমার কালিদাস ও শেক্সপিয়ার, এরিষ্টটল ও ক্যাণ্টের জ্ঞান আমার কোন কাজে লাগ্‌বে? ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধে শিক্ষা পেলেম কৈ? চাকর হবার জন্যই শিক্ষিত হয়েছি—প্রভুর ভাবে জীবন যাপন করবার জন্য, প্রভুর পদ পাবার জন্য উপযুক্ত রকম শিক্ষা পেলেম কৈ? শিক্ষা—যুবককে সর্ব্বরূপে জীবন যুদ্ধে জয়ী হবার জন্য গড়ে তুল্‌বে—কিন্তু আমার শিক্ষা আমার কোন্ কাজে লাগ্‌বে?

অর্থোপার্জ্জন-ক্ষমতা—তাই বা হল কৈ? চরিত্রগঠন—তাই বা কোথায়? আর জ্ঞানের প্রসারতার বৃদ্ধি—তাও কি তেমন হয়েছে?

আপাততঃ, অন্য কোন কাজই নেই। তাই সাত পাঁচ ভেবে দোকানের কাজই একটু একটু দেখব মনস্থ কল্লাম।

একদিন সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া শেষ করে—দেয়ালের গায় বিলম্বিত পিতৃদেবের প্রতিমূর্ত্তিকে প্রণাম করে এবং মার আশীর্ব্বাদধূলি মস্তকে গ্রহণ করে দোকানে যেয়ে উপস্থিত হলেম। সেদিন মথুরামোহনের কি আনন্দ, কি ফূর্ত্তি।

মসল্লার গন্ধে নাসিকা রন্ধ্র বন্ধ হয়ে আস্‌ছিল কিন্তু তথাপি জোড় করে বসে রইলাম। নানাপ্রকার কেণা বেচা হচ্ছে, খরিদ্দার-সব টাকা গুণে দিচ্ছে, কেহ জিনিষপত্রাদি বুঝিয়ে দিচ্ছে, মুফস্বলে মাল প্রেরণ হচ্ছে, ভিঃ পি আস্‌ছে—বেশ একটা সরস জীবনের ভাব। আমি সব কাণ্ডকারখানা দেখ্‌ছিলাম আর ভাবছিলাম, এ জীবন তো বেশ। এর ভিতর যে স্বাধীনতাটুক রয়েছে, যে ফূর্ত্তি আনন্দ রয়েছে—তা সরকারী আফিস কি উকীল লাইব্রেরীতে নেই। কাকেও খেটে গলদঘর্ম্ম হতে হচ্ছে না এবং অনিয়মিত সময়ে অত্যধিক পরিশ্রম করে স্বাস্থ্য নষ্ট করবারও কারো আশঙ্কা নেই। খারাপ কেবল ঐ মসল্লার গন্ধটা, উহাইতো অসহ্য। আর স্থানটীর আলো ও বাতাসের পথ অনেকটা রুদ্ধ।

সারাদিনই কেণা বেচা চলতে লাগল। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে আস্‌লো। মথুরামোহন সারা দিবসের বেচা কেণার হিসাবটী এনে দেখালো। সে দিবসের বিক্রী ৩৬৫৪।৶০। লোক সকল বল্‌তে লাগলো—আজকার বিক্রী অপ্রত্যাশিত। বৃদ্ধ মথুরামোহন বল্‌তে লাগ্‌লো—তা না হবে কেন? লক্ষ্মীর বর পুত্র স্বয়ং উপস্থিত, আজ ও যদি না হবে, তবে হবে

কোন্ দিন হে? দেখেছ তো কর্ত্তার আমলে, তু দিন যদি তিনি না আস্তে পারতেন, বেচা কেণা কেমন মন্দা পড়ে যেত।

অর্থের কি সম্মোহিনী শক্তি! মসল্লার গন্ধ ভাল লাগ্‌ছিল না সত্য কিন্তু সন্ধ্যাবেলা যখন টাকার তোড়াটী সহ গাড়ীতে বাড়ী ফিরে আস্‌ছিলাম, তখন মনে হচ্ছিল সমস্ত দেহটাই যেন কেমন মিষ্টি বোধ হচ্ছে। বোধ হয়, স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন ও সে আনন্দের একটী মূলীভূত কারণ ছিল।

হাস্‌তে হাস্‌তে গৃহে প্রবেশ কল্লাম। নলিনী টেবিলের উপর জল খাবারটা এনে দিল, মা এসে দাঁড়াল। আমি মন-খুলে দোকানের দিবসব্যাপী কাহিনী তাদের কাছে বিবৃত করতে লাগলাম।

আমার উৎসাহ দেখে মা বল্লেন, বাবা! তুমি বরাবরই বল এ কাজ তোমার ভাল লাগে না, তাই তোমাকে কিছু বলিনি কিন্তু তাঁর আগা-গোড়াই ইচ্ছে ছিল, তুমি বড় সওদাগর হও। তুমি যে চাকরী করবে কি উকীল হবে, তা তাঁর কখনও মত ছিল না।

পিতৃদেব চলে গেছেন। আমার দ্বারা কি তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না? পরদিন থেকে কায়মনোবাক্যে দোকানের কাজে নিজকে নিযুক্ত করলেম।

দোকানের কাজে আর একদিন হতেও আমার বেশ একটু উপকার হচ্ছিল। সেই যে পুরীতে দর্শন হয়েছিল, তার পর থেকে আমি এক মুহূর্ত্তের জন্তও সরোজকে ভুল্‌তে পারিনি। সারাদিন আমাকে চিন্তামগ্ন ভাবে বসে থাক্‌তে দেখে মা ইতিমধ্যে তু একদিন বলেছিলেন, খোকা! সারাদিন একাকী বসে বসে কি ভাবিস্? শেষে তোমার একটা ব্যারাম স্যারাম হয়ে না পড়ে। যাও, বন্ধুদের সাথে একটু আলাপ সালাপ করে এস না?

কিন্তু মসল্লার দোকানে প্রেম দেবতার নিতান্তই স্থানাভাব। সারা দিবসের কাজকর্ম্মের গোলমালে এবং হিসাব নিকাশ কেণা বেচার ভিতর সময়টা বেশ চলে যেতে লাগ্‌লো। বেশ বুঝ্‌তে লাগলাম, অকর্ম্মণ্য অবস্থার চেয়ে, এ অবস্থা অনেক ভাল, এতে প্রাণ আছে, সুখ আছে।

তবে কি সরোজকে ভুলে যাচ্ছিলেম? তাও কি সম্ভব? দিবসের কাজের অবসানে যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করতাম ও আহারান্তে শয্যার আশ্রয় নিতাম—তখন কোথা হতে তার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি হৃদয়াকাশে ফুটে উঠ্‌ত। তার কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়তাম।

শত চেষ্টা করেও তাকে ভুলতে পারছিলাম না। ভুলবার বুঝি তেমন ইচ্ছাও ছিল-না। তাকে শুধু দেখ্‌ব, এই আকাঙ্ক্ষাই সর্ব্বক্ষণ হৃদয় ভরে বিরাজ কচ্ছিল—কিন্তু সে যে আমার কখনো হবে, তা আমার মনে স্থানও পেত না। সে সুখে থাক, তাকে সুখী দেখে আমি সুখী হই—এইমাত্র আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই কি?

*　　*　　*　　*　　*

শনিবার তিনটার সময়ই দোকান হতে ফিরে এসেছি।

গৃহে এসে দেখলাম—নলিনীর পাঠকক্ষ হতে স্ত্রীলোকের কলহাস্যধ্বনি উত্থিত হচ্ছে—মাও সেখানে উপবিষ্টা।

পর্দ্দার আড়াল হতে আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে, নলিনী আনন্দোৎফুল্ল ভাবে বলে উঠ্‌লো, ঐতো দাদা এসেছে। দাদা, দাদা, এদিক পানে এস একবার, দেখে যাও কে এসেছে?

কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করে কাকে দেখ্‌লাম? কাকে? নলিনীর স্কন্ধে ঈষৎ ভর করে দাঁড়িয়ে—সরোজ। কেমন সুন্দর!

তাকে ইহার পূর্ব্বে ও পরে অনেকবার দেখেছি—কিন্তু তখনকার ন্যায় এমন সুন্দর কখনও দেখিনি। সব জিনিষেরই বুঝি এমন একটা মানান সই ভঙ্গিমা আছে, যে সে ভাবে তার সৌন্দর্য্য ও সৌষ্টব যেমন ফুটে ওঠে, এমন আর কোন অবস্থাতেই হয় না। যে ভাবে সে তখন দাঁড়িয়েছিল, অন্ততঃ আমার পক্ষে সে অবস্থাতেই তাকে সর্ব্বাপেক্ষা শোভনীয় বলে বোধ হচ্ছিল। সেই অতুলনীয় ছবিখানা, আজও আমার হৃদয়ে বিরাজ কচ্ছে।

আনন্দের আতিশয্যে আমার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হচ্ছিল। সরোজের প্রাণও বুঝি তেমনিই স্পন্দিত হচ্ছিল, তা না হলে তার নয়নদ্বয় অমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল কেন?

সে আমার সাথে নিঃশঙ্কোচে আলাপ করতে লাগ্‌লো। গোবিন্দ বাবুর কলকাতায় বিশেষ দরকারী কাজ ছিল, তাই হঠাৎ চলে আস্‌তে হয়েছিল, তজ্জন্য যদি কোনও দোষ হয়ে থাকে, ক্ষমা করতে বল্লে।

আমি তাকে ক্ষমা করব? তার সবই যে সুন্দর। তাকে অদেয় আমার কি ছিল, ক্ষমা তো' দূরের কথা।

অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হলো। লীলার কথাও উঠ্‌লো। বেলা পড়ে আস্‌তে তারা চলে গেল।

সে দিন আমার কি মহানন্দের দিন—কেমন করে ভাষায় ব্যক্ত করব? মনে হচ্ছিল, যেন এক বিরাট আনন্দজ্যোতিতে বিশাল কলকাতার ঘর বাড়ী রাজপথ লোকজন হাস্‌ছিল।

মাস দুই চলে গেল। সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে, স্বীয় কক্ষে বসে একখানা গ্রন্থের পাতা উল্‌টাচ্ছি, এমন সময় নলিনী হাস্‌তে হাস্‌তে গৃহে প্রবেশ করে বল্ল, দাদা! শুনেছে?

আমি ঔৎসক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম, কি ? কি খবর ?

সে কালবিলম্ব না করে উত্তর করলো, নীলমণি বাবুর স্ত্রী দুপুরবেলা আমাদের এখানে এসেছিলেন, তাদের ইচ্ছা তোমার সাথে সরোজের সম্বন্ধ করে। তোমার মত কি ? সরোজ আমাদের ঘরে আস্‌লে বড়ই চমৎকার হবে। দুজনাতে কত আনন্দেই না দিন কাটান যাবে।

এমন সুখ-সংবাদের জন্য আমি তো কখনও প্রস্তুত ছিলাম না। সরোজ আমার হবে—ভাব্‌তেও হৃদয় পুলকে নৃত্য করতে লাগ্‌লো। কতকক্ষণ আনন্দবিহ্বল ভাবে বসে রইলাম।

নলিনী জিজ্ঞাসা করলো, কি দাদা ! চুপ করে রইলে যে ?

কি উত্তর দিব ? শেষে বিষাদপ্লুতস্বরে বল্লাম, না নলিন্—আমি বিয়ে করব না।

সে আশ্চর্য্যন্বিত ও নিতান্ত ব্যথিত হয়ে বল্ল, দাদা ! আমরা তোমার মনের ভাব কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাল্লেম না। তুমি কি দাদা ! বিয়ে করবেই না ? সরোজ—সুন্দরী, কেমন মিষ্টি, সে আস্‌লে আমাদের কত না আনন্দ হতো ? মা কত সুখী হতেন ? দাদা ! তুমি কি এ জন্ম আর বিয়েই করবেই না ? একলা একলা এ বাড়ীর ভিতর কতদিন কাটাব দাদা ?

বল্‌তে বল্‌তে তার নয়নযুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠ্‌লো। স্নেহময়ী বোনটীর দিকে চেয়ে আমারও চক্ষুর জলে ভরে উঠ্‌লো।

সরলা, বুঝিতেছিলনা—আমার বিবাহের অন্তরায় কে ?

মা অনেক সাধ্যসাধনা কর্‌লেন, নলিনীর তো কথাই নেই। মাঝে হেম এসে কত না বলে গেল। নীলমণি বাবু ও তার স্ত্রী কত না অনুরোধ করলেন। আমার পক্ষে বিবাহ কি সম্ভবপর ?

নলিনী হৃদয়ঙ্গম করতে পারছিলনা কিন্তু মার বুঝতে বাকী রইলনা। তিনি আমাকে একদিন ডেকে নিয়ে বল্লেন, খোকা! তুই বাবা এমন হলি কেন? আমার সোণার সংসারতো ছারখারে গেছেই। এক তোর দিকেই চেয়ে আছি। নলিনীর তো এই অবস্থা। তারপর তুই ও যদি বিয়ে না করিস্, তা হলে আমি কেমন করে ঘরে থাক্‌ব, বাবা?

বল্‌তে বল্‌তে শোকবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এলো।

মা আবার বল্‌তে লাগ্‌লেন, বিয়ে না করার যা কারণ, তাতো সবই বুঝ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু কি করবে, বাবা। কপালের লেখা, তুমি আমি কেমন করে খণ্ডাব? আমারই যে কপাল ভেঙ্গেছে, এমন তো নয়। সংসারে এমন কত বাড়ীইতো রয়েছে, তাদের ছেলেরা কি বিয়ে করে না? তারা কি ঘর কন্না করে না?

মার আজ্ঞা আমি চিরকাল বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করে এসেছি কিন্তু এ আজ্ঞা অনুসরণ কর্‌তে পারলাম না। বুঝলাম, তাঁর প্রাণ ব্যাথায় ভেঙ্গে পড়ছে কিন্তু কি কর্‌ব—আমার পক্ষে বিবাহ অসম্ভব।

সরোজকে যে আমি আমার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে ছিলাম, সে বিষয়টী আমি কত গোপন করে রেখেছিলাম। এমন কি হেমকেও পর্য্যন্ত জান্‌তে দেই নি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মা তাও টের পেয়েছেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি তার কথাও ঈঙ্গিতে উল্লেখ করলেন—আমি লজ্জায় মরে গেলাম: বুঝলাম, সব বিষয়ই ইচ্ছা করলে গোপন করা যায় না।

নলিনী ও আমার বিবাহের অমতের কারণ অবগত হলো। সে আমার কাছে ধন্না দিয়ে পড়লো। তার জন্য আমি বিয়ে করব না—এই চিন্তা তাকে বড়ই ব্যাকুল করে তুল্ল। বারবারই সে বল্‌তে লাগ্‌লো, আমার সুখের জন্যই দাদা! তোমায় বিয়ে করতে বল্‌ছি। আমার

বৌ-দিদি ঘরে আস্‌বে—সে আর কেউ নয়, সৈ সরোজ—তাকে নিয়ে কত আমোদ আহ্লাদ করব—ভাব্‌তেও কত সুখ। পায়ে পড়ি দাদা! তুমি আমার এ সুখের অন্তরায় হ'ও না। বল্‌তে বল্‌তে সে কেঁদে ফেল্ল। কিন্তু আমি কাহারো অনুরোধ রাখ্‌তে পারলেম না,—কর্ত্তব্য-পথ আমার কাছে সহজ সরল বোধ হচ্ছিল।

সরোজের মাতা আরো কয়েকদিন সরোজকে নিয়ে আমাদের গৃহে বেড়াতে এলেন, স্বয়ং নীলমণি বাবুও এলেন। মাতাঠাকুরাণী ও তাহাদের ওখানে কয়েকদিন গেলেন। শেষে যাওয়া আসা বন্ধ হয়ে গেল। তখন হতে এক বিষাদের গুরুভার আমাদের সমস্ত বাটীর উপর যেন দ্বিগুণভাবে চেপে রইলো।

মাসেক পরে শুনলাম, সরোজের অন্যত্র বিবাহের প্রস্তাব চল্‌ছে—এক ব্যারিষ্টারের সঙ্গে কথা প্রায় ঠিক হয়েছে। কিন্তু নলিনী আমায় বল্লে, এখানে বোধ হয় হবেনা—সরোজের তেমন মত নেই। একমাত্র মেয়ে, তার মার ইচ্ছে নয়—তার অমতে বিয়ে দেয়। আমি ভাব্‌তে লাগলাম, অল্প-সল্প ইংরাজী পড়ে, বাঙ্গালী মেয়েগুলো কি হয়ে পড়লো। কিন্তু সংবাদ শ্রবণে মনে যেন ঈষৎ আনন্দই অনুভব কচ্ছিলাম।

কি করব? সরোজকে আমি পেয়ে ও পেলেম না। কয়জন লোক যা চায় তাই পায়? দুঃখ করে, হাহুতাশ করে কি লাভ?

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসেক পরে সংবাদ পেলেম ব্যারিষ্টার মিষ্টার বোসের সঙ্গেই তার বিবাহ স্থির হয়েছে। ফাল্গুনের শেষভাগে বিবাহ।

সংবাদ শ্রবণে প্রাণের ভিতর কেমন যেন কেঁদে উঠ্‌লো। হস্তস্থিত সুধাপাত্র অবহেলায় ফেলে দিয়ে কি আমি ভাল কর্‌লাম? এখনও কি তাকে পাবার উপায় আছে?

দোকান হতে সে দিন সকালেই ফিরে এলাম। কেন? কিছুই ভাল লাগ্‌ছিল না। একলা একলা রাস্তায় অনির্দ্দিষ্টভাবে ঘুরে বেড়ালাম।

ঘুরেই বেড়াচ্ছি, ঘুড়েই বেড়াচ্ছি। কেন?

সন্ধ্যার সময় দেখলাম আমি ব্যারিষ্টার বোসের লাউডেন ষ্ট্রীটের বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।

প্রাসাদ তুল্য বাড়ী—কক্ষে কক্ষে বিদ্যুতের আলো ফুটে উঠ্‌ছে। সে দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লাম। ভৃত্যদের মুখে শুন্‌লাম সাহেব হাইকোর্ট হতে এসে গাড়ী করে মিস ম্যাথুয়েনের সাথে বেড়াতে বেড়িয়ে গেছেন। রাত্রি এগারটার পূর্ব্বে ফিরবেন না। মিষ্টার বোস ধনী, বয়স বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ, ব্যারিষ্ট্যারিতেও বেশ পসার প্রতিপত্তি কিন্তু আমার অন্তঃস্থল হতে কে যেন বল্‌ছিল, সরোজের উপযুক্ত এ নয়।

সেখান হতে চলে এসে আবার ধীরে ধীরে নীলমণি বাবুর বাটীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। তখন রাত্রি প্রায় নয়টা। দ্বিতলকক্ষ হতে সঙ্গীত ধ্বনি আস্‌ছিল। কে গাইছে?—সরোজ। গাইবে না কেন? তার যে জীবন-বসন্ত সমাগত।

রমণী কি অপদার্থ! এই সে-দিন ভাবছিলাম সরোজ আমার জন্য আত্মহারা, আজ দেখ্‌ছি আমার ভ্রান্ত সংস্কার। সংসারে অর্থ প্রতিপত্তিই কি সব? হৃদয় কিছুই নয়? ধনী, প্রতিপত্তিশালী স্বামীর স্ত্রী-স্বরূপে সরোজ আপনার অবস্থায় কতই না আপনাকে গৌরবান্বিত মনে কর্‌ছে। করুক;—রমণীর ক্ষুদ্র হৃদয়; তার জন্যে কেন আমি এমনভাবে কেঁদে কেটে আকুল হচ্ছি? বোসের স্ত্রী হয়ে, সরোজ! তুমি কত লোকের প্রীতিও আনন্দের উৎস হবে; দাসদাসী তোমার সুখ বিধানের জন্য কত না চেষ্টিত হবে। কিন্তু তাতেই কি তুমি সুখী হবে? তাতেই কি তোমার প্রাণের ক্ষুধা মিট্‌বে? যাবে—কয়েক দিন মন্দ যাবে না। তার পর, ক্রীড়ার সামগ্রীর ন্যায় তুমি তুচ্ছ জ্ঞানে অবহেলিত হবে। আমি যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি, রাত্রি গভীরা হচ্ছে, তুমি কার প্রতীক্ষায় বসে আছ। সে তোমার সংবাদও নিচ্ছেনা। রজনীর শেষ প্রান্তে কে ঢুলু ঢুলু আরক্ত নয়নে এসে উপস্থিত হলো। তোমার স্বামী? কর এ হেন স্বামীর প্রীত্যর্থেই তোমার জীবন বিসর্জ্জন। জীবন,—এই কি জীবন?

হঠাৎ চিন্তা স্রোত রুদ্ধ হলো। মনে হলো—এ কি স্বার্থপরতা আমার? আমি তাকে গ্রহণ করব না, অথচ অন্যের করে ও তাকে দেখ্‌তে পাবনা। সে কি আমার অপেক্ষায় অবিবাহিত অবস্থায় সারাটী জীবন কর্ত্তন করে যাবে? করুক না—ক্ষতি কি? তা না হলে আমার জীবন যে বড়ই দুর্ব্বিষহ হয়ে পড়বে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছি—এমন সময় চেয়ে দেখলাম, কে দ্বিতল কক্ষের বারেন্দায় এসে দাঁড়ালো। সরোজ নয় কি? সরোজই বটে। আমার চক্ষু যে দীব্য শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। সেই অস্পষ্ট অর্দ্ধ অন্ধকারের ভিতর তার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমি পরিষ্কার দেখ্‌তে পাচ্ছি। সে

এসে একবার নীচের দিকে চাইলো, তারপর রাজ পথের অপর পার্শ্বে আলোক স্তম্ভের দিকে, যেখানে আমি দণ্ডায়মান ছিলাম, সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কল্ল। সে কি আমার দিকেই দৃষ্টি কচ্ছে? করবে না? আমার প্রাণ যে তাকে প্রবল বেগে আকর্ষণ কচ্ছিল। কতকটুক কাল তদবস্থায় দাঁড়িয়ে, সে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল, আমিও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে থেকে, শেষে হতাশপ্রাণে বাড়ী ফিরে এলাম। সত্যই ভালবাসা—ব্যাধি। জীবন নিতান্তই অসহনীয় বলে বোধ হতে লাগ্‌লো।

* * * * *

সরোজের বিবাহের দিন ক্রমে নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লো। আমাদেরও নিমন্ত্রণ পত্র এলো। ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ।

বিবাহের দিন প্রাতে মা বল্লেন, খোকা! সরোজের বিয়ে দেখ্‌তে যাবিনে?

আমি উত্তর কর্‌লাম, যাব বৈ কি, মা!

নলিনী দুঃখিতান্তকরণে বল্ল, কি যাব মা? যেতে পা সর্‌ছেনা। সরোজ তো আমাদেরই হতে পারতো। হলে—কি চমৎকারই না হতো। তার চক্ষুদ্বয় ছলছল করছিল।

সন্ধ্যার কিছু পরেই মা, নলিনী ও আমি গাড়ীতে করে ব্রহ্ম মন্দিরে যেয়ে উপস্থিত হলাম। সে দিন আমার হৃদয় থেকে বিষাদ-মেঘ সম্পূর্ণ কেটে গেছে। যদি সরোজই আমাকে না চায়, তা হলে আম্যর কেন তার জন্য এমন চিন্তা ভাবনা? একবার মনে হচ্ছিল, অসহায়া হিন্দু বালিকা, পিতামাতা যার হাতে সঁপে দিবেন, তাকেই তার গ্রহণ করতে হবে। তার আবার চাওয়া না চাওয়া কি? কিন্তু আবার তখনই মনে হচ্ছিল, হৃদয় রাজ্যের সঙ্গে এ সকলের কি সম্পর্ক? সে যদি আমাকে

পূর্ণ প্রাণের সহিত চাইতোই, তা হলে কি পিতামাতা, ভাই ভগ্নী, মান সম্ভ্রম, লজ্জা, সব ভুলে আমার হৃদয়ের ভিতর ছুটে আস্‌তে পারত না? সেখানে সে যে স্থান পেত, তার তুলনায় রাজ রাণীর স্বর্ণ সিংহাসনও যে তুচ্ছ! রমনী অপদার্থ—তার জন্য আবার চিন্তা ভাবনা কেন? এই তিন পয়সা মূল্যের খেলার সামগ্রীর অভাবে জীবনকে অসার মনে করা বাতুলতা নয় কি? সে যদি মদ্যপায়ী বোসের স্ত্রী স্বরূপে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করে তো করুক।

গাড়ীতে আমার ফূর্ত্তি দেখে, নলিনী যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হলো, বুঝিবা একটু দুঃখিত ও হয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্ম মন্দিরে পদার্পণ করতেই আমার সে আনন্দপ্রবাহ রুদ্ধ হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। সমাজের দ্বারে বিস্তর গাড়ী, অভ্যন্তর লোকে পরিপূর্ণ। শোভনবেশ, সুশ্রী, চট্‌পটে নব্য ব্যারিষ্টারের দলে কক্ষ পরিপূর্ণ। মা ও নলিনী রমণীদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বস্‌তে চলে গেল, আমি একটা বেঞ্চের এক কোণে যেয়ে বসে পড়্‌লাম।

রাত্রি আট ঘটীকার সময় বিবাহ। সাতটার কিছু পরেই ব্যারিষ্টার মিষ্টার বোস ফিটনে চড়ে এসে উপস্থিত হলো। সুশ্রী পরিচ্ছদ, অঙ্গুলিতে হীরকাঙ্গুরী জ্বলছে। হাসি, আনন্দ, সুখ যেন তার প্রত্যেক কথা হতে প্রতি গতিতে ঝড়ে পড়্‌ছে। বন্ধু বান্ধব অগ্রসর হয়ে, তাকে সানন্দচিত্তে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলো ও তিনি নির্দ্দিষ্ট আসনে যেয়ে উপবেশন কল্লেন। তার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল, সরোজের উপযুক্ত স্বামীই বটে। তা না হলে কি আর সে ভুলেছে? তার তুলনায় আমি? সূর্য্যের সম্মুখে খদ্যোত।

সমবেত লোক সকল কন্যা পক্ষের জন্য অপেক্ষা কচ্ছিল কিন্তু যখন আট্‌টাও বেজে গেল, অথচ সে পক্ষের লোক জনের আগমনের কোনও

সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন সকলেই চিন্তান্বিত হয়ে পড়লো। আরও আধ ঘণ্টা অতিবাহিত হলো। নীলমণি বাবুর গৃহে সংবাদ নেবার জন্য ইতি পূর্ব্বেই লোক প্রেরিত হয়েছিল। প্রায় নয়টা বাজে, এমন সময় বৃদ্ধ নীলমণি বাবু গাড়ী হতে হাঁপাইতে হাঁপাইতে নেমে এসে বল্লেন, তার মেয়ের জীবন সংশয়। হিষ্টিরিয়া হয়ে অজ্ঞানবস্থায় বিছানা হতে পড়ে কপাল কেটে গেছে, এখনও রক্ত পড়ছে, ফিট হচ্ছে, মহা চিন্তার বিষয়।

কথা শুনেই, বর পক্ষীয় একজন ব্যারিষ্টার তাড়স্বরে বলে উঠ্‌লেন, ট্রেচারি, ট্রেচারি, মিছে কথা, মিছে কথা।

তখন নানা গোলমাল আরম্ভ হলো। নানাজনে নানা কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। বোসের সঙ্গে বিবাহে নীলমণি বাবুর কন্যার তেমন মত নেই, কথাটা পূর্ব্বেই অনেকটা বের হয়ে পড়েছিল। সে বিষয় উল্লেখ করে বোসের পক্ষের একজন বল্লেন, পূর্ব্বেই আমরা এমন ভেবেছিলাম, জুয়োচুরি, জুয়োচুরি।

বৃদ্ধ নীলমণি বাবু কত বুঝাইতে চেষ্টা কল্লেন, তাকে কেও বিশ্বাস কল্লেনা। তাও তার অনুনয় বিনয়ে জন কতক তার বাড়ীতে তার মেয়েকে দেখ্‌তে গেল। তারা ফিরে এসে বল্ল, সত্যই সে পীড়িত কিন্তু তাও তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন কর্‌তে কারোও যেন প্রবৃত্তি দেখা গেল না।

সে রাত্রিতে বিবাহ অসম্ভব। নীলমণি বাবু আর একটা তারিখ ঠিক করতে বল্লেন। অনেক বাদানুবাদের পর, দেখা যাবে, দেখা যাবে—এর জন্য Heavy damage দিতে হবে বলে শাঁসাইতে শাঁসাইতে মিষ্টার বোস কম্পান্বিত কলেবরে দলবল সহ চলে গেলেন।

ক্রমে লোকজন সব অন্তর্হিত হলো। মন্দিরের আলো নির্ব্বাপিত হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। আমি বসে ভাব্‌ছি। সত্যই কি নীলমণি বাবু যা বলেছেন ঠিক? সরোজের এ আকস্মিক অজ্ঞানতার কারণ কি? না একটা ভাণ মাত্র? মন নানাপ্রকার সন্দেহ দোলায় দুলতে লাগ্‌লো, একটু আনন্দও বোধ হচ্ছিল। আবার যখন মনে হলো, সরোজের জীবন সংশয়, তখন ভয়ে প্রাণ দুর দুর করে উঠ্‌লো।

বসে বসে ভাব্‌ছি, এমন সময় মা পার্শ্বের দরজার সম্মুখ হতে ডাকলেন, কি খোকা বাড়ী যাবিনে?

গাত্রোত্থান কল্লাম। মা বল্লেন, কেমন একটা বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল। সে যা হোক, চল সরোজকে দেখে যাই। মার কথা মতই কাজ হলো।

আমরা নীলমণি বাবুর বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত হলেম। দেখ্‌লাম, লোকজন দৌড়াদৌড়ি কচ্ছে। ডাক্তার যাচ্ছে, আস্‌ছে। সত্যই সরোজের জীবন সঙ্কটাপন্ন। সরোজের কক্ষে প্রবেশ কল্লাম। দেখলাম, সে অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছে—তখনও কপালের ক্ষতস্থান হতে রক্ত পড়ছে। তাহার সে অবস্থা দেখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। সরোজ কি বাঁচবে না?

অনেক ক্ষণ বসে রইলাম। একবার সরোজ চক্ষু মেলিল, দেখ্‌লাম সে আমার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে রয়েছে—ধীর, স্থির, পলকবিহীন। শত চেষ্টা করেও তার দিক হতে নয়ন ফিরাতে পারলাম না। কি সুন্দর!

কতকক্ষণ পরে, সে আবার অজ্ঞান হলো। পুনঃ জ্ঞানসঞ্চার হলো। রক্তধারা ক্রমে বন্ধ হয়ে আস্‌তে লাগলো। ধীরে ধীরে তাহার পূর্ণ জ্ঞানসঞ্চার হতে লাগ্‌লো। আর কোনও প্রকার ভয় নেই দেখে, আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম। তখন রাত্রি প্রায় দুটো।

কিছুই বুঝিতে ছিলাম না। সরোজের এমন অকস্মাৎ অজ্ঞানতার কি কারণ? বিবাহে অনিচ্ছা? আমার প্রতি ভালবাসা? হৃদয় আনন্দে নৃত্য করে উঠ্‌লো।

আরও কয়েকদিন চলে গেল। সরোজ এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য-লাভ করেছে। কিন্তু মিষ্টার বোসের সঙ্গে বিবাহ প্রস্তাব ভেঙ্গে যাবার উপক্রম হলো। সেই বিবাহ রজনীর ব্যাপারে তিনি আপনাকে নিতান্তই অপমানিত মনে করেছেন। নালিসেরও নাকি প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু ব্যাপার ততটা শেষ পর্য্যন্ত গড়ালো না।

ইতিমধ্যে হেম একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত। সে আসবামাত্রই আমাকে আবার বিবাহের জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লো। কথা প্রসঙ্গে বল্লো—সরোজের এ সব ব্যারামের মূল কারণই তো তুমি। এখন তাকে বাঁচাও, অন্ততঃ একটা স্ত্রীলোকের জীবনের দিকে চেয়ে তোমার প্রতিজ্ঞা পরিহার কর।

আমি বল্লাম, বল কি? সরোজের ব্যারাম, তা আমি করব কি? আর এসব হিষ্টিরিয়া, কিছুই নয়। তুমি কার ভূত কার ঘাড়ে চাপাচ্ছ। আমাকে ভাই! বিয়ে করতে অনুরোধ করো না।

হেম বল্ল—বুড়ো নীলমণি বাবুর দশা দেখে বড় কষ্ট হচ্ছে। এত টাকা পয়সা, সংসারে একটী মাত্র ছেলে ও একটী কন্যা। ছেলেটীও তেমন সুবিধার হলো না। কন্যাটীরও এ অবস্থা! তোমার এ ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার কি এমন কারণ হলো—শেষে কিন্তু অনুতাপ করবে।

কয়েকদিন পরে বিফলমনোরথ হয়ে সে ক্ষুণ্ণমনে স্বস্থানে চলে গেল। শেষে জানলাম, নীলমণি বাবুই তাকে অনুরোধ করে এনেছিলেন। দুষ্টু, আমাকে এ সব সে কিছুই জানায় নি।

* * * * * *

মাসেক কাল চলে গেল, ভাল না মন্দ ভাবে ঠিক বল্‌তে পারব না।

আমি দোকানের কাজে এখন খুব মন দিয়েছি—বৃদ্ধ মথুরামোহন ইহাতে নিতান্ত সন্তুষ্ট।

কিন্তু আমি যে কেন এত কর্ত্তব্যজ্ঞানী হয়ে উঠ্‌লাম, তাতো সে জানে না। যে দুঃখ, যে বেদনা সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয় মথিত কচ্ছিল, সংসারের তার সঙ্গে তো কোনও সম্পর্ক নেই। আমার আকণ্ঠ-ভরা পিপাসা, সম্মুখে সুবিমল সরোবর—কিন্তু তৃষ্ণা-নিবারণের উপায় নেই। আমি কাজের ভিতর ডুবে থেকে, সব ভুল্‌তে চেষ্টা কচ্ছিলেম। হায়! এত সুন্দর সরোজ, এত মধুর সরোজ, এমন আমার মনের মতন—আমার হলো না! কেন তার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল?

একদিন বিষম সংবাদ পেলাম, সরোজের বড় জ্বর। সে তার মার সাথে তাদের মামাবাড়ী পলাশতলা গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখান হতে যে ম্যালেরিয়া জ্বর নিয়ে এসেছে তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্লীহাও নাকি দেখা দিয়েছে, অবস্থা ভাল নয়।

এর দিন পনর পরে, একদিন নলিনী আমায় বল্ল, দাদা! শুনেছ, সরোজের নাকি অবস্থা বড়ই খারাপ। মামা বাবু আজ প্রাতে এসে বলে গেলেন।

আরও দুদিন অতিবাহিত হলো। আজ এ কি শুনলাম—সরোজের নাকি বাঁচবার আশা নেই—অবস্থা নাকি অতি সঙ্কটাপন্ন।

অন্য হলে কি করত বলতে পারি না কিন্তু যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি একদিন তাকে প্রত্যাখ্যাত করতে আমায় প্রধাবিত করেছিল, তাহাই যেন আমাকে আজ বল্ল, যাও দেখে এসো।

একখানা গাড়ী করে, তাদের বীডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যেয়ে উপস্থিত হলেম। তখন সন্ধ্যা আগত প্রায়।

বাটী লোকজনে পরিপূর্ণ। বৈঠকখানায় মামা বাঁবু ও আরো তিন চারিজন ডাক্তার উপবিষ্ট। সকলেরই বদন চিন্তাব্যঞ্জক—বুঝতে বাকী রইল না পীড়া বিষম আকার ধারণ করেছে। আমাকে দেখে নীলমণি বাবু বল্লেন,—সুরেশ, এসেছ, বসো।

আমি জিজ্ঞাসা কল্লাম, এখন কেমন ?

তিনি বিষাদ-ব্যঞ্জকস্বরে বল্‌তে লাগ্‌লেন, না না, ভাল নয়। জ্বর ১০৬ ডিক্রী, ডিলিরিয়ামের ভাব। কি কুক্ষণেই ওদের মামাবাড়ী গিয়েছিল—আমি তখনই মানা করেছিলাম—ভয়ানক ম্যালেরিয়ার দেশ। দেখবে, এসো—এই বলে তিনি আমাকে তার অনুসরণ করতে বল্লেন।

দ্বিতলের উপর সুবৃহৎ কক্ষ। সেখানে শয্যোপরি সরোজ শায়িতা। তার কৃশ দেহখানা যেন শুভ্র বিছানার সাথে মিশে গেছে। সেই সুন্দর, লাবণ্যময় মুখখানি এতদিনের পীড়ার প্রকোপে শুকিয়ে গেছে—কিন্তু তথাপি কত মধুর !

আমরা যখন গৃহে প্রবেশ কল্লাম, তখন সে তন্দ্রাভিভূত ছিল। কতকটুক পরে নয়ন মেলিল—জবাফুলের ন্যায় রক্তবর্ণ। কি যেন কি ভেবে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো—আবার ধীরে ধীরে চোখের পাতা আপনা হতেই মিলিয়ে গেল। আবার একটু পরে নয়ন উন্মীলিত হলো, আবার আমার দিকে কতকক্ষণ চেয়ে বুজে গেল।

নীলমণি বাবু নীচে চলে গেলেন। শয্যার পার্শ্বে সরোজের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাও তাহার হতভাগিনী মাতা উপবিষ্টা।

আমাকে উদ্দেশ করে তিনি বল্লেন, সারাদিনই যা-তা প্রলাপ বক্‌ছে। কেমন যেন কি হলো—কিছুই বুঝতে পেলাম না। কোন চিকিৎসাতেই

ফল হলো না। সেই বিয়েতো করবেই—কিন্তু আমার কপালেই হলো না—যাক্। এই বলে অঞ্চল দ্বারা উচ্ছসিত চক্ষের জল মুছলেন।

এমন সময় সরোজ ধীরে ধীরে বল্‌তে লাগ্‌লো, মা! মন্দির দেখ্‌তে চলো। ঐ যে সুরেশ বাবু এসেছে, দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় আধঘণ্টা চলে গেল, অনেকবার নানাবিধ প্রলাপ বলে একবার সে বলে উঠ্‌লো,—নলিন্, নলিন্,—যা না তোর দাদাকে বল্‌না যেয়ে, এত রাত্রি বসে থাক্‌লে কি বৌর মন পাওয়া যায়?

অনেকক্ষণ নীরব থেকে বীণা যেন ধীরে ধীরে আপনা হতেই বেজে উঠে বল্ল, চাই না, জীবনের সাধ যদি না মিটে তবে মরাই ভাল। স্পষ্টই দেখ্‌লাম, সরোজ মরতেই বসেছে। মানিনী অভিমানে আত্মঘাতিনী হতে কৃতসঙ্কল্পা হয়েছে। যতক্ষণ জ্ঞান ছিল, ততক্ষণ সব কথা চাপা ছিল, এখন তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে মনের তন্ত্রীসমূহ যেন এলোমেলো ভাবে নানারূপে স্পন্দিত হচ্ছিল।

আমি সম্মুখে যেয়ে কপালে হাত দিলাম। উঃ। কি গরম! শেষে শয্যাপার্শ্বে বসে কপালে ধীরে জল দিতে লাগ্‌লাম।

কতকটুক পরে সে একবার চোখ মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। কি কাতরতা-ভরা, কি যন্ত্রণামাখা সে চাহনি। ধীরে ধীরে বল্ল, জল। আমি পার্শ্বস্থিত গ্লাস হতে জল নিয়ে মুখে দিলাম। পান করে আমার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে চেয়ে রইল—অনেকক্ষণ। সে কি মনে মনে আমায় কিছু বল্‌ছিল? আমার চোখ ফেটে ধীরে ধীরে জল নির্গত হচ্ছিল।

ক্রমে রাত্রি বৃদ্ধি হতে লাগ্‌লো—তার অবস্থাও খারাপ হতে লাগ্‌লো। শেষে তার তৃষিত নয়ন আমার দিকে আর একবার চেয়ে বুজে গেল!

আত্মীয়-স্বজন তাকে নিয়ে বাইরে এলো এবং বিষম কান্নাকাটি করতে লাগ্‌ল।

কেমন করে কি অবস্থায়, কি ভাবে রজনীর শেষভাগে একাকী ফিরে এলাম—ভাল করে তেমন কিছুই মনে নেই। কেবল মনে পড়ে—সরোজের শেষ চাহনটী।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর, মাস কয়েকের ঘটনা আমার ভাল করে মনে নাই। এ সময় আমি নিজে জ্বররোগে বিশেষ পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। বোধ হয়, আহার ও চলাফেরার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়েছিল। মাঝে মাঝে এমন দিনও গিয়েছে যখন আমার অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটজনক হয়ে পড়েছে।

যা হোক, মরতে মরতে বেঁচে গেলাম। শরীর তখনও নিতান্ত দুর্ব্বল, বিনা যষ্টির সাহায্যে হাট্‌তে পর্য্যন্ত কষ্ট হয়। তখন আর কোনও কাজ নেই। দোকানে যাওয়া কি সে সম্বন্ধে গোমস্তা বা কর্ম্মচারীদের সাথে কোনও প্রকার বুদ্ধি পরামর্শ করা—সে তো একেবারেই অসম্ভব।

কিছুই ভাল লাগছিল না। সকল সময়ই একমাত্র চিন্তা—সরোজ।

জীবনটা যে নিতান্তই দুর্ব্বিষহ—তাহাই অনুক্ষণ উপলব্ধি কচ্ছিলাম।

জ্বর সারিল—কিন্তু মানসিক অশান্তিবশতঃ স্বাস্থ্যের কোনও উন্নতি হচ্ছিল না। ক্রমে ক্রমে আমি চিররোগীতে পরিণত হতে চল্লাম।

দেখতে দেখ্‌তে শীতকালের অবসান হলো। বসন্তকাল এসে দেখা দিল। ধূমাচ্ছন্ন আকাশের নীচে বৃক্ষলতা-বিহঙ্গ-বিরল কলকাতাতে

বসন্ত কখন আসে, কখন চলে যায়, তার কেহ সংবাদও রাখে না। মামা বাবু পূর্ব্বে বারংবার বলেছিলেন, শীতাবসানের পর হতেই আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখা যাবে কিন্তু যখন ফাল্গুনমাস শেষ হয়ে চৈত্রমাসও যায় যায় হয়ে দাঁড়াল, অথচ আমার অবস্থা পূর্ব্ববৎই রয়ে গেল, তখন তিনি আমায় বল্লেন, সুরেশ, তোমার কোনও ভাল জায়গায় যাওয়া দরকার, তা না হলে শীগ্‌গির আরোগ্য লাভ করতে পারবে না।

উপদেশটী বাটীর সকলেরই সমীচীন বলে মনে হলো কিন্তু এ সময় কোথায় বা বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাই? বন্ধুবান্ধবেরা নানা জনে নানা কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন, কেহ বৈদ্যনাথ, কেহ দেওঘর, কেহ হাজারিবাগ বা এটোয়া যেতে উপদেশ দিলেন। মামা বাবুর মতের সঙ্গে কারো মিল হলো না। এ গরমের দিনে—ও সব জায়গা ভয়ঙ্কর গরম—তিনি ঈদৃশমতই প্রকাশ করতে লাগ্‌লেন।

শেষে তিনি আমায় লক্ষ্য করে বল্লেন, সুরেশ! তোমাদের বাড়ী তো পূর্ব্ববঙ্গে, সেখানেই যাও না? এখন সে সকল জায়গার তেমন গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়। আমার মতে সেখানে যাওয়াই উচিত। তাঁর মতই সকলে শিরোধার্য্য করে নিলেন—তাঁর উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস। মাতো তাঁকে প্রত্যক্ষ ধ্বন্বন্তরি বলেই জান্‌তেন। বাটীতে গোমস্তা কৃষ্ণকিশোরকে ঘরবাড়ী মেরামৎ করবার জন্য পত্র লিখা হলো। এদিকে যাবার জন্য সব বন্দোবস্ত হতে লাগ্‌লো।

* * * * * *

রওয়ানা হওয়ার তারিখ নিকটবর্ত্তী হতে লাগ্‌লো। এতদিন পরে, এই প্রথম স্বদেশ যাব নলিনী এই আশায় আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। আমাদের মালতী গ্রামখানি কেমন, সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী কি

প্রকার, সে দেশের লোকজনের কথাবার্ত্তা ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পারব কিনা ইত্যাদি নানা প্রশ্নে সে আমায় ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে লাগ্‌লো। মালতী সম্বন্ধে আমার ও অভিজ্ঞতা অল্প, যতদূর সম্ভব উত্তর দিতে লাগ্‌লাম।

কিন্তু সে আমার নিকট যা চাচ্ছিল, তা না পেয়ে যেন বিশেষ সুখী হতে পারলোনা। তার বিশ্বাস, উৎসাহ ও আনন্দে আমি তারই ন্যায় মেতে উঠ্‌বো। আমার কাছ থেকে এসকল আশা করা তার ভুল। একে শরীর অসুস্থ ও দুর্ব্বল, মনের ও শান্তিময় ভাব নয়—কথায় বা ব্যবহারে তাকে সুখী কর্‌তে পারবো কেন?

আমাদের যাবার দিন নিতান্তই নিকটবর্ত্তী হয়ে এলো।

আর দুদিন মাত্র বাকী। রাত্রি অধিক হয়নি। মার উপদেশ মত নলিনী বাড়ী যাবার জন্য জিনীষ পত্রাদি গোছাচ্ছে। আমিও মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করছি; এমন সময়, এ কি? আমার আবার কি হলো? দাঁড়িয়ে ছিলাম—মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম, তারপর কি হলো—আমার মনে নেই।

* * * * * *

যখন জ্ঞান হলো, দেখলাম আমি বিছানায় শুয়ে আছি। মা ধীরে ধীরে বাতাস দিচ্ছেন, নলিনী এক পার্শ্বে উপবিষ্টা, হেম আমার পায় কাছে। মামা বাবুও অন্য একজন ডাক্তার সম্মুখে চেয়ারে উপবিষ্ট। একবার মার দিকে উর্দ্ধনেত্রে চাইলাম, দেখলাম তাঁর স্নেহভরা নয়নদ্বয় বাষ্পাপ্লুত।

বুঝ্‌লাম, আমি আবার পীড়িত হয়ে পড়েছি।

কতকটুক কাল এভাবে গেল। আবার আমি সংজ্ঞা হারালেম

মাঝে মাঝে জ্ঞান হতে লাগ্‌লো, আবার অজ্ঞানতা এসে আমায় আক্রমণ কর্‌তে লাগ্‌লো।

পুনরায় ধীরে ধীরে আমি আরোগ্য লাভ কর্‌তে লাগলাম। বসন্তকাল অতীত হলো। ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা ঋতুদ্বয় ও সময় রূপ স্রোতের মুখে স্ব স্ব অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে বিশাল কালসাগরে মিশে যাবার উপক্রম হলো।

আমি রুগ্ন অবস্থায় পড়ে রইলাম। এমন অবস্থায় জীবন কর্ত্তন আমার পক্ষে দুষ্কর হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। শরীর নিতান্ত দুর্ব্বল, মুখে রুচি নাই, মন অবসন্ন আশাশূন্য।

বড়ই অনুতাপ হতে লাগ্‌লো। এই অল্প বয়সে যৌবনের প্রারম্ভে এমন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ে থাকবো তাতো কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।

কর্ত্তা না থাক্‌লে, শুধু কর্ম্মচারীদের দ্বারা ব্যবসা বাণিজ্য কবে ভাল চলে? দোকানের অবস্থা দিন দিনই খারাপ হতে লাগ্‌লো, আয়ের পরিমাণ ও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস প্রাপ্ত হতে লাগ্‌লো।

ইহার ভিতর আর এক বিপদ এসে আমাদের উপর পড়লো। বৃদ্ধ গোমস্তা মথুরামোহন, যে এতদিন আমাদের কারবারের রক্ষণাবেক্ষণ কচ্ছিল, হঠাৎ জ্বর হয়ে মারা গেল। আমরা চারিদিক আঁধার দেখ্‌তে লাগলাম।

ব্যবসায়টী নষ্ট হতে চল্লো। শয্যায় পড়ে আমি দেখ্‌তে লাগলাম আমাদের সুখ শান্তির দিন শেষ হয়ে আস্‌ছে।

হায়! কেন পুরী গিয়েছিলাম, কেন তার সাথে দেখা হলো, কেনই বা অকস্মাৎ পীড়িত হয়ে পড়লাম। অনুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ হতে লাগ্‌লো। আমার দোষই বা কি? সরোজকে কি ইচ্ছা করে ভালবেসেছিলাম? ইচ্ছা কল্লেই কি না ভালবেসে পাড়তাম? আকাশে

যে দিন পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয়, সেদিন ইচ্ছা কল্লেই কি তরঙ্গিনী আনন্দে উতলা না হয়ে থাক্‌তে পারে? বসন্ত দেখা দিলে ফুল ফোটে, মলয় পবন বইতে থাকে, কোকিল পঞ্চমে গায়, সাধ্য কি প্রকৃতি অন্য ভাবে চলে?

আর সরোজকে ভাল না বেসেই বা কি লাভ ছিল? জীবনের যে অংশটুকু সেই অপ্সরার রক্ত-পাদ-স্পর্শে রঞ্জিত হয়ে রয়েছে, সেটুকু বাদ দিলে যে জীবনের কিছুই থাকেনা? তাকে পেয়েছিলাম, তাই তো বুঝেছি, জীবন কি সুন্দর, উপভোগ্য!

অবশেষে শরীর একটু ভাল হলো। মাকে অনেক বলে কয়ে দোকানে গেলাম। অনেকদিন পরে বাইরে এসে সবই নূতন নূতন ঠেক্‌তে লাগ্‌লো। যে অনেকদিন পীড়িতাবস্থায় গৃহাবদ্ধ হয়ে কখনো পড়ে ছিল, সেই বুঝ্‌বে আমি সে দিন কি আনন্দ উপভোগ কচ্ছিলাম। আলো ও বাতাস যে এত আনন্দ-ভরা এবং নীলাকাশ যে এমন সুন্দর তাহা পূর্ব্বে কখনও বুঝি নি। লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, জিনীষ পত্র, জীবনের ছোট-খাটো সব কার্য্যাবলী আমার চক্ষে নূতন সৌন্দর্য্য গরিমায় ভূষিত হয়ে উঠ্‌ছিল।

সপ্তাহ খানেক বেশ চলে গেল। তারপর আবার জ্বর দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘোরার ভাব ও এসে উপস্থিত হলো। আমি আবার পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

বুঝলাম ডুব্‌তে বসেছি। আমি স্রোতের মুখে তৃণের ন্যায় ভেসে চল্লাম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার চক্ষের সম্মুখে আমাদের দোকান, পিতৃদেবের অতিকষ্টে স্থাপিত কীর্ত্তি, উঠে গেল। বড় বাজারে যে পাঁচ খানা পাকা বাড়ী ছিল, বিক্রয় হয়ে গেল, গাড়ী ঘোড়া অন্তর্হিত হলো।

তখনও আমি রুগ্ন শয্যায় পড়ে। নিজে যে কষ্টে পতিত হতে চল্লেম, তার জন্য তত দুঃখ নয়, যত দুঃখ মার জন্য। তিনি তো এ জীবনে কখনও কষ্টের মুখ দেখন নি। তাঁর কথা ভাব্‌তে, হৃদয় শোক ও অনুতাপে বিক্ষোভিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

অথচ তাঁর মুখে আমাদের বিপদ ও অবস্থা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটী দুঃখসূচক কথাও শুন্‌তে পেতাম না। সর্ব্বদাই তাঁর ভয়, পাছে তা হলে আমি চিন্তান্বিত হয়ে পড়ি এবং তজ্জন্য আমার পীড়া কোনও প্রকারে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বেরই ন্যায়, তিনি ধৈর্য্যময়ী, আমার সম্মুখে তেমনি প্রীতি-প্রফুল্লা। মার স্নেহের কথা কি বল্‌বো? আমার মার তুলনা জগতে নেই।

এতদিন তাঁর স্নেহেরই পরিচয় পেয়ে এসেছি, কিন্তু এই বিপদের দিনে দেখলাম, তিনি শুধু তাহাই নন, মহাপ্রজ্ঞাময়ী ও বটেন। দোকান উঠে গেল, বাড়ীগুলি বিক্রয় হয়ে গেল, দাস দাসী চলে গেল। এত যে কাণ্ড কারখানা হয়ে গেল, তার বিষয় তিনি আমায় কিছু জানালেন না। আমি এসব জানলাম, অন্যের মুখে।

পূর্ব্বেরই ন্যায় বাটীর সব কাজ কর্ম্ম চল্‌তে লাগ্‌লো। পূর্ব্বেরই ন্যায় প্রতি সন্ধ্যায় নলিনী এসে আমার কক্ষে হারমোনিয়াম ও বেহালা সংযোগে গান গাইতো। মাঝে মাঝে মামা বাবু ও দুই একদিন আস্‌তেন, জ্যাঠামহাশয় দেখে যেতেন, এবং মাষ্টার মশায় ও দেখা দিতেন। সময় বিশেষে হাসির লহরীতে কক্ষ তরঙ্গিত হতো। সবই যেন পূর্ব্বের ন্যায় চল্‌তে লাগ্‌লো।

কিন্তু তথাপি বুঝতাম, বাঁশী কোনও প্রকারে একটু ভাঙ্গলে যেমন শত চেষ্টায়ও পূর্ব্বের সুমিষ্ট স্বর আর নির্গত হয় না, সেই প্রকার আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ও প্রায়ই বেসুর বাজতে লাগ্‌লো।

হায়! আমি কি আরোগ্য লাভ করবই না? ভগবান! তুমি কি আছ? একবার আমার দিকে চাও, শক্তি ফিরিয়ে দেও। যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে, এখন বেশ বুঝতে পারছি স্বাস্থ্যই সমস্ত সুখের মূল। মা ও ভগ্নীর কষ্ট যে আর দেখ্‌তে পারি না। আমাকে মানুষ হবার আর একবার সুযোগ দাও।

রুগ্ন শয্যায় পড়ে—আমি দিনের পর দিন যাতনায় ছট্‌ফট্ করতে লাগ্‌লাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কলকাতার জীবন অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল। আমাদের সকলের মনেই সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে উঠ্‌ছিল যে সেখানে থাক্‌লে আমি আর স্বাস্থ্য লাভ করে উঠ্‌তে পারব না। মামা বাবু ও কয়েক মাসের জন্য স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

তাঁর উপদেশমতই কার্য্য হতে চল্ল। কিন্তু এতদিন কখনও যে সমস্যা উপস্থিত হয়নি, এক্ষণে সেই অর্থ সমস্যাই আমাদিগকে বিচলিত করতে লাগ্‌লো।

আমি অধিক ব্যয় করে অন্যত্র যাতায়াতের অনিচ্ছুক কিন্তু মা বারংবারই আমার দিকে অশ্রুপ্লুত চক্ষে বল্‌তে লাগলেন, বাবা! তোমাদের জন্যই যা কিছু টাকা পয়সা। পুরুষ মানুষ, বেঁচে থাক্‌লে আবার কতটাকা রোজগার করবে। মানুষের জন্য টাকা, না টাকার জন্য মানুষ?

তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ হলো। আমরা প্রথমত বৈদ্যনাথে গেলাম। সেখানে মাস কয়েক আছি, এমন সময় হেম এসে উপস্থিত। সে মাকে তার ওখানে নেবার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করতে লাগলো।

তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল না। বিশেষত বৈদ্যনাথে প্রথম প্রথম আমার স্বাস্থ্যের যেমন উন্নতি দেখা গিয়েছিল, শেষটা আর তেমন হচ্ছিল না। হেম ও বড়ই আগ্রহ দেখাতে লাগ্‌লো।

মাকে সে বারংবারই বল্‌তে লাগলো, আমি যে কেমন আছি, তা একবার দেখ্‌তে হবে। তুমি এক ছেলের চিন্তাতেই অস্থির, আমি যে মা! কি ভাবে জীবন কাটাচ্ছি, তা কি দেখাতে আমার ইচ্ছা করে না? আর স্বাস্থ্যের হিসাবে ও গৌহাটী তেমন মন্দ হবে না।

হেমের আর্থিক অবস্থার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হয়েছে। সে এক্ষণ একজন বড় কণ্ট্রাক্টার, কতকগুলি চা বাগানের অংশ কিনেছে, নিজের তত্ত্বাবধানেও একটি স্থাপনের চেষ্টা কচ্ছে। হবেনা কেন, এমন সাহসী উদ্যোগী পুরুষ কবে না খেয়ে মারা যায়?

নলিনার মত জিজ্ঞাসা করলাম। সে যেন কেমন অনিচ্ছা প্রকাশ করতে লাগ্‌লো।

বাল্যাবধি দেখ্‌ছি—কিন্তু তাও সব সময় তাকে ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। স্বভাবত নিতান্তই সরলা কিন্তু সময় বিশেষে কি এক অস্পষ্টতা ও জটিলতার আবরণে নিজকে ঢেকে রাখে যে তখন আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে।

হেমের প্রতি তার মনোগত ভাবটী যে কি, তা যেন কিছুতেই সঠিক অনুধাবন করে উঠ্‌তে পারছিলামনা। বিবাহের পূর্ব্বে দেখলাম, সে বিবাহে অসম্মতা। একটু পরেই দেখ্‌লাম, মেঘ কেটে

গেছে, আনন্দের স্পন্দনে সে টল টল কচ্ছে। তার পর শেখরনাথ মারা গেল। আঁধার কালিমায় তার বদন আবৃত হলো। পুরীতে আবার যখন হেমের সাথে দেখা হলো, তখন যেন মনে হলো, বালিকার প্রাণ পূর্ব্বের ন্যায় তার বাল্যবন্ধুর দিকেই নুয়ে পড়ছে। শেষে হেম চলে গেল, কলকাতায় এসে পীড়িত হয়ে পড়লাম, আমাদের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হলো, দোকান উঠে গেল, সংসারে নানারূপ পরিবর্ত্তন হলো, কিন্তু ইহার ভিতর মুখে এমন একটী কথা শুনালাম না, যা হতে মনে হতে পারে হেমের কথা তার কোনও প্রকার চিন্তা ভাবনার বিষয়। বরঞ্চ হেম যাওয়ার পর হতে দেখলাম, সে লেখা পড়ায় অধিকতর মনোনিবেশ করলো এবং তাতে ডুবে রইলো। আমরা দেখ্‌লাম সে পাঠে ও সংসারিক কাজ কর্ম্মে লিপ্ত থেকে স্বীয় বৈধব্যদশা ভুলবার চেষ্টা কচ্ছে।

পুরীতে তার যে অবস্থা দেখেছিলাম, তা হতে আমি মনে করেছিলাম যে হেমের ওখানে যাবার প্রস্তাবে সে আনন্দিত হবে। কাজে দেখ্‌লাম বিপরীত। সত্যই তা হলে আমি তার পুরীর ব্যবহার ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পারিনি? বাল্যকালাবধি হেম আমাদের বাটীর সহিত ওত প্রোতভাবে জড়িত। তার কাছে নলিনী সহজ সবলভাবে যে সকল কথাবার্ত্তা বলেছে তাহাই আমার ভ্রান্তনয়নে অন্যভাবে প্রকটিত হয়েছে। আমারই ভুল; সত্যই রমণী চরিত্র দুর্জ্ঞেয়।

যা হোক, অবশেষে গৌহাটী যাওয়াই ঠিক হলো। হেম আমাদের জন্য বাড়ীঘর বন্দোবস্ত করবার জন্য কয়েকদিন পূর্ব্বেই চলে গেল।

দিন কয়েকের মধ্যেই আমরা সেখানে যেয়ে উপস্থিত হলেম। সুবিখ্যাত কামেখ্যা পাহাড় হতে কিয়দ্দূরে অবস্থিত সহরটী দেখ্‌তে বেশ

সুন্দর। সম্মুখে সচ্ছসলিল ব্রহ্মপুত্র নদ বয়ে যাচ্ছে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পশ্চিমের সেই শস্যশূন্য ধূসর মাঠের পরিবর্ত্তে এই বৃক্ষলতা বহুল শ্যামলপ্রান্তরখচিত গিরিনদীশোভিত স্থানটী বড়ই নবীন ও হৃদয়ানন্দদায়ক বোধ হচ্ছিল।

হেম তার বাটীর কাছেই আমাদের জন্য একটী বাটী ঠিক করে রেখেছিল। বাঙলো ধরণের বাটীটি, সুন্দর,—সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্পোদ্যান।

প্রাতে ও দ্বিপ্রহরে সে কাজে ব্যস্ত থাক্‌তো। বৈকালে আমরা সকলে মিলে গাড়ী চড়ে বেড়াতে বের হতাম।

এতদিন পরে, হেমের সঙ্গ-লাভের আশায় আমার শরীরের অর্দ্ধেক গ্লানি যেন আপনা হতেই উপশম হলো। ক্রমে ক্রমেই শরীরটা ভাল বোধ করতে লাগলাম।

হেম উৎসাহের অবতার। প্রথম প্রথম কণ্ট্রাক্টারী করতে এসে তাকে কত লোকের ঠাট্টা বিদ্রূপ তাচ্ছিল্যও অবজ্ঞাই না সহ্য করতে হয়েছে। আমিও সময় বিশেষে তার জন্য চিন্তিত হয়েছি কিন্তু দেখ্‌লাম আমাদের সকলেরই ভ্রান্ত সংস্কার। যে দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তির বলে দরিদ্রের সন্তান হয়েও সে নানা কষ্টের ভিতর নানাস্থানে প্রাইভেট টিউসেন করে, এমন কি মাঝে মাঝে একবেলা আহার না করেও, প্রেসিডেন্সী কলেজে আপনার শিক্ষার বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, সেই শক্তির সাহায্যে এই অত্যল্প কাল মধ্যে এই সুদূর আসাম প্রদেশেও সে প্রতিপত্তি স্থাপন করে নিয়েছে। এইতো মানুষ। আমি কোথায় শুধু কবিতার গাঁথুনি নিয়ে স্বপ্ন রাজ্যের মোহের ভিতর ঘুড়ে বেড়াচ্ছি এবং শেষে পৈতৃক বিষয় আশয় নিঃশেষ করে জীবন অসহনীয় মনে কচ্ছি। আমার মত অপদার্থ কে?

এখন হতে আমার কাজ হলো, প্রতে ও বৈকালে নলিনীকে নিয়ে গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে বের হয়ে যাওয়া এবং রাত্রিতে ইজিচেয়ারে শায়িত অবস্থায় হেমের সাথে তার ব্যবসায় ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে নানাবিধ গল্প-গুজব করা। ইহা ব্যতীত নলিনী মাঝে মাঝে গান গাইতো।

এবার যেন সত্য সত্যই আমি দ্রুতবেগে আরোগ্য-লাভ করতে লাগলাম।

*   *   *   *   *   *   *

কয়েকদিন হলো হেমের জনৈক বন্ধু রসিক বাবুর মুখে একটী কথা শুনেছি। ভাবছি হেমকে জিজ্ঞাসা করবো—কিন্তু যখনই বলতে যাই, লজ্জায় পারি না। বিষয়টী—হেমের বিবাহ প্রস্তাব। শুনতে পেলাম—আর, পি, রায়ের কন্যা লীলার সাথে তার বিবাহ নাকি ঠিক হয়েছে। আর পি রায় তার ভাইয়ের পীড়া উপলক্ষ্যে টেলিগ্রাম পেয়ে পনর দিনের ছুটী নিয়ে সপরিবারে কলকাতায় গিয়েছেন, ফিরে আসলেই নাকি তারিখ ইত্যাদি সব ঠিক হবে।

বেশ্‌তো ভাল কথা। লীলার উপযুক্ত স্বামীই হেম। উভয়ে মিলিত হলে,—তাদের জীবনটী যাবে বেশ।

সে দিন সন্ধ্যার পরে হেমকে একাকী পেয়ে কথাটী খুলে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম্। সে হেসে বল্লে, রসিক বাবুই বলতে পারেন—তার সংবাদ কতটা সত্য। হলে এমন দোষেরই বা কি? তোমরা হচ্ছ বড় লোক—তোমরা যা হেলায় ফেলে যাবে—আমাদের মত গরীবদের সে সব খোসা কুঁড়িয়ে নিয়েই ভাগ্যবান মনে করতে হবে।

আমি ঈষৎ হেসে বল্লাম,—যাই বলো এখন আর আমাদের বড় লোক বলে তুমি গাল দিতে পার না। আর খোসা ছড়িয়ে ফেলবার

কথা যে বল্‌ছ—লীলা যে কারো প্রতি কোনও প্রকারে আকৃষ্ট হয়েছিল—তারতো আমি কোনও প্রমাণই পাইনি। কেন ভাই নিরীহ গোবেচারীর উপর দোষ চাপাচ্ছ?

হেম হেসে উত্তর কল্ল,—তুমি গোবেচারী? কি যেন ভাই, বুঝি না,—তোমাদের ভাবুকদের চরিত্রের ভিতর কি যে কি একটু মিষ্টত্ব একটু শক্তি আছে যে লোক-সকল আপনা আপনিই কেমন করে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। মেয়েগুলো তো তোমাদের জন্যে পাগল। এই তো সরো—

কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিল—হঠাৎ বাধা পেয়ে চুপ করলো।

আমি। যাক্‌—সে সব কথা। এখন তুমি লীলাকে নিয়ে সুখে থাক—ইহাই প্রার্থনা কচ্ছি। ভালই হলো। তবে যতই কেন না তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রশংসা করি, লীলার মত মেয়েকে বশে রাখা বোধ হয় এত সোজা ব্যাপার নয়, তা তুমিও বোধ হয় অস্বীকার করবে না।

হেম হেসে বল্ল,—লাগামটা সব সময়ই একটু কসে টেনে রাখ্‌তে হবে।

আমি। কবে তারিখ? এত সব ব্যাপার, আমাকে তুমি কিছুই জানাও নি।

হেম। পূর্ব্বে জানিয়ে তো কোনও লাভ নেই। প্রেম দেবতার কাণ্ডকারখানা, পাকাপাকি না হলে কি জানান উচিত হতো? জানইতো আমি কণ্ট্রাক্টার—কাজটীতে হাত দেবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তও টেণ্ডার ফিরে যাবার ভয় যায় না।

আমি। এ ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন কোনও ভয় নেই।

হেম। কেমন করে বল্‌বো?

এমন সময়, নলিনী মাকে নিয়ে সে কক্ষে প্রবেশ কল্ল। আমি হেসে বল্লাম,—মা! শুভ সংবাদ আছে।

নলিনী ব্যাগ্র হয়ে বল্লে,—কি দাদা! কি?

আমি। এমন সংবাদের কথা বল্‌বো—যা তুমি পূর্ব্বে কখনো ভাবোনি। হেমের বিবাহ।

নলিনী নয়নদ্বয় বিস্তারিত করে বল্লো,—কোথায়? কোথায় দাদা?

আমি। তুই ভেবে বল্‌না?

আমি নলিনীর দিকে চাচ্ছিলাম এবং সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হচ্ছিল যেন কি এক অস্বাভাবিক জ্যোতিতে তার চক্ষুদ্বয় জ্বলছিল। এ কি?

নলিনী উত্তর কল্ল,—না দাদা! ঠিক করে বলনা—ঠাট্টা নয়।

তাকে আর অধিক কাল সন্দেহ যন্ত্রণা ভোগ করতে না দিয়ে আমি বল্লাম, তোমার সখী রুবির সাথে।

মা বল্লেন, সত্যি? বেশ তো ভাল কথা। রুবি মোটের উপর মেয়ে ভাল—দেখ্‌তে তো অপূর্ব্ব সুন্দরী। (হেমকে উদ্দেশ করে বল্লেন) তোমার বাপ মার মত জেনেছ? তাঁদের বোধ হয়, তেমন মত হবে না। তাঁরা যেমন গোঁড়া হিঁদু। তা আমি তাঁদের বুঝিয়ে লিখব।

আমি। এখনও কথাবার্ত্তা ঠিক হচ্চে—কিছু দেরী আছে—তবে মোটামুটী সব ঠিক হয়েছে। মিষ্টার রায় ফিরে এলেই তারিখ ঠিক হবে।

নলিনী। তাঁরা যেন কবে আস্‌ছেন? আসুক এবার রুবি। এত সব কাণ্ডকারখানা হয়ে গেল, অথচ আমাকে যে শেষ পত্র লিখেছে তাতে এসবের কোনও উল্লেখই নেই।

এর পরে বিবাহ সম্বন্ধে নানা কথা হতে লাগ্‌লো। হেম মাঝে মাঝে দু একটী কথা বল্‌তে লাগ্‌লো। নলিনী প্রথম প্রথম খুব আগ্র-

হের সহিত কথাবার্ত্তায় যোগ দিল কিন্তু শেষটা যেন তা একেবারেই জমে উঠ্‌ল না। অন্যান্য দিন হতে সকালেই হেম চলে গেল এবং আমরা যে যার শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করলাম।

* * * *

কয়েক দিন পরেই আর পি, রায় পরিবারসহ গৌহাটীতে ফিরে এলেন। তখন হতে আমাদের গল্পের মজলিসটী বেশ জমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। লীলা ও তার মা প্রায় প্রত্যহ বৈকালেই গাড়ী করে আমাদের ওখানে বেড়াতে আস্‌ত। মাঝে মাঝে আর পি, রায়ও আস্‌তেন। আমরাও তার ওখানে যেতাম।

হেমের সান্নিধ্যে লীলার পূর্ব্বেরই ন্যায় নিঃসঙ্কোচ ভাব। আমি ভেবেছিলাম হেমকে দেখে তার নয়নে বদনে তীব্র আনন্দ জ্যোতি ফুটে উঠ্‌বে কিন্তু কৈ তেমন তো কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। হেমের চালচলনের ও তার কাছে বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাচ্ছিনা। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল, উভয়েই মনের কথা চেপে যাচ্ছে।

সে দিন হেমকে কথাপ্রসঙ্গে হেসে বল্লাম, কি হে ব্যাপারখানা কি? কিছুই যে ভাল করে বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে।

সে হেসে উত্তর করল, তোমার মত প্রস্তর মস্তিষ্কের বুঝবার কথা নয়। এ সব প্রেমের ব্যাপার তুমি বুঝবে কি? কাব্য চর্চ্চা কর, কিন্তু এখন দেখ্‌লাম,—অপদার্থ তুমি—কেবল কতকগুলি মনগড়ানো কথার প্যাঁচে জড়িত হয়ে আছ—প্রেমের কিছুই জান না। সংসারের খবর রাখনা।

'তা যাই হোক, এখন তারিখ ঠারিখ ঠিক কর,আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? আমরা থাকৃতে থাকৃতেই হয়ে যাউক।'

'এত তাড়াতাড়ির কি প্রয়োজন ? বিবাহ কি এত সোজা ব্যাপার ?'

হেমের তো এই প্রকার ভাব, ওদিকে নলিনীর মুখে শুন্‌লাম, লীলার মনোগত ভাবটী সেও পরিষ্কাররূপে বুঝে উঠ্‌তে পারছে না।

এই প্রকারে সন্দেহ যখন নিতান্তই অসহ্য হয়ে দাঁড়াল, তখন একদিন সাহস করে আর, পি, রায়কেই খুলে সব জিজ্ঞাসা কল্লাম। তিনি উত্তরে বল্লেন,—বিবাহ-প্রস্তাব যে চলেছে—তা ঠিকই, তবে হেম তিন মাস সময় চেয়ে নিয়েছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সে তেমন কিছুই বল্‌তে পারলে না। যাক্‌, তিন মাস বৈ তো নয়, দেখতে দেখ্‌তে চলে যাবে।

'লীলা কি বলে ?'

'তার এমন আপত্তির কি কারণ আছে ? হেমের মত সুশিক্ষিত সচ্চরিত্র উৎসাহী যুবকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যে কোন রমণীর পক্ষে গৌরবের বিষয় নয় কি ?'

'কোথায় বিয়ে হবে ?'

'মাঘ মাস হতে আমি তিন মাসের ছুটী নিচ্ছি—তখন কলকাতেই বিয়ে হতে পারবে। আমার ছোট ভাইরও তখন কলকাতা থাকার কথা। সেখানেই সুবিধা হবে। তোমার মত কি ?'

'আমার ও তাই মত। কলকাতাতেই বিয়ে হওয়া ভাল। তা না হলে আমাদের সকলের বিবাহে যোগদান করা সম্ভবপর হয়ে উঠ্‌বে কিনা সন্দেহ।

নলিনী এত সব জান্‌ত না। তাকে সব কথা বল্লাম। সে উত্তর করলো, বেশতো, ভালই হলো, রুবি যে আমাদের হয়ে রইলো—বড়ই আনন্দের কথা। অন্য কারও হাতে পড়লে তো আর দেখা হবার

সুযোগই থাকৃত না। কিন্তু হেম্‌দা তিন মাসের সময় নিলে কেন, বলতে পার দাদা ?

"কেমন করে বল্‌বো ? ও পাকা সাংসারিক লোক। বোধ হয়, তার আগে টাকা পয়সা সব মনোমত গুছিয়ে নিতে পারবে না।"

তাই হবে—বলে নলিনী কক্ষান্তরে চলে গেল। যাবার সময় দেখ্‌লাম—তার নয়নপ্রান্তে হাসিরাশির ভিতর যেন অশ্রুবিন্দুও দৃষ্ট হচ্ছে। এর অর্থ কি ? লীলার সাথে হেমের বিয়ে হয়,—একি তার ইচ্ছা নয় ?

* * * *

লীলাকেও যে বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে। সর্ব্বত্র হাস্যময়ী, লীলাময়ী—আমার কাছে এলে কেন সে এমন ব্রীড়াবনত হয়ে পড়ে ? গলার স্বর সংযত হয়ে আসে এবং চাল চলনও যেন কেমন নম্রভাব ধারণ করে। পুরীতে তো তার এভাব তেমন দেখিনি ? সে দিন বৈকালের দিকে আমার শরীর খারাপ হয়ে পড়েছিল—সে ও নলিনী উভয়ে মিলে কেমন আমার সেবাশুশ্রূষা করলে ? তার কমল-কলির ন্যায় সুন্দর নিটোল শুভ্র অঙ্গুলি নিচয়ের স্পর্শ যেন এখনও আমি আমার কপালের উপর অনুভব কচ্ছি। হেম ভাগ্যবান যে তার মত রমণীরত্নকে পেয়েছে। নীলাম্বরী সাড়ী পরিধানে তাকে সেদিন বড়ই মধুর দেখাচ্ছিল ; মধুর তার সুগোল বলয়শোভিত বাহুযুগল ; মধুর তার মুক্তাবিনির্ম্মিত হার শোভিত চারু গ্রীবাদেশ ; মধুর তার কপোলপোরি বন্ধনবিমুক্ত কালো কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ ; মধুর তার হস্ত ও পদদ্বয়ের সচঞ্চল গতি ; মধুর তার সুন্দর আবেগভরা বদনখানি, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মধুর তার সরস সরল সতেজ বাক্যাবলী।

তার লেখা পড়া তেমন নেই, তাও তার কাছে মাঝে মাঝে যেমন সব কথা শুন্‌তে পেতাম, এমন আর কোন রমণীর কাছে নয়। অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালিকা—নয়নদ্বয় হতে যেন প্রতিভার জ্যোতি বিকীর্ণ হচ্ছে। আপনার মনের আবেগেই সে চলেছে—অন্য কারো দিকে চেয়ে জীবন-গতি নির্ণয় করা তার পক্ষে কি সম্ভব?

সন্ধ্যার কিছু পরে সে-দিন আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে নলিনীর সাথে আলাপ কচ্ছি, এমন সময় সে তার মাকে সঙ্গে করে আমার কক্ষে এসে উপস্থিত হলো। আমাকে পীড়িত দেখে দয়ার্দ্র ভাবে তার চক্ষুদ্বয় যেন আপনা হতেই জলে ভরে উঠ্‌লো। আমাকে লক্ষ্য করে বল্লো, আপন কি আর শীগ্‌গির ভাল হবেন না, সুরেশ বাবু? ভগবানের আক্কেল দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

আমি উত্তর করলাম, ভগবানের কি দোষ? স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করে চলিনি,—তাইতো ভুগছি। কার ঘাড়ে নিজের দোষ চাপাব?

'কই, আমি তো আপনার কোনও দোষই দেখ্‌ছিনে। বরং আপনি যেমন সাবধান হয়ে চলেন, এমন কজন চলে? ভগবানের বিচারই এমন—যে মানুষ তাকে রাখ্‌বে আধমরা করে, আর যারা অপদার্থ, সংসার জ্বালিয়ে খাবে, তাদের কেমন স্বাস্থ্য।

কথাপ্রসঙ্গে রমণীজীবনের কথা উঠ্‌লো। লীলা বলে উঠ্‌লো, আমি যতই ভাবি, ততই আমাদের জীবনটা কেমন বিসদৃশ বোধ হয়। সংসারে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি কেন? শুধু সন্তানের মা হলেই কি জীবনের চরিতার্থতা হলো? শুধু এ নিয়েই কি কোন বুদ্ধিমতী রমণী সারাটা কাল কাটিয়ে যেতে পারে?

নলিনী বলে উঠ্‌লো, তবে তুমি কি চাও?

'কি চাই ? কি চাইনে বরং জিজ্ঞাসা কর। সর্ব্বাগ্রে চাই—পুরুষ ও রমণীর সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার। পুরুষের জীবনরূপ গাড়ী চালাবার জন্য আমি চাকা হয়ে থাকতে ইচ্ছা করি নে। পুরুষের সঙ্গে রমণী মিলিত হবে শুধু এক সর্ত্তে—উভয়েই স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করবে। নিজ ইচ্ছানুসারে একে অন্যের সাহায্য করবে এবং একে অন্যের দিকে চেয়ে বাসনা সংযত করে চলবে। এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের জীবন পুরুষের স্বার্থরূপ অনলে ভস্মীভূত হয়েছে। সব সুসভ্য দেশেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হচ্ছে। আমাদেরই কি হবে না ? এই তো সে দিন মিস গিলবার্টের সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল—অষ্ট্রেলিয়াতে ফিনলেণ্ডে মেয়েরা পার্লিয়ামেণ্টে ভোট দিতে পারে। ভোট তো দূরের কথা, ঘরের বের হতেই আমরা পারব না ? কি অত্যাচার ?"

নলিনী হেসে বল্ল, আচ্ছা আর বেশী দিনতো নয়, দেখি কেমন করে তোমার এত স্বাধীনতা নিয়ে তুমি ঘর কন্না কর।

কথাটী উত্থাপিত হতেই লীলার মুখ কেমন যেন বিষণ্ণভাব ধারণ করলো। কিছুই যে বুঝতে পাচ্ছিনা। হেমের সঙ্গে বিবাহে কি তবে তার মত নেই ? শুধু বাপ মার কথাতেই কি সে বিবাহে সম্মত হয়েছে ? সে তো তেমন মেয়ে নয়। কিছুই যে ঠিক করে উঠতে পারছিনে। হেমও যেন সব কথা পূর্ব্বের ন্যায় সরল ভাবে খুলে বলছে না। সকলেই যেন কি চেপে চেপে যাচ্ছে। মিষ্টার আর পি রায়কেই আর একদিন ভাল করে খুলে সব জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌহাটীতে এসে আমার শরীর অনেকটা আরোগ্য হয়েছে। দেহে বেশ একটু বল পাচ্ছি। এখন ইচ্ছা কর্‌লে দুই তিন মাইল হেটে যেতে পারি। হৃতসর্ব্বস্ব ব্যক্তি যেমন অপহৃত ধনের সামান্য অংশ ফিরে পেলেও আপনাকে সুখী ও ভাগ্যবান মনে করে, আমি ও যা ফিরে পেলাম, তাতেই নিজকে কৃতার্থ মনে করতে লাগ্‌লাম।

গৌহাটী হতে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য দিন ঠিক হলো। শেষে বিদায়ের দিন এসে উপস্থিত হলো।

আমাদের রওয়না হবার পূর্ব্বদিনের অধিকাংশই লীলা আমাদের গৃহে নলিনীর সহিত কর্ত্তন কর্‌লো। দেখ্‌তে লাগ্‌লাম,—মাঝে মাঝে সে আমার কক্ষে প্রায়ই উপস্থিত হতে লাগ্‌লো। একবার থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, এখন যেয়ে কি করবেন?

আমি তদুত্তরে বল্লাম,—কি আর করব? শরীরটা সম্পূর্ণ ভাল না হলে আর কোনও দিকেই যাচ্ছিনে।

লীলা। তাই করা উচিত আপনার। শরীরের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ্‌বেন। নলিনীর ও তো এসব দিকে তেমন দৃষ্টি নেই।

নলিনী হেসে বল্লো—চলনা ভাই রুবি, আমাদের সাথে। তুমি যেমন লোকের সেবা শুশ্রূষা করতে পার—এমন আমরা পেরে উঠিনে। আর যাই হোক,—মিস গিলবার্ট হতে এ শিক্ষাটী পেয়েছ ভালই।

আমি। ওঁর কোনটাই বা মন্দ, তুমি এত লেখা পড়া শিখ্‌লে—তাও নড়তে চড়তেই কত ভয়, ওঁর কেমন সাহস্? এই তো ভাল।

লীলার বদন সে প্রশংসা বাক্য শুনে যেন আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সে বল্‌তে লাগ্‌লো—আপ্‌নি ছাড়া আর কেউ আমার চাল্‌চলতির পছন্দ করে না। আমার নাকি লজ্জা সরম কম,—গায়ে পড়ে পুরুষদের সাথে কথা বলি, যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাই।

আমি। লোকের কথায় কি আসে যায়? হেম ভাল বল্লেই হলো। আমার পূর্ণ বিশ্বাস আপনাদের জীবন সুখেই যাবে।

কতক্ষণ সে কিছুই বল্লনা। শেষে ধীরে ধীরে বল্ল,—কলকাতায় যেয়ে কেমন থাকেন আমাদের যেন জানাতে ভোলেন না। মার মুখে আপনার কথাতো লেগেই আছে—বাবা ও আপনার কত সুখ্যাতি করেন। আর দেখ্‌বেন ডাক্তার সাহেব যে শেষ মিকশ্চারটী দিয়েছেন—তা যেন নিয়ম মত খান। ওতে আপনার বেশ উপকার হচ্ছে।

কথাটী বল্‌তে বল্‌তে তার স্বর নম্র হয়ে এল।

কতকক্ষণ পরে সে চলে গেল। তার পর দিন দুপুর বেলা আমরা রওয়না হব। সকাল বেলাই,—লীলা তার মাকে নিয়ে উপস্থিত হলো। আমাদের জিনীষপত্র সব গোছাইয়া দিল। রওয়না হবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে সে আমাকে লক্ষ্য করে নলিনীকে বল্ল—দেখো নলিন্, ওঁর শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখ্‌তে যেন ভুলনা। মনে করোনা যেন উনি সম্পূর্ণ সেরেছেন।

এই তো প্রকৃত নারী। জগতের শোকাশ্রু যাতনা বেদনা মোছাবার জন্যই তোমাদের সৃষ্টি। তোমারা আছ, তাই তো সংসার সুমিষ্ট, কোমল, বাসযোগ্য! আমি তার দিকে দৃষ্টি কচ্ছিলাম আর আমার হৃদয় হতে এক কৃতজ্ঞতার ভাব উত্থিত হয়ে তাকে ঢেকে ফেল্‌ছিল।

হেম কয়েক ষ্টেসন পর্য্যন্ত আমাদের সাথে এসে স্বস্থানে চলে গেল। গৌহাটী আসার পর হতেই সে যেন কেমন আমার কাছে ক্রমে ক্রমে

দুর্বোধ্য হয়ে উঠ্‌ছে। মনে হচ্ছিল—আমার কাছ হতে সরে যাবার উপক্রম কচ্ছে অথচ কি এক অনিশ্চিত অমঙ্গলের ভাবনায় আমার কাছে পূর্ব্বাপেক্ষাও মাঝে মাঝে নিকটে আসবার চেষ্টা কচ্ছে। তার এ কেমন ব্যবহার? সব কথা সে আমায় খুলে বলে না কেন?

নীলকণ্ঠপুর ষ্টেসনে যখন সে নেমে চলে গেল, তখন এমন একটা ক্ষুদ্র ঘটনা ঘটলো যাতে তার ব্যবহার যেন আরও সন্দেহ জালে অস্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো। সে নীচে নেমে গেছে, এমন সময় চেয়ে দেখ্‌লাম নলিনী ষ্টীমারের দোতালায় ক্যাবিনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তার দিকে দৃষ্টি বদ্ধ করে আছে—তার বিমলাভ নয়নযুগল কি গভীর বিষাদে ভরা, অশ্রুসিক্ত। হেমও তার দিকে চাচ্ছিল, আমি উভয়ের সেই দৃষ্টির ভিতর প্রাণের খেলা দেখ্‌ছিলাম। এমন সময় নলিনী বসনের অগ্রভাগ সাহায্যে চক্ষু ঢাকলো। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লাম, কি হয়েছে নলিন্? সে উত্তর কল্লো,—দেখতো দাদা! চোখে কি গিয়েছে? অনেকবার চেষ্টা কল্লাম—কিছুই চোখের ভিতর দেখ্‌তে পেলেমনা। কিছুই বুঝতে পাল্লেমনা। কল্পনা বলে কি আমি নিজ মন হতে রহস্য জাল সৃষ্টি করে তুল্‌ছিলাম?

যাক্‌—এখন সে সব কথা। কলকাতায় এসে নলিনী গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হলো। সংসারের কাজ কর্ম্ম হিসাব পত্র সেই দেখ্‌তে লাগ্‌লো।

একটা কথা বল্‌তে ভুলে গেছি। গত বৎসর সে বি এ পাশ করেছে এবং তার পর হতে পড়া ছেড়ে দিয়েছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গৌহাটী হতে আমি দুটী মহা সামগ্রী নিয়ে এসেছি, একটী স্বাস্থ্য আর একটী হেমের জীবন-স্মৃতি। এই অত্যল্পকাল মধ্যেই সে কেমন অবস্থার উন্নতি করে নিয়েছে?

আর আমি কচ্ছি কি?

ঠিক পূর্ব্ব স্বাস্থ্য যে ফিরে পাব—তার সম্ভাবনা বিরল। যেটুকু পেলাম তাতেই আপাতত সন্তুষ্ট রইলাম। মনে হতে লাগ্‌লো আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে নিজকে নিযুক্ত করব কিন্তু ভেবে দেখ্‌লাম—তার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত। কি যে কি করব, কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারছিলামনা—অথচ সাংসারিক অবস্থা দিন দিনই মন্দ হয়ে পড়ছিল।

হাতে কোনও কাজ নেই। মাঝে মাঝে দু একটী কবিতা লিখি কিন্তু তাতে সমস্ত প্রাণটী ভরে ওঠে না। মাষ্টার বসন্ত বাবুর বাসায় মাঝে মাঝে যাই। তাঁর হৃদয় তেমনি জ্বলন্ত উৎসাহ ও আনন্দে ভরা। তাঁকে একদিন বল্লাম, সার, একটা নূতন তেজস্কর ধরণের কিছু লিখুন যা পড়ে বাঙ্গালী কার্য্যক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তিনি উত্তর কর্‌লেন, আমারও তো সেই মত। বাঙ্গলা সাহিত্য এ কি হয়ে উঠ্‌লো? সর্ব্বত্রই কেবল বেঙের ছাতির ন্যায় প্রেম, প্রেম, প্রেম—আর বাতায়নে বাতায়নে প্রেমিকার দল বসে আছেন। আগে জ্বালিয়েছে নেড়ানেড়ীর দল—বৈষ্ণবীর দল—কেবল সখীভাব, রাধিকা-চন্দ্রাবলীর ভাব, মানভঞ্জন, বিরহ, বিলাপ। পুরুষগুলো কাছা খুলে, মাথা মুড়ে, দাড়ি গোঁফ ফেলে, টিকি রেখে এক কিম্ভূত কিমাকারে দাঁড়িয়েছিল—না মেয়ে না মরদ।

এই নেড়ানেড়ীর দলের শিক্ষায় বাঙ্গালী সব স্ত্রীতে পরিণত হয়েছিল। মাইকেল হতে নবীনচন্দ্র পর্য্যন্ত মাঝে কয়েকটা দিন গিয়েছিল ভাল,—আবার সেই সখী-ভাব নূতনরূপে দেখা দিয়েছে। পুরুষের কেন এত স্ত্রীলোক নিয়ে কান্নাকাটি,—এত প্রেম-চর্চ্চা। আমি তো এসব কথাই লিখি কিন্তু তোমরা তো পছন্দ করবে না?

আমি বল্লাম, মাষ্টার মশায় আমার মত বদ্‌লে গেছে। আপনি লিখুন,—আর কেউ না পড়লেও আমি পড়ব।

এমন সময় বিশপ কলেজে একপ্রকার অযাচিতভাবে একটী প্রফেসারি কাজ পেলাম। মার নিতান্ত আপত্তি সত্বেও গ্রহণ করলাম। কত দিন অলস হয়ে বসে থাকা যায়?

আমার ইচ্ছা ছিল নলিনী ও কোন একটা কাজে ব্যাপৃত থাকে কিন্তু তা হলে মাকে যে একলা গৃহে থাকৃতে হয়। তাই,—তাহা এখন ঘটে উঠ্‌ল না।

আমার মত ধীর প্রকৃতির লোকের পক্ষে কলেজের কাজটী বেশ মনোমতই হলো। খুব মন দিয়ে কাজ করতে লাগ্‌লাম। কলেজের ইংরাজ প্রফেসারদের সম্পর্কে এসে আমি যেন এক নবীন জীবনের আভাস পেলাম। সকলেই বড় বড় বিদ্বান—ধর্ম্মের আহ্বানে এক্ষণে এখানে এসে সামান্য বেতনে চাকরী কচ্ছে। কেমন কর্ত্তব্য নিষ্টা!

বিধি বাম। মাস দুই যেতে না যেতেই আমি পুনঃ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লাম। ইহা আমার পিতৃদেব্র হ'তে প্রাপ্ত। চাকরী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। শোকবেগে মন উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছিল—কিন্তু জগতে আমার অপেক্ষাও কত দীন দুঃখী রয়েছে—তাদের দিকে চেয়ে নীরব হয়ে রইলাম।

আবার ডাক্তারগণ স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য উপদেশ দিতে লাগ্‌লো। কোথায় যাই? রাঁচি, বৈদ্যনাথ, হাজারিবাগ কোনটাই আর মনঃপূত হচ্ছিল না। অবশেষে মামা বাবুর উপদেশ মত স্বদেশ পূর্ব্ববঙ্গের দিকেই যাত্রা করলাম।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মালতী আমাদের পৈতৃক বাসস্থান হলেও আমাদের তেমন পরিচিত নয়। মার সমস্ত জীবনই একপ্রকার কলকাতাতে অতিবাহিত হয়েছে। সেই যে বিবাহ-কালীন একবার গিয়েছিলেন, তার পর আর দুই চারবার মাত্র গিয়েছেন, বেশী দিন কখনো থাকেন নি।

আমার সম্বন্ধে তো পূর্ব্বেই বলেছি। নলিনীর সে-দেশ দর্শন এ পর্য্যন্ত ঘুটে ওঠে নি।

যাত্রা করা গেল। সঙ্গে কানাই দাদা, ভৃত্য গয়ানাথ, দাসী উমাতারা। বাটীর বৃদ্ধ গোমস্তা কৃষ্ণকিশোর পথ-প্রদর্শক স্বরূপে সঙ্গে চল্ল।

অতি প্রত্যূষে গাড়ী গোয়ালন্দ ঘাটে এসে উপস্থিত। জানালা হতে মুখ বের করেই দেখ্‌লাম—অদূরে রজত-তরঙ্গিনী পদ্মা উষার আলোক বক্ষে ধারণ করে হাস্‌ছে। তীর-পার্শ্ব ষ্টীমার ও নৌকায় ব্যাপ্ত। চারিদিকেই লোকজন, কেহ গাড়ী হতে নামছে, কেহ ষ্টীমারে উঠ্‌ছে, কেহ কুলি কুলি করে ডাক্‌ছে—সকল দিকেই কেমন সজীবতার ভাব, স্ফূর্ত্তিজনক।

জীবন

যখন ষ্টীমারে উঠ্‌লাম ও প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত সুবিস্তৃত পদ্মার বক্ষ বিলোড়িত করে ষ্টীমার চল্‌তে লাগ্‌লো, তখন বেশ একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগ্‌লাম। ষ্টীমারে লোকজন যথেষ্ট কিন্তু খুব বেশী নয়। নলিনী বৃদ্ধ সরকার মশায়কে নানাবিধ সকৌতুক প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌তে লাগ্‌লো।

সারাদিনই ষ্টীমার চল্ল। মাঝে মাঝে ষ্টেসনে লাগিয়ে আরোহী সংগ্রহ করতে ও নামাতে লাগ্‌লো। নলিনীদের কক্ষে মাঝে এক ষ্টেসনে একটী সদ্য বিবাহিতা বালিকা প্রবেশ করেছিল। যে তিন চারি ষ্টেসন পর্য্যন্ত সে ষ্টীমারে ছিল, তার গুণ্ গুণ্ ক্রন্দন ধ্বনিই শুন্‌তে পাচ্ছিলাম। এই সেই প্রথম বাপমার কোল ও ছোট ভাই বোন্‌দের ছেড়ে শ্বশুর বাড়ী চলেছে। শোকে দুঃখে মেয়েটীর প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। তার সঙ্গীয় এক দাসী তাকে মাঝে মাঝে প্রবোধ দিচ্ছিল, মাঝে মাঝে গর্জ্জন করেও উঠ্‌ছিল। নলিনী তাকে প্রবোধ দেবার কত চেষ্টা করল কিন্তু কোনও ক্রমেই তার শোকবেগের যেন বিরাম নেই। শেষটায় বুঝি বালিকা একটু প্রবোধ মান্‌লো, নলিনীর সাথে কথাবার্ত্তায় নিযুক্ত হলো। মার সঙ্গেও দুই একটী কথা বল্‌তে লাগলো। এমন সময় ষ্টীমারে সিটী দিল, তার শ্বশুরবাড়ীর লোকজন এসে উপস্থিত হলো। রোরুদ্যমানা বালিকাটীকে নিয়ে চলে গেল। সে যাওয়ার পর নলিনী আমাকে বল্ল, বেশ মেয়েটী,—আমার দেখে শুনে বড়ই দুঃখ হচ্ছিল, থেকে থেকে কেবল ওর ছোট ভাইটীর কথাই বল্‌ছিল। আমার কিছুই কাছে নেই, যাবার সময় ওঁর ভাইকে কিছু কিনে দেবার জন্য পাঁচটী টাকা দিয়ে আশীর্ব্বাদ দিয়েছি! আর বোধ হয়, মেয়েটীর সাথে দেখা হবে না! নামটী তার মনোরমা। মনোরমাই বটে।

জীবন

বেলা যখন প্রায় অবসান হয়ে এলো, তখন আমাদের ক্ষুদ্র ষ্টেসনটীতে এসে ষ্টীমার থাম্‌লো। ঘাটেই নৌকা বাঁধা ছিল। সরকার মশায়ের উপদেশানুসারে তাতে চড়লাম, ধর্‌তে গেলে ইহাই নলিনীর প্রথম নৌকা যাত্রা। জ্যৈষ্ঠের শেষভাগ, সন্ধ্যা। আকাশ কিঞ্চিৎ মেঘাচ্ছন্ন। সম্মুখে বিস্তীর্ণ পদ্মানদী ঈষৎ বায়ুভরে তরঙ্গায়িত। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানিও দুল্‌ছে; নলিনী ঈষৎ ভীতিগ্রস্ত হয়ে বল্ল, কখন পৌঁছব, বুঝি বা শেষে জলে ডুবেই মারা যাই।

তা শুনে সরকার ম'শায় বল্লেন, কিছুই ভয় নেই, দিদি। একটু পরেই খাল, তখন আর কোনও চিন্তাই নেই, দিব্যি আকাশ, ঝড় তুফানের কোনও ভয় নেই।

তিনি যাহাই বলুন, নদীর দিকে চেয়ে আমরা কেহই তেমন শান্তি অনুভব কর্‌ছিলাম না।

'দুর্গা, দুর্গা' বলে সরকার মশায় নৌকা ছেড়ে দিলেন। অন্য নৌকায় আমাদের জিনিষপত্রাদি চল্ল। বাটী হতে দুটি লোক ও সরকার মশায়ের পুত্র নবীন এসেছিল, তারা সঙ্গে চল্ল।

ক্রমে রাত্রি হয়ে এলো, চারিদিক আঁধারে ব্যাপ্ত হয়ে উঠ্‌লো। নৌকাদ্বয় নিস্তব্ধ নদীবক্ষে দাড়ের ঝপ্‌ ঝপ্‌ শব্দ উত্থিত করে ধীরে ধীরে চল্‌তে লাগ্‌লো।

আমাদের কারো মনে সুখ নেই। প্রভাত প্রকৃতির কমনীয় কান্তি দর্শনে হৃদয়ে যে আনন্দের সঞ্চার হয়ে ছিল, এখন আর তা নেই। কেবলই মনে হচ্ছিল, কোথায় কোন্‌ অজানা দেশের বিজন পুরীতে চলেছি, পশ্চাতে আলো ফেলে এসেছি এবং যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই আঁধারের রাজত্বে প্রবেশ কর্চ্ছি।

আমাদের তো এ দশা কিন্তু বৃদ্ধ সরকার মশায়ের আনন্দের সীমা নেই। তার ভাব-গতিক দেখে বোধ হচ্ছিল যেন কি অমূল্য-রত্ন আঁচলে বেঁধে গৃহে ফিরছেন। নলিনীকে উল্লেখ করে বারংবারই বল্‌তে লাগ্‌লো, দেখ্‌বে দিদি! কি সুন্দর দেশ, খাবার দাবার কত সুবিধা।

আমি কলকাতার কথা বল্‌তে বৃদ্ধ বলে উঠলো, সে আবার একটা জায়গা বাবু? এক ফোঁটা দুধ খাবার জো নেই, মাছ তরকারী সব দুর্ম্মূল্য—আছে এক কলের জল। শুধু জল খেয়ে তো পেট ভরে না। আর চব্বিশ ঘণ্টাই হৈ চৈ—যেখানেই যাও, দুর্গন্ধ। কলকাতা, ঢাকা—নরক, নরক। আমাদের গ্রাম-দেশ তার তুলনায়—স্বর্গ।

যা হোক, অবশেষে স্বর্গধামে পৌঁছলাম। রাত্রি একপ্রহরের কিঞ্চিৎ অধিক—কিন্তু গ্রামে তখন গভীর রজনী। লোকজন সমস্তই প্রায় নিদ্রাভিভূত, কেবল একটু দূর হতে কামারের দোকানের লোহা-পেটার শব্দ নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করে কর্ণে প্রবেশ কচ্ছে।

চারিদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন। সম্মুখে শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহ ভীষনকায় দৈত্যদানবের ন্যায় দণ্ডায়মান। চারিদিক নির্জ্জন—মাঝে মাঝে দুই একটী গ্রাম্যসুলভ পক্ষীর কূজনধ্বনি শুনা যাচ্ছে। কেমন একটা নৈরাশ্য ও ভয়ের ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। সেখান হতে কেবলই বানী উত্থিত হচ্ছিল, এই বিজন পুরীতে এই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ স্থানে কেমন করে মাকে ও নলিনীকে নিয়ে জীবন কর্ত্তন করব?

অন্ধকারাবৃত বিজন পথ বহিয়া অবশেষে গৃহে প্রবেশ করলাম। পাকা চকমিলান বাড়ী, কক্ষসমূহ প্রশস্ত কিন্তু অনেকদিন লোকজন না থাকায়, পারাবত ও চামচিকার আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে।

কোনও প্রকারে আহারাদি শেষ করে, পরিশ্রান্ত দেহে ততোধিক চিন্তাক্রান্তমনে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

যখন জাগ্‌লেম, রজনী প্রভাত হয়েছে, সূর্য্য ঈষৎ উদিত।

হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি শেষ করে বাহির বাটীতে এসে দেখ্‌লাম, বৈঠকখানা গৃহ লোকে পরিপূর্ণ। গ্রামে নূতন লোক এসেছে, তাও আবার কলকাতা হতে, দেখবার জন্য গ্রামের বৃদ্ধ যুবক ও ছেলেপেলেরা জড় হয়েছে।

আমাকে দেখেই,—তাদের ভিতর হতে বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ ঘোষ বলে উঠ্‌লেন, শুন্‌তে পেলেম বাবা! তোমার শরীর নাকি বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছে, কিছুতেই সেরেও সেরে উঠ্‌ছে না,—এ বয়সে এমনতর হওয়া বড় দুঃখের কথা। তা, আমাদের দেশের জল হাওয়া ভাল, কয়েক দিন থাকলেই ভাল হয়ে যাবে।

আমি। সে আশাতেই তো এসেছি, দেখা যাক্ এখন ফল কেমন দাঁড়ায়। কথা হচ্ছে—মা ও আমার বোনের এ জায়গায় মন বসবে কি না? আমার বোন্‌টী এপর্য্যন্ত কোনও পাড়াগাঁয়ে থাকেনি।

তৎপর তাহাকে ও নবীনকে সঙ্গে করে গ্রাম দর্শনে বের হলেম।

অতি ক্ষুদ্রায়তন গ্রাম—দীর্ঘে অনুমান একমাইল—প্রস্থে আরও কম।

আমাদের পূর্ব্বের বাড়ী গ্রামের ভিতর ছিল। পিতৃদেব সেখান হতে সরিয়ে এনে গ্রামের দক্ষিণ ভাগে নির্ম্মিত করেন। আমাদের কয়েক ঘর জ্ঞাতি এখনও পূর্ব্বের ভদ্রাসনেই বাস কচ্ছেন।

আমাদের বাটীর সম্মুখে ছোট মাঠ—তার প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র 'নীরা'

নদী। ইহা বিশাল পদ্মার খাল বিশেষ। নদীতে জল তক্ তক্ কচ্ছে। ওপারে শ্যামল মাঠ।

খালের ধার দিয়ে ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা একদিকে তিন চারি মাইল দূরে দীঘলতলার হাঠের সাথে যেয়ে মিশেছে—অন্যদিকে সার্বডিভিসেনের সহরে পৌঁছেছে। এই রাস্তাটী ব্যতীত গ্রামে অন্য রাস্তা নেই বল্লে ও চলে—যা আছে স্বল্পপরিসর ও ব্যবহারের তেমন উপযুক্ত নয়। লোক সকল প্রায়ই একে অন্যের বাড়ীর উপর দিয়ে যাতায়াত করে।

গ্রামটী জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারি মাঝে মাঝে লোক সকলের বাড়ী। মাঝে মাঝে ডোবা, গড়; পানায় পরিপূর্ণ পুকুর; ডাহুক, বক ইত্যাদি পাখী পারে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গ্রামে লোকজনের সংখ্যা মন্দ নয়। কয়েক ঘর কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ আছেন,—অন্যান্য লোকের ভিতর অধিকাংশই মুসলমান ও নিম্ন জাতীয় হিন্দু। শেষোক্ত দুই শ্রেণীর ভিতর অনেকেই আমাদের তালুকান্তর্গত প্রজা। তাই,—গ্রামের ভিতর আমাদের প্রতিপত্তিটা একটু বেশী।

গ্রামে হাঠ বাজার নেই। একটী নিম্ন প্রাইমারী পাঠশালা আছে। বৃদ্ধ রামগতি পণ্ডিতের যত্নে কোনও প্রকারে চলছে। মাসিক পঞ্চ মুদ্রা বেতনভোগী পোষ্টমাষ্টার চালিত একটী পোষ্টাফিস আছে, তাহার অবস্থাও শোচনীয়!

মোটের উপর ইহা বাঙ্গালার একটী অর্দ্ধোন্নত খাঁটি গণ্ডগ্রাম। কোনও রাজনীতির চর্চ্চা, কোনও যুদ্ধ বিগ্রহের সংবাদ লোকের মনের শান্তি তেমন হরণ করে না। অল্প লোকই বিদেশে চাকরী করে। অধিকাংশই মাঠে কিম্বা নিকটস্থ হাট বাজারে অথবা দুর্গাপুরের সমৃদ্ধিসম্পন্ন মুসলমান জমীদার মির আমজাদ আলি চৌধুরীর বাটীতে কাজ কর্ম্ম করে সন্ধ্যার

পূর্ব্বে কিম্বা কিছু পরে গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রজনী একপ্রহর না যেতেই আহারাদি শেষ হয়ে যায়। কিয়ৎকাল পরেই সকলে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে ও গভীর নীরবতার ভিতর গ্রামখানি ডুবে যায়।

রাজনীতির চর্চ্চা তেমন নেই কিন্তু সামাজিক দলাদলির অভাব নেই। ভদ্রলোক যে কয়েকজন আছেন, তাদের ভিতর দুই দল, একদলের নেতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ আর এক দলের দলপতি মহেশ বসু। তা ব্যতীত যুগী, মুসলমান, নমঃশূদ্র ইত্যাদি বর্ণও দুই কি ততোধিক দলে বিভক্ত। এত দলাদলি না থাকলে শক্তি, যা সৎকাজে নিয়োজিত হয়ে দেশকে সঞ্জীবিত করে তোলে, তা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে কেমন করে?

দলাদলির কারণগুলিও অনেক সময় হাস্যাস্পদ। জগৎরায় নামক জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোকের জামাতার ভাই বিলেত গিয়েছিলেন,সে বিলাত হতে ব্যারিষ্টার পাশ করে দেশে ফিরলে, তার ভ্রাতৃজায়া (জগৎবাবুর কন্যা) নাকি তার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছে এই উপলক্ষ ধরে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ জগৎকে প্রায়শ্চিত করতে বলেন। সে অস্বীকার করায় তখন হতে গ্রামে দুই দলের সৃষ্টি হয়, একদল বিদ্যাবাগীশের 'হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিনী', অন্যদলের নামকরণ হয়েছে 'খ্রীষ্টানি' দল। মজার বিষয় জগৎ রায় ও তার মেয়ে আজ বছর পাঁচ হয় মারা গিয়েছে কিন্তু প্রতি বিবাহ কি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দুই দলের ভিতর ঝগড়া লেগেই আছে।

সামাজিক ব্যাধি ব্যতীত মোকদ্দমা নামক আর এক ব্যাধি কর্ত্তৃক গ্রামখানি আক্রান্ত। সারা বছরই মামলা মোকদ্দমা চলছে।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রথম কয়েকটা দিন বড়ই বিশ্রী বোধ হতে লাগলো। কথা বল্‌বো এমন লোকটী নেই। যারা আছে তারাও সাহস করে ঘেঁষেনা।

এখন হতে আমার কাজ হলো প্রাতে সন্ধ্যায় নদীতীরে ভ্রমণ ও অন্যান্য সময় পত্রিকা ও গ্রন্থাদি পাঠ এবং রাত্রিতে মা ও নলিনীর সহিত কথোপ-কথন। তা যদি রাত্রিতেই বা অধিকক্ষণ জেগে থাকা যায়? মশার অত্যাচারে বাহিরে থাকা দুষ্কর।

মার জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল কিন্তু নলিনীকে নিয়েই বিপদে পড়া গেল। তার চাল চলন গ্রামের মেয়েদের চক্ষে বড়ই বিসদৃশ বলে বোধ হতে লাগ্‌লো। তার সম্বন্ধে আমি মনু যাজ্ঞবল্ক্য বা রঘুনন্দনের মত গ্রহণ করতে পারি নি। একটী জীবন্ত মানুষকে অর্দ্ধাহারে অনাহারে আজীবন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রেখে তাকে ক্রমে ক্রমে ধ্বংস করা এ নিয়ম আমার চক্ষে কখনও মনঃপুত হয়নি। বেদজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ ষড়দর্শনাভিজ্ঞ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণগণ যে সকল অপূর্ব্ব নিয়মাদি আবিষ্কার করেছেন, তারাই যেয়ে তা পালন করুন, আমার তাতে দরকার নেই। নলিনী গহনা পরত, মাছমাংস খেত, জুতো পায় দিত, পাড় বাঁধা কাপড় পড়্‌তো। তা দেখে গ্রাম্য রমণীগণ চম্‌কে উঠ্‌লো—একি ভয়ানক ব্যাপার! হিন্দুর মেয়ের কি দুর্ব্ব্যবহার!

দুই একজন নলিনীকে প্রকাশ্যে এবং দুই চারিজন আকার ইঙ্গিতে তাদের মনের ভাব জানাতে ক্রুটী করলোনা। তন্মধ্যে বিদ্যাবাগীশের বিধবা ভগ্নীই তীব্র রসনার জন্য গ্রামে বিখ্যাত ছিল। তার বাক্যে বিদ্ধ

হয়ে, একদিন নলিনী কেঁদে কেটে আকুল। আমি তাকে বুঝাতে চেষ্টা কল্লাম কিন্তু কি বুঝাব তাকে? যার জীবনে ভবিষ্যতের শেষ সীমা পর্য্যন্তও আঁধার ব্যতীত আলোর চিহ্নটী নেই, তার কেন জীবনের ক্ষুদ্র সুখ সম্ভোগের অংশ সমূহ নিয়ে খেলাধুলা? তার পরদিন হতে সে আমিষ আহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ কল্ল। অনেক বলেও তার মত কিছুতেই পরিবর্ত্তন করতে পারলাম না।

গ্রামে হাল সভ্যতানুমোদিত জিনীষ পত্রের একান্ত অসদ্ভাব কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই দেখ্‌তে পেলাম অন্যান্য বিষয়ে ইহা সহর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এমন নির্ম্মল বায়ু, প্রখর উজ্জ্বল আলো, শোভন প্রাকৃতিক দৃশ্য—সহরে নেই। ইহাদের প্রভাব আমার দেহের উপর সত্বরই লক্ষিত হতে লাগ্‌লো। পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ একপ্রকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল কিন্তু তথাপি দেখ্‌লাম এখানে আসার পর হতে আমার মন্দাগ্নি ও গ্লানির ভাব দিন দিনই হ্রাস প্রাপ্ত হতে লাগ্‌লো এবং দেহে বেশ বল পেতে লাগ্‌লাম।

বৃদ্ধ চন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে তার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনচন্দ্রের কথা প্রায়ই শুন্‌তাম। একদিন তার নিকট জান্‌লাম—যে বিপিন ছয় মাসের ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছে।

ইহার কয়েকদিন পরে একদিবস প্রাতে একটী উজ্জ্বলনয়ন স্মিত বদন যুবক আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আস্‌লো। ইনিই চন্দ্রকান্ত বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র। তাহারা পৃথগন্ন।

বয়সে আমার অপেক্ষা কিছু ছোট হবে। পাবনায় ঠাকুর জমীদারের অধীনে কাজ করে। সংসারে মাতা, বিধবা ভগ্নী, স্ত্রী ও শিশুপুত্র। তাহারা দেশেই থাকে।

অবস্থা চলনসই। বৎসরের শেষে হাতে কিছু থাকে না,—ধার কর্জ্জও নেই। একপ্রকার নির্ব্বিবাদেই সংসার চল্‌ছে।

বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষা যাকে বলে তেমন নেই। এণ্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়েই লেখপড়া পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপের দু চার দিন পরেই বুঝ্‌লাম মোটামুটি সব বিষয়েই বেশ সংবাদ রাখে।

বাড়ী আসার পর হতেই নব্য দল ও বৃদ্ধদের মুখে তার কথা শুনে আস্‌ছি। সে প্রথমোক্ত দলের নেতাবিশেষ। আলাপ পরিচয়ে বুঝ্‌লাম সে পদের উপযুক্তই বটে।

তার আগমনের কিয়দ্দিবস পরেই গ্রামের নব্য যুবকদলের মধ্যে থিয়েটারের ধুম পড়ে গেল। আমাকে তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য বড়ই আগ্রহ প্রকাশ কর্‌তে লাগ্‌লো। গ্রামে অন্যান্য যে সকল যুবক আছে—তারা আমার নিকট হতে কিছু ভয়ে কিছু বা স্বাভাবিক সঙ্কোচ বশত দূরে দূরে থাক্‌তো। বুঝতাম—তারা আমার সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থী। বালক ও যুবককে আমি চিরকাল ভালবেসে এসেছি। আমারও যে তাদের সাথে মিশ্‌তে ইচ্ছে না কর্‌তো তা নয় কিন্তু গায় পড়ে কিছু একটা করা আমার চরিত্রবিরুদ্ধ।

বিপিন এসে যেন উভয় পক্ষের সঙ্কোচের ভাব এক নিমিষে কর্ত্তন করে দিল। সে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে আমাকে তাদের সাথে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ কর্‌লো। শরীরের অসুস্থতার কথা বলে আমি দুই একবার প্রত্যাহার করলাম। সে ছাড়বার পাত্র নয়। বল্‌তে লাগ্‌লো, বা ! যা বল্‌ছেন,—তাও কি কখনো হতে পারে ? আপনি হচ্ছেন আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের রাজা—আপনার দূরে থাক্‌লে চল্‌বে কেন ? আপনার আগমনে আমাদের শরীরে কত বল হয়েছে।

দীঘলতলাদের সাথে আমরা পেরে উঠ্‌ছি না। লোকে বলে, আমাদের টাকার অভাব। শুধু তা নয়, দলপতিরই আমাদের অভাব বেশী। কে আমাদের উৎসাহ দেয়? আপনি আসায় আমাদের সকল অভাব পূরণ হলো বলে আমরা ঠিক করেছি, এখন যদি না আসেন তা হলে যে আমরা নিতান্তই দুঃখিত হব।

কথাগুলি সে এমন প্রাণের সাথে বল্লো যে শ্রবণান্তর মনে হতে লাগ্‌লো যে ইহা অপেক্ষা সহজ প্রস্তাব হতে পারে না এবং আমি যে কেন তাদের সাথে এতদিন মিশিনি, তজ্জন্য একপ্রকার অনুতাপই বোধ কর্‌তে লাগ্‌লাম।

প্রস্তাবে সম্মত হতে হলো; কিছু অর্থ সাহায্যও করা গেল। তাতেই কি নিষ্কৃতি আছে? রায়দের দুর্গামণ্ডপে নাটকের অভিনয় হবে। বিপিন এসে কি করলে ষ্টেজটী ভাল দেখাবে, পোষাক পরিচ্ছদ কেমন হওয়া উচিত, কলকাতায় থিয়েটার সমূহে কি প্রকার সাজসজ্জা হয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লো। কিছুতেই সে আমাকে ছাড়্‌বেনা।

শেষটায় দেখ্‌লাম—তাদিগকে উপেক্ষা করে লাভ নেই। তাদের সাথে হট্ট গোলের ভিতর যে সময়টুকু কাটান যায় মন্দ কি?

দলে মিশে গেলাম। নাটকের নাম নসিবন, বিপিনেরই রচিত। পড়ে দেখলাম, ভাষা মন্দ নয়, দু একটী গান বেশ সরস, আর তা ছাড়া যেখানে সেখানে নাচ। জিজ্ঞাসা করায় বিপিন বল্লো, ওটী চাইই, উহাই হচ্ছে থিয়েটারের আদত প্রাণ। তা মেয়েরা ঘর ঝাড়ই দিক্ আর পুকুরে যেয়ে স্নানই করুক বা বাপ মাই মরুক—সকলের আগে ও পরেই এক একবার নেচে নেওয়া দরকার। নাচ, নাচ—নাচই যদি না থাক্‌লো—

তবে থিয়েটার কি? পুরনো যাত্রার সঙ্গে থিয়েটারের পার্থক্যইতো এখানে। দেখ্‌বেন, যেখানে যেখানে নাচ আছে, সেখানে থিয়েটার কেমন জমে ওঠে। বিপিন একধারে গ্রামের নাট্যকার, গায়ক, চিত্রকর, সঙ্গীতাধ্যাপক, প্রসিদ্ধ এক্টার। মালতী গ্রাম বল্‌তে বিপিনচন্দ্রকেই বুঝায়।

নসিবন ক্ষুদ্র নাটিকা, চারি অঙ্কে বিভক্ত। মোগল বাদসাহের ওমরাহ একমন্দুল্ল্যার কন্যা ভুবনমোহিনী নসিবন যৌবন সমাগমে তার আত্মীয় মোবারক আলির প্রেমে পতিত হয়। গোপনে পিতার পুষ্পোদ্যানে উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হতো। কত জ্যোৎস্নাবিধোত রজনী তারা একে অন্যের সঙ্গে কর্ত্তন করেছে। উভয়েরই পিতা তাদের বিবাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে উদ্যোগী, এমন সময় বাদশাহের প্রৌঢ় মন্ত্রী দিলির খাঁর দৃষ্টি নসিবনের উপর নিপতিত হলো। কন্যা, মন্ত্রীর বেগম হবে, বংশের নষ্টপ্রায় সৌভাগ্য-সূর্য্য তার প্রসাদে আবার উদিত হবে, ভেবে পিতা মাতা আনন্দবিভোর। কিন্তু নসিবনের মনে সুখ নেই। দিন দিনই সে ছিন্ন লতিকার ন্যায় শুষ্ক হতে লাগ্‌লো। এমন সময় মন্ত্রীর চক্রান্তে মোবারক আলি ও মোগল সেনাপতি খাঁ জাহানালির অধীনে এক উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে দাক্ষিণাত্যে প্রস্থান করতে বাধ্য হলো। তার যাত্রার প্রাক্কালে উভয়ের আর একবার দেখা হলো—একে অন্যের ওষ্ঠে ওষ্ঠ স্থাপন করে প্রতিজ্ঞা করলো, কেহ কাহাকেও ভুল্‌বেনা; যেমন করে হোক একে অন্যকে লাভ করবেই। সে বিদায় দৃশ্য বড়ই শোকের। ইহার পর, এক গভীর রজনীতে একাকী ছদ্মবেশে নসিবন গৃহত্যাগ করলো। অনাশনে, অর্দ্ধাশনে, রৌদ্রে শীতে নানাবিধ কষ্ট পেয়ে সে প্রিয়তমের সান্নিধ্যে যেয়ে উপস্থিত হলো। সে পুরুষ,

তাতে যুবক, ততদিন অন্য রমণীর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে নসিবনকে ভুলে গেছে। তাকে সে আর গ্রহণ করলোনা বা বিবাহ করতে সম্মত হলোনা। প্রত্যাখ্যাতা হতভাগিনী তখন পাগলপ্রায় হয়ে নদীর জলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়ে সব জ্বালা নিবাইল।

কয়েকদিনের মধ্যেই নাটক অভিনীত হয়ে গেল। হাঠে বাজারে পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই বিপিনচন্দ্রের সুখ্যাতি। আমি তাদের জন্য যৎসামান্য একটু পরিশ্রম করেছিলাম, কিছু কিছু উপদেশ দিয়েও সাহায্য করেছিলাম। আমার নামও সঙ্গে সঙ্গে জড়িত হয়ে লোকমুখে কীর্ত্তিত হতে লাগ্‌লো। সকলেই একবাক্যে বল্‌তে লাগ্‌লো—এবার মালতীর কাছে দীঘলতলা সম্পূর্ণরূপে হার মেনেছে।

গ্রাম্য জীবনটা বড়ই বিশ্রী বোধ হচ্ছিল। এক্ষণে এ সকল যুবকদের সম্পর্ক এসে ও তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা উদ্যমের সাথে জড়িত হয়ে বুঝতে পারলাম—এতে ও সুখ আছে। পাড়াগাঁয়ে থাকৃতে হলে,—পাড়াগেঁয়েই হতে হবে, সহুরে-বাবু হয়ে মানের উচ্চমঞ্চে বসে থাক্‌লে চল্‌বেনা।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন হতে আমার বৈঠকখানা গ্রাম্য-যুবকগণের মিলনের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হলো। আমাকে পেয়ে যেন তারা হাতে স্বর্গলাভ করলো। যে কয়েক মাস প্রফেসারি করেছিলাম, তখনও দেখেছি, ছেলেরা আমায় ভালবাসতো। এখানেও আমি—বিপিন, যোগেশ,

বিনোদ প্রভৃতি যুবকগণ হতে তদ্রূপ—অথবা তার অপেক্ষাও অধিক ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা পেতে লাগলাম।

তার বোধ হয়, একটু কারণও ছিল। কলেজে আমি পরাধীন ছিলাম। এখানে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। হইাতে আমার আমিত্বের সমস্তটুকুই বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছিল। মানুষের হৃদয় বুঝি পুষ্পকলিকার ন্যায়ই—অনুকুল অবস্থায় ফুটে ওঠে, অবহেলায় জীবন বৃন্তের গোড়াতেই শুকিয়ে যায়।

এতদিন লোকের দিকে চেয়ে—জীবন গতি নির্ণয় করেছি। এখন যখন বাধ্য হয়ে শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নিজ-শক্তির উপর অবশিষ্ট জীবনের সুখ দুঃখের জন্য নির্ভর করতে বাধ্য হলাম, তখন আমার প্রথম লক্ষ হলো প্রাণ যা চায়,—তাই তাকে দোব, লোকের মতামতের দিকে চাইব না।

কিন্তু, কি চাচ্ছিল সে? কি? কিছুই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। হৃদয়স্থিত দেহস্থিত সমস্ত শক্তির পরিপূর্ণ দান? কার জন্য? কিসের জন্য? জীবনের এ কিসের ক্ষুধা? কাকে পাবার জন্য আকণ্ঠভরা এ তৃষ্ণা? আলেয়ার মত—ঝড়ের রজনীর বিদ্যুৎ শিখার ন্যায়,—মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে নিমেষে সে কোথায় যেয়ে আবার লুকোচ্ছিল?

পূর্ব্বাপরই দেখে আস্‌ছি, গায়ে পড়ে কিছু একটা করা, দশজনের উপর প্রভুত্ব স্থাপন—আমার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, ক্ষমতার বহির্ভূত। অন্য দিকে গৃহটী পরিপাটীরূপে সাজিয়ে গোছিয়ে রাখা, হিসাবপত্রাদি ঠিক করা, পীড়িত ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা—এ সব বিষয়ে আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। এ সকল কারণেই কলেজ কাউন্সিলের প্রীতি-ভোজন ও থিয়েটার এবং ক্রিকেট ও ফুটবল ম্যাচের ভার সমস্তই আমার উপর

ন্যায় থাক্‌তো। এমন কি কলেজ পরিত্যাগের পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত নূতন সেক্রেটারী ও ক্যাপ্‌টেন আমার নিকট বুদ্ধি পরামর্শ না গ্রহণ করে কিছু করেনি।

ভাবতে ও আনন্দ বোধ হয়, কি কলেজে কি অন্যত্র কারো সাথে আমার এ পর্য্যন্ত বিবাদ বিসম্বাদ হয় নি। হৃদয়ে অপরিসীম ধৈর্য্য ছিল, ক্রোধকে ও অনেকটা দমন করে ফেলেছিলাম। তা ছাড়া, ভালবাসা-রূপ মহাধনের অধিকারী ছিলাম যার গুণে আমি নিতান্ত পরকেও আপন করে নিতে পারতাম।

আমার হৃদয়ে আর একটী রত্ন ছিল যা বল্‌তে গেলে শয়নে স্বপনে সর্ব্বক্ষণ অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় আমায় অনুসরণ করত, সেটী সৌন্দর্য্য বোধ। বাল্যকালাবধি জগৎ আমার কাছে সৌন্দর্য্যের খনি। আকাশ, লতাপাতা, প্রাতঃসূর্য্য, পূর্ণিমার রজনী, বর্ষার বারিধারা, প্রাবীটের বৈকালের প্রলয়ঙ্কর ঝড়, শিশুর মধুর হাসি, যুবতীর মনমোহিনী মূর্ত্তি, পিতামাতার স্নেহ, ভ্রাতাভগ্নীর ভালবাসা, অকপট বন্ধুতা, যে জগতে এ সকলের সমাবেশ—সেখানে সুখের অভাব কোথায়? শত দুঃখ কষ্টের ভিতরও এ জীবন আমার কাছে উপভোগ্যও সুন্দর বোধ হতো।

ক্ষণকাল হয়তো দুঃখের ভিতর ডুবে গেছি। আবার পর মুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের স্বরূপ দেখে মুগ্ধ পুলকিত হয়েছি। এই সৌন্দর্য্যজ্ঞানই আমার জীবনের সমস্ত প্রবৃত্তি ও শক্তিকে মধ্যমালা স্বরূপে গ্রথিত করে রেখেছিল।

* * * * *

এতদিন কাজের অভাবে, আমার শক্তিসমূহ অকর্ম্মণ্যের ন্যায় বসেছিল, এখানে আসার পর তারা যেন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

কি করব, কি করব—ভাবছি, এমন সময় একটা কাজ এসে আমার ঘাড়ের উপর পড়লো।

বহুদিন হতে গ্রামের নিম্নপ্রাইমেরী পাঠশালাটী চলে আস্ছে। ছাত্রসংখ্যা প্রায় একশত কিন্তু গ্রামবাসিগণের দৃষ্টি না থাকায় আর্থিক অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

গ্রামে আগমনের মাস তিনেক পরে হঠাৎ একদিন ডেপুটী ইনস্পেক্টার স্কুল পরিদর্শনে এলেন। পূর্ব্বাপরই কর্ত্তৃপক্ষের স্কুলটীর উপর বিষ-নজর। বিশেষত রামগতি পণ্ডিতের ব্যবহারে ইনস্পেক্টার বাবু নিতান্তই অসন্তুষ্ট হয়ে হুকুম দিলেন যদি পণ্ডিতকে উঠান না হয় এবং স্কুলের আর্থিক অবস্থার শীঘ্র উন্নতি না হয়, তা হলে সরকার হতে যে মাসিক পঞ্চমুদ্রা সাহায্য দেওয়া হয়, উঠিয়ে দেওয়া হবে।

এখন, রামগতি মহেশ বসুর খ্রীষ্টানি দলভুক্ত। রাম বিদ্যাবাগীশের হিন্দুধর্ম্মরক্ষিনী দলের পক্ষে শত্রু পক্ষীয়কে বিধ্বস্ত করবার এমন সুযোগ উপেক্ষা করার লোভ পরিত্যাগ করা অসম্ভব হয়ে উঠ্লো। রামগতিকে তাড়াবার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগে গেল। ক্ষুদ্র গ্রামখানির ভিতর বেশ একটা গোলমাল বেঁধে গেল।

পণ্ডিত বেচারী উপায়ন্তর না দেখে, একদিন সন্ধ্যাবেলা ব্যাকুলভাবে আমার নিকট উপস্থিত। তার কৈফিয়ৎ আনুপর্ব্বিক শুনে বুঝ্লাম, স্কুলের অবস্থা নিতান্তই মন্দ। তবে ইন্স্পেক্টার বাবুর রাগের মুখ্য কারণ অন্যবিধ। পণ্ডিতের দুর্ভাগ্য যে তাঁর অভ্যর্থনার ভাল বন্দোবস্ত করতে পারেন নি, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে একটু অসুবিধা ভুগে গেছেন। বাল্যকাল হতে সভাসমিতি সংবাদ পত্রে পুলিসের বিরুদ্ধেই নানাকথা শুনে আস্ছি। শিক্ষা বিভাগেও যে অল্লাধিক পরিমাণে পরিদর্শক

মহোদয়গণ কর্ত্তৃক নিরীহ গ্রাম্যবাসিগণ উৎপীড়িত হয়ে থাকে,—আমার অবিদিত ছিল।

দরিদ্র পণ্ডিত যখন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে শরণাপন্ন হলো, তখন বাধ্য হয়েই তার পক্ষাবলম্বন করতে হলো। ইনস্পেক্টার বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করা—আর জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ—একই কথা। পণ্ডিতের কৈফিয়ৎ সম্বলিত একখানা দরখাস্ত তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম, স্কুলের তত্ত্বাবধানের ভার নিলাম, কিছু আর্থিক সাহায্য করলাম এবং নিজেও তাঁর নিকট একখানা পত্র লিখ্‌লাম। দেবতা শান্ত হলেন,—বৃদ্ধ পণ্ডিত সে যাত্রা বেঁচে গেল। কিন্তু,—হাতের শীকার এমন আকস্মিক ভাবে ছুটে পালালো দেখে বিদ্যাবাগীশের দল আমার উপর চটে রইলো। পূর্ব্ব হতেই তারা আমার নানাপ্রকার অখ্যাতি করে বেড়াচ্ছিল, এখন হতে সে দিকে আরও মনোনিবেশ করলো।

স্কুলের সম্পর্কে এসে, গ্রামের দিকে আমার দৃষ্টি পড়লো। সারাটী জীবন যখন বসেই কর্ত্তন করতে হবে, তখন কিছু কাজ নিয়ে থাকা মন্দ কি? শরীর এখানে আসার পর হতেই ভাল বোধ হচ্ছিল,—এখন বেশ একটু বল পাচ্ছিলাম।

সর্ব্বত্র যে সকল অভাব গ্রামে যেন এসে তাহা পুঞ্জীভূত হয়েছে। শিক্ষা নেই; স্বাস্থ্যোন্নতির কোনও বন্দোবস্ত নেই। মালতীতে থাকার ভিতর আছে—একটী পাঠশালা ও রামবিদ্যাবাগীশের স্থাপিত টোল। যত কুসংস্কারের দুর্গ এই টোলটী। সমাজের উন্নতিমূলক সকল প্রস্তাবের—জাতিভেদ দূর, বিদেশ গমন, বিধবা-বিবাহ প্রচলন—বিরুদ্ধে মূর্ত্তিমান প্রতিবন্ধক, ইহার লোপ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করি। সংস্কৃত শিক্ষার প্রদীপ দেশে প্রজ্বলিত থাক্‌—কিন্তু এভাবে

নয়। পাঠশালাটীর দ্বারা গ্রামের শিক্ষাসমস্যা কিয়ৎপরিমাণেও পূরণ হচ্ছিল না। নব্যযুবকবৃন্দের সকলেরই ইচ্ছা গ্রামে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল স্থাপিত হয়।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন যেতে লাগ্‌লো। বিপিনের সঙ্গে একদিন কিশোরীমোহন বন্দোপাধ্যায় নামে একটী অর্দ্ধবৃদ্ধ ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন। লোকটীকে পূর্ব্বে দেখি নি। তার সাথে আলাপে জান্‌তে পেলাম আমাদেরই গ্রামবাসী, এতদিন কার্য্যোপলক্ষে কন্যার গৃহে ছিলেন— আজ দুদিন হলো এসেছেন। কুলীন ব্রাহ্মণ। তিনবার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভের দুটী পুত্র ও একটী কন্যা বর্ত্তমান। তার এবং তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয়া এক্ষণেও জীবিত— তিনি পূর্ব্বাপর পিত্রালয়েই বাস কচ্ছেন। তার সঙ্গে বাঁড়ুয্যে মশায়ের কোনও সম্পর্ক নেই; দশ বছর যাবৎ উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ নেই।

বাঁড়ুয্যে মশায়ের বয়স অনুমান বছর পঞ্চাশেক। কাঁচা দীর্ঘ ধরণের চুলের ভিতর মাঝে মাঝে পাকা চুল দেখা দিয়েছে। হাল্‌কা, ছিপ্‌ছিপে লোকটী, দীর্ঘ নাসিকা, গাল অনেকটা ভেঙ্গে পড়েছে, মুখখানা লম্বা ছাঁচের, কথা বল্লে বা হাস্‌লে দন্তপংক্তিদ্বয় বের হয়ে পড়ে। সংসারে দুটী ছেলে। বড়টী কলকাতায় দোকানে থেকে কিছু উপার্জ্জন করে ও এদিক ওদিক হতে যা কিছু আসে, তা দিয়েই সংসার কোনও প্রকারে চলে যায়। তিনি যৌবনে মির আমজাদ আলির পিতার অধীনে

নায়েবের কাজ করতেন কিন্তু নায়েবী অপেক্ষা তার প্রধান কাজ ছিল—জমীদার সাহেবের মোসাহিবি। তার সঙ্গে ভারতবর্ষের এমন স্থান নেই যে ঘোরেন নি এবং এমন প্রসিদ্ধ গায়ক বা বাইজি নেই যার সঙ্গে পরিচিত হবার তিনি সুযোগ পান নি। নানা লোকের সঙ্গে মেশার দরুণ, তার বেশ একটা দৃষ্টির প্রসারতা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, জাত বিচার ও বিশেষ মানতেন না।

আমার চা পার্টিতে প্রত্যহ বৈকালেই তিনি যোগ দিতে লাগলেন। মাঝে মাঝে আমার নিকট ওমার খাইয়মের বাঙ্গালা ব্যাখা শুন্‌তেন, মোটের উপর কয়েক দিনের ভিতরই তাঁর প্রতি আমার হৃদয়ের বেশ একটু টান হয়ে পড়লো। তাঁর আগমনের পর হতে আমার চার মজলিসটী বেশ জমে উঠ্‌তে লাগ্‌লো।

শরীর ভাল বোধ কচ্ছিলাম এবং কার্য্য করবার শক্তি ও দিন দিন বর্দ্ধিত হচ্ছিল। কলকাতায় কিছুই করতে পারিনি,—এখানে থিয়েটার স্কুল ও ডাক্তরখানা প্রতিষ্ঠা—রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করা—পীড়িত লোকের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি ছোট খাটো নানাবিধ জল্পনা কল্পনার ভিতর এমন ভাবে জড়িত হয়ে পড়তে লাগলাম, যে সময় কুলিয়ে উঠ্‌বে কিনা তাই সন্দেহ হতে লাগ্‌লো।

দেখ্‌লাম, জগতে সকলেরই স্থান আছে। হৃদয়ে যার বল আছে, দেহে স্বাস্থ্য আছে এবং জগতের পৃষ্ঠে দাগ রেখে যাবার যার আকাঙ্ক্ষা আছে,—তার শক্তি উন্মেষ ও বিকাশের জন্য মহানগরী কলকাতার ন্যায় স্থান নেই। উচিত ও তার সংসারে ঝাঁপিয়ে পড়া কিন্তু যশমান অপেক্ষাও সুখ শান্তিই যার কাছে প্রেয়,—প্রকৃতির রম্যনিকেতন মালতীতে সে আগমন করুক।

এই ক্ষুদ্র গ্রামে তোমার মত লোকের ও স্থান আছে। ইচ্ছা করলে, তুমিও কিছু করে যেতে পার। লোকের জীবন পথ সরল করে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনটীও সুখে কাটিয়ে যেতে পার। অন্তত ঐ যে বাগানের এককোণে বিনা আড়ম্বরে ফুলটী ধীরে ধীরে ফুটে উঠে দর্শকের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ কচ্ছে, তার মত হৃদয় সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠে, কত লোকের জীবন সৌরভময় করে যেতে পার।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে, দুর্গোৎসবের সময় নিকটবর্ত্তী হয়ে এলো। হেমকে পূর্ব্বেই নিমন্ত্রণ করে পাঠিয়েছিলাম। সে এসে উপস্থিত হলো।

তাকে দেখে তেমন আনন্দিত হতে পাচ্ছিলাম না। এ কয়েকমাসের ভিতরই কেমন পরিবর্ত্তিত হয়ে পড়েছে। সে তেজ স্ফূর্ত্তি নেই এবং অনাবশ্যকরূপে গম্ভীর হয়েও দাঁড়িয়েছে। তার ভাবগতিক দেখে ভাল লাগ্‌ছিল না। তাই একদিন রাত্রিতে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে হেম! তোমায় যে আর বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। আসামে যাওয়ার পর হতে যে দিন দিনই দুর্ব্বোধ্য হয়ে পড়বার উপক্রম হলে। কি জানি কামাখ্যা কামরূপে বাস, কিছু হয়ে উঠ্‌লো না কি?

সে ঈষৎ ম্লান হাসি হেসে বল্ল, কই, আমিতো আমার ভিতর কোনও পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আমরা তো আর কবি নই। ইট্, চূণ, কাদা, সুরকীর ভিতরও কি প্রেমের স্থান আছে?

'স্থান যে হয়ে ও হয়ে উঠ্‌ছেনা, এই তো আশ্চর্য্য। জিজ্ঞাসা করি, বিবাহের প্রস্তাব কতদূর অগ্রসর হলো?"

সে নিতান্ত বিষণ্ণভাবে বল্ল, পত্রেইতো আভাস পেয়েছ। আবার শুনে দরকার কি?

'শুনিই না? কোন আপত্তি আছে কি? পত্রের মর্ম্ম বুঝে উঠ্‌তে পারলেম কৈ?'

'তেমন কিছুই না। তবে তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানিনা।'

'কবে তোমায় অবিশ্বাস করেছি, ভাই। আমার বড় ইচ্ছে হয়, তুমি লীলাকে গ্রহণ কর। যাই বলো, এমন মেয়ে কোথাও পাবে না। কেমন সতেজ ভাব, স্ফূর্ত্তি, কেমন তীক্ষ্ণবুদ্ধি। আমার বিশ্বাস এ সকল যখন নিজ সংসারের কাজে নিয়োজিত হবে,—তখন তা কেমন সৌষ্টব সম্পন্ন হয়ে উঠ্‌বে।'

'এসব দেখেই তো ভাই! মিষ্টার রায়ের প্রস্তাবে শেষটায় সম্মত হয়েছিলাম। লীলার ও আমার দিকে মন নুয়ে পড়ছিল—কিন্তু কয়েক মাস হতেই তার পরিবর্ত্তন দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

আমি উৎসুক-চক্ষে তার দিকে চেয়ে বল্লাম, কেন, কেন ভাই? এমন হলো।

সে ঈষৎ হেসে বল্লো,—তা কেমন করে বল্‌ব? তবে আমার বোধ হয়—

সে চুপ করলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাই! থাম্‌লে যে?

সে উত্তর করলো, না,—ও সব না বলাই ভালো।

আমি পীড়াপীড়ি করতে লাগ্‌লাম। সেও কিছুতেই বল্‌বে না।

অবশেষে অনেক সাধ্য সাধনার পর বল্ল, যদি কিছু মনে না করো, তবে বলি।

আমি বল্লাম, তোমার সে সব কোনও ভয়ের কারণ নেই।

সে প্রত্যুত্তরে বল্লো,—আমার মনে হচ্ছে—আমার বন্ধুবরই এক্ষেত্রে আমার মহাপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে বল্লাম, কি বল সর্ব্বনাশের কথা! আমি প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার? আর এমন বিষয়ে? তার চেয়ে যে আমার মরাও ভাল। হেম! তোমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বিবাহের প্রস্তাব আমার মনে স্থানও পাইনি।

'তোমার মনে স্থান না পেতে পারে কিন্তু অন্যের মন তো তোমার মত নয়। কেন তুমি গৌহাটীতে গিয়েছিলে? কেন লীলার সাথে দেখা করলে? কেন তাকে তোমার সঙ্গে আবার মিল্‌তে মিশ্‌তে দিলে? তোমাকে সুরেশ! না ভালবেসে কে পেরেছে? তুমি আসার পর হতে, সবই যেন বদলে গেছে। এক সময় ছিল যখন লীলা আমার সাথে কথাবার্ত্তা বলবার জন্য ব্যগ্র ছিল—আর এখন সে আমাকে দেখ্‌লে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। লোকে বলে, আসন্ন বিবাহ, তাই লজ্জায় নিজকে আমার কাছে উপস্থিত করতে চায় না। ওসব কিছু নয়, স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি—সে আমার থেকে দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। ভালই হয়েছে।

'ভাল কি? আমি যে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। তুমিই বা কেন তখন বিবাহে তোমার মত আছে কি না তা জানাবার জন্য আর পি রায় হতে এমন ভাবে সময় বেঁচে নিলে? তা না হলে তো তখনই সব চুকে যেতো।'

'আমি কি তাই! ইচ্ছা করে নিয়েছিলাম? ও কথাটা বের হয়েছিল মাত্র আমার জিহ্বার মুখে—কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কার প্রাণের কথা, তা কি তোমাকে এখনও বলে দিতে হবে?

'তাই কি? আমি তো এত সব কিছুই জানিনে। আমার সম্বন্ধে তুমি যা ঠিক করে নিয়েছ,—ও সকল তোমার ভ্রান্ত সংস্কার। আমি তো

তোমায় আগা গোড়াই বলে আস্‌ছি লীলাকে আমরা কেহই বুঝে উঠ্‌তে পারিনি।'

'আমি কি ভাই! এসব ঝকমারি ব্যাপারের ভিতর যেতাম; আর, পি রায় ও তাঁর স্ত্রী বড়ই পীড়াপীড়ি কর্‌তে লাগলেন। আর লীলারও তখন আর একভাব দেখেছিলাম। কলকাতা হতে আগত একটী ব্যারিষ্টার ও আর একজন ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও পূর্ব্বে বিবাহের প্রস্তাব উঠেছিল কিন্তু কই আমার প্রতি সে যেমনভাবে ব্যবহার করতো এমনতো কারো প্রতি দেখি নি। সত্যই মেয়েটী সকল বিষয়ে নূতন ধরণের।—যাক্, ভালই হয়েছে। জোড় করে মনকে কারো সঙ্গে জন্মের মত বাঁধলে, বোধ হয় শেষটায় অনুতাপই করতে হতো।

এত সব কথা হচ্ছিল কিন্তু হেমের স্বরের কোনরূপ ব্যতিক্রমই দেখ্‌ছিলাম না। কোনও দুঃখের ভাবও প্রকটিত হচ্ছিল না। দেখে শুনে মনে হচ্ছিল, বিবাহ প্রস্তাব যদি ভেঙ্গে যায়, তা হলে সে অসন্তুষ্ট নয়।

কিয়ৎকাল চুপ করে, আমি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম, শেষ কথা কি হয়ে গেছে এ সম্বন্ধে? বিয়ে কি হবে না?

'কেমন করে হবে? আর পি রায় এসব এখনো জানেন না। তবে ভেবেছি,—দুচারদিনের ভিতরই সব কথা খুলে তাঁকে পত্র লিখ্‌বো।'

কথা শুনে মনটা বিষাদপূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো। সত্যই কি, আমিই এ মহা অনিষ্টের মূল? আবার যখন মনে হচ্ছিল, হেমেরও এ বিবাহে মত ছিল না, তখন ভাবলাম, ভালই হলো। কিন্তু সে তা হলে কোথায় বিয়ে করবে? যে সমস্যাটী সহজে পূরণ হয়ে যাচ্ছিল,—তা আবার হঠাৎ কেমন জটিলভাব ধারণ করে বস্‌লো।

* * * * * *

আমরা ও আমাদের জ্ঞাতিগণ মূলত তিনভাগে বিভক্ত। প্রতিবৎসর এক এক অংশে দুর্গাপূজা হয়ে থাকে। এবার আমাদের পূজার পালা।

বংশের অনেক দিনের পূজা। তখন মুসলমান রাজত্ব, আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব—যখন আমাদের পূর্ব্বপুরুষ রতিরাম রায় এই মালতী গ্রামে এসে বসতি করেন। সে বৎসর হতেই এই দুর্গাপূজা চলে আসছে।

মালতী আগমনের পর হতেই যেন আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটে উঠেছিল এবং হৃদয়ে বল পাচ্ছিলাম। দুর্গাপূজা কি অন্য পূজার কি দরকার—আমি খুঁজে পাচ্ছিলেম না। কারো কি আর দুর্গা কালীতে বিশ্বাস আছে? না, থাকাই উচিত? নিজ ফরমাইস মত গড়া পুতুলে, মন্ত্রবলে কাল্পনিক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, তার কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করা, এও কি যুক্তিসঙ্গত? তবে মিছামিছি এত অর্থব্যয় শক্তির অপচয় কেন? এই বিজ্ঞানের যুগে একমাত্র ভগবানে বিশ্বাসই সুকঠিন—দেব দেবীতো দুরের কথা।

মাকে বল্লাম, দুর্গাপূজায় অর্থব্যয়ে আমার মত নেই। তিনি বল্লেন, তোমার যা মত, তাই করো।

নলিনীর অমত। তাও তো এ উপলক্ষ একটু আমোদ প্রমোদ হবে, লোকজন আসবে, বেশ কয়টা দিন কেটে যাবে—এমন মাঝে মাঝে দু একটু বৈচিত্র্য না থাকলে গ্রামে বাসও যে দুষ্কর হয়ে উঠবে।

বিপিনেরও সেই মত। এ সবে যে লোকের তেমন বিশ্বাস নেই,—সেও স্বীকার কর্ল্লো কিন্তু তাও তো একটা আমোদ, হৈ চৈ—বন্ধ করার কি প্রয়োজন? গ্রামের ভিতর একখানা মাত্র পূজা— তাও যদি না হয় তা হলে সকলেই কেমন নিরানন্দ হয়ে পড়বে না?

আমি বল্লাম, এ সকল কুপ্রথাকে যতদিন প্রশ্রয় দিয়ে রাখব, ততদিনই আমরা মানুষ হতে পারব না। যতদিন এসব থাকবে, পুরোহিতও থাকবে, জাতিভেদও সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে। আমোদ প্রমোদ করতে হয়, করব অন্য রকমে, মিথ্যা আদর্শের প্রশ্রয় দিয়ে নয়। আমাদের মানুষ হবার পথে যা কিছু দাঁড়াবে তাকেই আমরা সাহসে ভর করে বর্জ্জন করব।

হেমেরও সেই মত। আমি দুঃখ কচ্ছিলাম, আমরা যে এসব প্রথাকে উঠিয়ে দিচ্ছি, তার স্থলে যদি কিছু নূতন না এনে দিতে পারি, তা হলে সমাজ যে নিতান্ত নীরস কর্কশ হয়ে পড়বে। আনন্দবিহীন জাতির দ্বারা কি কোনও কাজ সম্ভব?

উত্তরে হেম যা বল্লে, তা তার মুখেই শোভা পায়। সে উত্তর করলো, ওসব বুঝি না। ভাল লাগ্‌ছে না, দেখ্‌ছি মিছে, উৎপাটন করে দূরে ফেলে দোব। অত ভবিষ্যতের চিন্তার দরকার নেই। সমাজের আকার প্রকার রীতিনীতি এত চিন্তা ভাবনা হতে কখনও উদ্ভূত হয় নি, কখন হবেও না। কেবল সকল সময়ই কি হবে কি হবে এ চিন্তাতেই অস্থির। ভাল যা মনে কর, সব সময় কর দেখি, শেষটা দেখ্‌বে ভালই দাঁড়াবে। যত কুসংস্কারের বোঝা মাথায় করে আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছি—এমন জগতে আর কে? এর জন্যই তো আমাদের এমন দশা।

অনেকে অনেক পরামর্শ দিল। কারো কথাই শুনলাম না—পূজা উঠিয়ে দিলাম। লোকমুখে কুলাঙ্গার বিধর্ম্মী উপাধিতে ভূষিত হতে লাগ্‌লাম। আমি কিন্তু মনে বেশ আনন্দ অনুভব কচ্ছিলাম।

অষ্টাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি হয়েছে। হেম আর আমি বাহিরের প্রাঙ্গনে ঘাসের উপরে ইজি-চেয়ারে বসে বসে আলাপ করছি। হেম জিজ্ঞাসা কচ্ছিল, আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

আমি বল্লাম, আমার দ্বারা ভাই! কোনও কাজই হলো না—আমার জন্ম না হওয়াই ভাল ছিল। আমার হস্তে বাবার এমন কীর্ত্তি—দোকান উঠে গেল। মাও আমার জন্যেই এমন কষ্টে পড়লেন। এখন আর কোথায়ও যেতে ইচ্ছে করে না। কেমন করে লোকের কাছে মুখ দেখাব? কলেজের সহধ্যায়ীরা কতজনে আজ কত কাজে নিযুক্ত হয়েছে, আর আমি অন্যের গলগ্রহ হয়ে পড়ে রইলাম। এক এক সময় মনে হয় মরে যাই কিন্তু তখনই আবার ভাবি—তাতেই বা লাভ কি? আর কলকাতায় ফিরে যাব না—যতদিন বেঁচে আছি—এই নির্জ্জন কোণেই সময়টুকু কাটিয়ে যাব। হাতেও টাকা পয়সা বিশেষ নাই। জায়গা জমী হতে যা কিছু পাওয়া যায়—তা দিয়ে আমাদের গ্রাসাচ্ছদন কোনও প্রকারে চলে যাবে।

হেম উত্তর করলো,—এই কি তোমার প্রাণের কথা হলো? তুমি শীঘ্রই সম্পূর্ণ ভাল হয়ে উঠবে। তোমার চেহারা এ কয়েক মাসের ভিতরই যেমন উন্নতি লাভ করেছে—তাতে আমার মনে হয়, এখানে থাকলে আর দুচার মাসের ভিতরই পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পাবে। তখনও কি তুমি এ গ্রামের ভিতরই জোড় করে নিজকে ধরে রাখবে?

আমি। কিইবা করব? ব্যবসা? তা কি আমার দ্বারা হবে? চাকরীও আমার ভাল লাগে না। ঠিক বল্‌তে কি হেম! আমার সব সময়ই মনে হয়—এমন একটা কিছু করি যাতে আমার প্রাণের ক্ষুধা মিটে—যার পরিপূর্ণতায় আমার হৃদয়খানি সম্পূর্ণরূপে ভরে ওঠে।

হেম উৎফুল্ল হয়ে বল্লো, বেশ তো—যে দিকে মন যায়, সে দিকেই তাকে যেতে দাও না। তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাও—অন্য কারো দিকে কিছুর দিকে চেও না, একেই তো আমি মানুষের জীবন মনে করি।

'কি যে সে কাজ তাতো আমি বুঝ্‌তে পারছি না। তবে এটা বুঝছি তা চাকরী নয়। আর এটাও যেন দেখ্‌ছি—কোদাল দিয়ে মাটী কেটে তাতে যখন দুচারটী শস্য বপন করি বা পীড়িত ব্যক্তির দেহের উপর হাতখানা বুলাই—তখন যেন তার সান্নিধ্যের সন্ধান কিছু কিছু পাই। জননীর ক্রন্দন সর্ব্বক্ষণ আমার কর্ণে এসে পৌঁছছে—দুর্ব্বলের হৃদয় হতে, অশিক্ষিতের অন্ধকারাচ্ছন্ন কুটীর হতে, ম্যালেরিয়া ওলাউঠাগ্রস্ত রোগীর শয্যা হতে—তাঁরই শোকের বাষ্প উত্থিত হচ্ছে। ইচ্ছা করে আমার যা কিছু আছে—আমার দেহ, আমার শক্তি,—আমার ভালবাসা ভরা হৃদয়, সব বিলিয়ে দেই—বাতাসে আলোতে মিশে সকলকে সঞ্জীবিত করে তুলুক। এই মালতী গ্রাম—অন্যের চক্ষে ক্ষুদ্র সামান্য কিন্তু আমার কাছে—ইহার মহত্বের সীমা নেই। এখানে এসে—আমি আমার প্রাণের পরিচয় পেয়েছি। কোথায় যাব ভাই? আর কি করব ভাই? যে কয়দিন বেঁচে আছি—এখানেই কাটিয়ে যাব।

হেম। যাই বল গ্রামের ভিতর কি মানুষ এখনকার দিনে থাকতে পারে? যত বিবাদ বিসম্বাদ, পরশ্রীকাতরতা, মূর্খতা সব যেন সহর থেকে পালিয়ে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। শেষে ভাই! বিরক্ত হয়ে

পড়বে। আর দেশের কথা বল্‌ছো? এ দেশ কি কখনো মানুষ হবে?

আমি। ভাই! এত সব প্রাণের ক্রন্দন কি মিছে যাবে? যাক্‌—তাতে ও দুঃখ নেই। কিন্তু আমার আর কোথায় ও যেতে ইচ্ছে করেনা। গ্রামে বিবাদ বিসম্বাদ যথেষ্ট আছে—কিন্তু তা হতে কি কিছুতেই সরে থাক্‌তে পারবনা? গ্রামই যত কুসংস্কারের দুর্গ, আধিব্যাধির লীলাভূমি—হোকনা ইহাকে কেন্দ্র করেই নূতন আশার বাণী প্রচার।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

শরীরটা এখন বেশ ভাল বোধ হচ্ছে আজ যেন কোনও গ্লানির ভাবই নেই। ধন্য মালতী! জয় মালতী!

কি ভাবে জীবনটা কর্ত্তন করব? হেমের সাথে আলাপের পর হতে—কথাটা মনের ভিতর বড়ই যেন উঁকিঝুঁকি মারছে।

একটী বিষয় ইচ্ছা করেই এতদিন বলিনি, সরোজ মরতে মরতে বেঁচে গেছে। এখন সে মিষ্টার বোসের গৌরবান্বিতা পত্নী। নলিনী সে দিন তার পত্রের কিয়দংশ আমায় পাঠ করে শোনাচ্ছিল, তাতে তাদের প্রাসাদ তুল্য বাটী, তার মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার, গাড়ী ঘোড়া দাসদাসী ঐশ্বর্য্যের কত কথাই ছিল।

নলিনী তার সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ কচ্ছিল কিন্তু আমি দেখ্‌ছিলাম, যে এত বড় দীর্ঘ পত্রে—তার স্বামীর কোনও উল্লেখ নেই। অর্থ কি?

সে যাক্। তার স্মৃতি হৃদয় হতে উন্মূলিত করে উঠিয়ে ফেলে দিয়েছি। পর-স্ত্রীর চিন্তা—লজ্জার বিষয় নয় কি? তার হৃদয়ের কথা যখন ভাবছিলাম তখনই মনে হচ্ছিল—নিতান্তই সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র। আমি যা চাচ্ছিলাম সে আবেগ কৈ, ভাবের বিপুলতা কৈ? এ হেন রমণীর সঙ্গে মিশে—আমিও কি শেষে অল্পেতেই নিঃশেষ হয়ে যেতাম না? ভালই হয়েছে—সরোজকে না পেয়ে।

কিন্তু তখনই আবার তার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি হৃদয়-পটে ভেসে উঠলো। কেমন মধুর! সত্যই বোস, তুমি ভাগ্যবান। কিন্তু তুমি তো জান্‌লেনা—এ হেন রত্নকে প্রকৃতভাবে আদর যত্ন করতে। মূল্যবান পরিচ্ছদও হীরক হারেই কি সব সময় প্রাণের পিপাসা মেটে?

আমার ভবিষ্যৎ পথ বড়ই অস্পষ্ট বোধ হচ্ছিল। মালতীতেই কি জীবনটার সমস্ত অংশ কাটিয়ে যাব? সে জীবনটাই বা কেমন দাঁড়াবে? লেখা পড়া শিখে শেষে কি সামান্য গণ্ডগ্রামের ভিতর এসে,—ইচ্ছা করে আমি অসফলতাকে বরণ করে নোবো? কিন্তু সে সময়ই মনে হচ্ছিল—সফলতাই বা কি, অসফলতাই কি? ধন, মান, প্রতিপত্তিতে কি দরকার? আমার হৃদয় রূপ গোলাপপুষ্পটী যে আলোও বাতাসের ভিতর পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠবে,—সে জীবনই কি গ্রহণীয় নয়?

আচ্ছা, হেম ও লীলার বিবাহ প্রস্তাব এতদূরে অগ্রসর হয়ে—ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হলো কেন? উপক্রমই বা বলি কেন? হেমের কথাতে স্পষ্টইতো বোঝা গেল, ভেঙ্গেই তো গেছে। কেন এমন হলো? সত্যই কি আমাদের গৌহাটী গমনের সঙ্গে—এ সব ব্যাপারের কোনও সম্বন্ধ আছে? সেখান হতে আসার পূর্ব্বে কয়েক দিনের লীলার ব্যবহার কেমন সুন্দর, সংযত, নারী-হৃদয়ের কোমলতায় কেমন মধুর!

আমার দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে তার নয়নযুগল কেমন ছল ছল করে উঠ্‌তো, সঙ্গে সঙ্গে গণ্ডস্থল একবার লজ্জায় আরক্তিম আবার শ্বেত-শুষ্কভাব ধারণ করতো? সত্যই কি সে আমায় ভালবাসে? যে দিন আমি পীড়িত হয়ে পড়েছিলাম, সে-দিন যে ভাবে সে আমার সেবা-শুশ্রূষা করেছিল, তার স্মৃতিটী এখনো আমার হৃদয়ে মাঝে মাঝে ঘুরে বেড়ায়। সেই আমার পার্শ্বে বীজন হস্তে উপবিষ্টা ম্লানময়ী মূর্ত্তি, ক্ষণে ক্ষণে আমার প্রতি স্নেহসিক্ত দৃষ্টি, আমার আরোগ্য লাভের জন্য তার ব্যাকুলতা ও চিন্তা। যৌবনপুষ্পিতা তার দেহলতিকা এবং ভাবে-ভরা তেজ-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তার প্রাণ।—কে জানে, কে বল্‌বে,—কার প্রাণের সাথে মিশাবার জন্য—নিজ আবেগ ভরে নিজ পথে সে চলেছে?

হেমও আমার কাছে—এতদিন পরে সম্পূর্ণরূপে দুর্জ্ঞেয় হয়ে পড়ছে। লীলার সাথে যদি তার মিলন হতো তা হলে ভালই হতো। কিন্তু, কৈ লীলার প্রতি তার কোনও প্রকার প্রাণের টানইতো দেখ্‌লাম না? তবে বিবাহের প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল কেন? এখন যেন বোধ হচ্ছে—আর, পি, রায়ের আগ্রহাতিশয্য ও অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করতে না পেরেই সে স্বীকার করতে উদ্যত হয়েছিল। লীলাও যেমন অপরূপ-রূপা, তাতে তার প্রতি আকৃষ্ট না হওয়াও কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

নলিনীকে নিয়েও বড় বিপদে পড়িছি। যতদিন কলকাতায় ছিলাম—ততদিন তেমন বিশেষ কোনও গোলমাল ছিল না কিন্তু মালতী আগমনের পর হতেই তার ব্যবহারের ভিতর কত পার্থক্য দেখা দিয়েছে। এখানে অহরহই অন্যান্য রমণীদের সম্পর্কে এসে,—বৈধব্যজীবনের ভীষণত্ব ও বর্ত্তমান জীবনের তুলনায় তার বৈষম্য ও বিসদৃশতার ভাবটী তার চোখের সম্মুখে দিন দিন ধরা দিচ্ছিল। পূর্ব্বেই বলেছি—এখানে

আসার কয়েকদিনের পর হতেই দেহে অলঙ্কার ধারণ সে পরিত্যাগ করেছে। তার বলয়বিহীন হস্ত দেখ্‌লে আমার প্রাণের ভিতর কি এক বজ্রদাহন উপস্থিত হয়—কিন্তু কি করব, কোনও দিকেইতো পথ দেখছিনা।

একদিন তাকে কথা প্রসঙ্গে বল্‌ছিলাম,—আয় না নলিনী, তুই আর আমি গ্রামের শিক্ষার সুবন্দোবস্ত করি—আমি ছেলেদের শিক্ষা দোব, তুই মেয়েদের পড়াবার ভার নে।

সে তদুত্তরে ম্লানস্বরে বল্লো, না দাদা, আমায় কিছু করতে বলো না। কাকে শেখাব? কি শেখাব? মা যতদিন বেঁচে আছে, তাঁর সেবা করবো, তার পর যেখানে হয় এক জায়গায় নির্জ্জনে যেয়ে পড়ে থাক্‌বো। কেন দাদা! আমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিলে?

সে জলভরা চক্ষু নিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল। তার শেষ কথা কয়টীর ভিতর হতে প্রাণের কি গভীর ক্রন্দন ধ্বনি আমার কর্ণে এসে পৌঁচ্ছিল। সত্যিই আশা-আকাঙ্ক্ষা-বিহীন হিন্দুবিধবার পক্ষে জ্ঞানার্জ্জন—বিষপান। সে বিষে আজ নলিনীর মন-প্রাণ জর্জ্জরিত। প্রাচীন মুনিঋষিগণই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমান ছিলেন। যার পক্ষে ভবিষ্য জীবন ব'লে কিছুর ব্যবস্থা নেই, গৃহ প্রাচীরের চতুঃসীমার মধ্যেই যাকে সারাটী জীবন কর্ত্তন করতে হবে—তার হৃদয় কেন জ্ঞানালোকে প্রজ্বলিত করে তোলা, আকাঙ্ক্ষা বীজ উন্মীলিত হবার সুযোগ দেওয়া? মূর্খতাও অন্ধকারই তার প্রকৃষ্ট সাথী।

সে দিন সন্ধ্যায় নলিনীর কক্ষের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—এমন সময় দেখ্‌লাম, সে বিছানায় পড়ে আছে। আমার পদ শব্দ শুনেই উঠে দাঁড়ালো। দেখলাম,—চোখের জল তখনও শুকায় নি। সে কাঁদছিল।

কেন? জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলোনা; তাকে নিয়ে এ ভাবে কতদিন আর কর্ত্তন করব?

তার ব্যবহারের এই প্রকার পরিবর্ত্তন দেখে, মা ও বোধ হয় চিন্তান্বিত হয়ে পড়ছেন। এক এক সময় নিজ হতে বলে ওঠেন—চল বাবা, আমরা এখান হতে চলে যাই। তোমার শরীরটা আর একটু ভাল হলেই—কলকাতায় ফিরে যাব।

সেখানে এখন যাবই বা কেমন করে? বাড়ীটা এক বছরের জন্য ভাড়া দিয়েছিলাম। কলকাতায় যেয়ে অন্য বাড়ীতে উঠতে মন সরছিল না।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

আরো কয়েকদিন চলে গেল। লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের দিন। সন্ধ্যার পরক্ষণ। আকাশে সুন্দর চাঁদ দেখা দিয়েছে। ফুলের গন্ধ নিয়ে জ্যোৎস্না গায় মেখে বাতাস ধীরে ধীরে বইয়ে যাচ্ছে। বাঁড়ুয্যে মশায় ও বিপিন এই মাত্র চলে গেছে।

হেম ও আমি চা-পান শেষ করে পত্রিকার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছি। নলিনী টেবিল হতে চা-পানের সরঞ্জাম নিয়ে কক্ষান্তরে চলে গেল।

হেমের আজ শেষ রাত্রিতে যাবার কথা। এতদিন আমিই যেতে দিই নি, আর রাখা চলেনা। তার আসন্ন-গমনে হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে উঠছিল।

বসে আছি—এমন সময় মা সে কক্ষে প্রবেশ করলেন ও সম্মুখস্থ চেয়ারে উপবেশন করলেন। দু একটী কথার পর, তিনি দুঃখব্যঞ্জক

স্বরে বলে উঠ্‌লেন, তোমাদের বাবা আমি বুঝে উঠ্‌তে পাল্লুম না। সুরেশের তো এই শরীর—কখন যায়, কখন থাকে। এখন প্রাণে প্রাণে বেঁচে থাক্‌লেই মঙ্গল। ভেবেছিলুম, তুমি বিয়ে করবে, দেখে সুখী হব, এখন শুন্‌তে পেলুম, সব কথা না কি ভেঙ্গে গেছে—তোমার নিজের ও নাকি মত ছিল না। বেশ রোজগার কচ্ছ,—গাড়ী ঘোড়া করেছ, বয়স হয়েছে—এখন যেখানে হয় একখানে বিয়ে কর। তুমি একবার হাঁ বল, আমি সুরেশকে দিয়ে হোক বা যেমন করে হোক মনের মতন বৌ ঘরে আনি।

হেম কিছুই উত্তর করলনা। কেবল এক হাতের ভিতর আর একহাত মোচড়াতে লাগ্‌লো। শেষে মার বারংবার পীড়াপীড়িতে বল্লো, মা! মাপ কর,—আমি বিয়ে করবো না।

তার ভাবগতিক দেখে মা আর কোনও প্রশ্ন করতে সাহস করলেন না। কেবল একবার দুঃখভারাক্রান্ত স্বরে বল্লেন, যা ইচ্ছে তোমাদের, আমার সাধ অপূর্ণ রয়ে গেল—এই যা।

এমন সময়, নলিনী দ্বারের পার্শ্বে এসে ডাক্‌লো, মা! এদিক পানে একবার এস। হেম্‌দার জলখাবার কি কি যাবে, দেখে যাও। সরকার মশায়কে বলে দাও, লোকজন ও নৌক ঠিক রাখতে।

'যাই মা' বলে তিনি চলে গেলেন।

তখন কেবলমাত্র নীরবতা সেই কক্ষে বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লো। চারিদিক নির্জন—কেবল দেয়ালের গায় ঘড়ীটী টিক্‌ টিক্‌ কচ্ছে। এমন নির্জন যে আমি হেমের নিশ্বাস প্রশ্বাস শুন্‌তে পাচ্ছি। আমি একবার তার দিকে একবার অন্তর্দিকে দৃষ্টি কচ্ছি। বাইরে জ্যোৎস্নালোকে আকাশ প্রান্তর অদূরস্থিত নীরা হাস্‌ছে। কেমন একটা প্রীতি ও উদাসের ভাব মিশ্রিত হয়ে প্রাণের ভিতর জেগে উঠ্‌ছিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল এ ভাবে চলে গেল—শেষটায় যেন অসহনীয় হয়ে উঠ্‌ছিল। আমি হেমের দিকে লক্ষ্য করে ডাক্‌লাম, হেম!

কি? কেন?—এই দুইটী মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে সে আমার দিকে চেয়ে রইলো। তার সে দৃষ্টির ন্যায় এমন গভীর বিষাদে ভরা এমন স্নেহ প্রীতিতে মিশানো দৃষ্টি আর দেখিনি।

এমন সময় নলিনী সে কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা কর্‌লো, দাদা! হেমদা কটার সময় যাবেন সরকার মশায় জান্‌তে চেয়েছেন। সে অনুসারে নৌকা ঠিক রাখবেন।

দেখলাম, তার দর্শনে হেমের নয়নদ্বয় অকস্মাৎ কেমন এক বিমল-জ্যোতিতে বিকশিত হয়ে,—আবার পূর্ব্বাপেক্ষাও বিষাদভাব ধারণ কর্‌লো। নলিনীর বদনকমলও কেমন লাজের ভাবে আরক্ত হয়ে উঠলো। ক্ষণেক, তারপর তাহাও ম্লান ভাব ধারণ কর্‌লো।

হেম উত্তর কর্‌লো, তিনটার সময়।

নলিনী চলে গেল।

সেই মুহূর্ত্তে কেমন করে হঠাৎ আমার এতদিনের দ্বিধা ছুটে গেল। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম, হেম! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, ঠিক্ মন খুলে উত্তর দেবে কি ভাই?

হেম। কি কথা? যদি দেবার হয়,—অবশ্য দোব। তোমার কাছে ভাই! কবে কোন্ কথা গোপন করেছি? তুমি তো আমার সবই জান।

আমি। সত্যিই কি তাই ভাই? সত্যিই কি আমাকে তোমার সব কথা জান্‌তে দিয়েছ?

সে নিরুত্তর হয়ে রইলো।

আমি বল্লাম, বল দেখি ভাই! একটা কথা কি আমার কাছে আগাগোড়াই গোপন করে আসনি?

ধীরে ধীরে মাথা উঠিয়ে সে উত্তর কর্‌লো, তবে তো ভাই! জানই। আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? আমি কোন্ সাহসে কোন্ মুখে তোমায় বল্‌ব?

এত দিনের যা কিছু সন্দেহ ছিল, নিমেষে উড়ে গেল। তখন আমি তাকে পরিষ্কার করে জিজ্ঞাসা কল্লাম, সত্যিই কি তুমি নলিনীকে স্ত্রীস্বরূপে গ্রহণ করবে? যদি তাই তোমার মনোগত ভাব, এতদিন তবে খুলে বল নি কেন?

সে আবার কাতরভাবে বল্ল, কেমন করে বল্‌বো, ভাই? মা কি ভাববেন,—মনে করে আমার লজ্জায় মাথা কেটে যায়।

যাক্, সে জন্যে তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই—এই বলে আমি কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলাম।

মার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ হলো। দেখ্‌লাম তিনি সব জানেন। এ যেন জানাশোনা বিষয়কে গোপন রাখার মত। নলিনীকেও ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলাম। লজ্জায় তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌লো ও আনন্দে চক্ষুদ্বয় চক্ চক্ করতে লাগ্‌লো।

ঘণ্টা দুই পরে, যখন মা ও আমি সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করলাম, তখনও হেম সেখানে পূর্ব্বাবস্থায় আকাশের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে বসে আছে।

মা এসে তাকে পদধূলি ছোঁয়াইয়া আশীর্ব্বাদ করলেন ও বল্লেন,—বেঁচে থাক তোমরা দুজন, আমার মনের অনেক দিনের গুরুভার চলে গেল—ভগবানের আশীর্ব্বাদে তোমাদের সুখেই দিন কাট্‌বে। আমার আশীর্ব্বাদ বৃথা যাবে না।

আমি সরকার মশায়কে ডেকে বল্লাম, হেমের আজ ও যাওয়া হলোনা—নৌকা ও লোকজন বিদায় দিন। নলিনীকে ডেকে বল্লাম, জল খাবার যা তৈর হয়েছে তা আমাদের জন্য লাইব্রেরী ঘরে যেন রেখে আসে—আজ রাত্রিতে আর কিছু খাওয়া হবে না।

স্নেহময়ী ভাগিনী! তুমি চলে গেলে, এ বিজন পুরীতে কেমন করে দিন কাটাব? তাও ভগ্নী, সুখী হও তুমি। তোমার মত এমন যাতনা কে পেয়েছে? জীবনের একটী মহাদুঃখ মহাভ্রান্তি যে সংশোধিত হতে চল্লো—ইহা ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিলাম।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

তার পর দিন, নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনাতেই অতিবাহিত হলো।

প্রথম কথা হলো, হিন্দু না ব্রাহ্মমতে বিবাহ হবে। হেম এবং আমি ধর্ম্ম সম্বন্ধে উভয়েই উদারনৈতিক। আমি তো নাকি নাস্তিকই। আমার মত—না হিন্দু না ব্রাহ্ম মতে। তবে হেম ও নলিনীর ইচ্ছা একটা সমাজকে আশ্রয় করে থাকা ভাল। হিন্দু সমাজে থাকা অসম্ভব, তাই তাদের মত ব্রাহ্ম পদ্ধতিতে বিবাহ।

তাই হলো। সে দিনই আমি কলকাতায় কাকা বাবুকে পত্র লিখে পাঠালেম। ফেরৎ ডাকেই উত্তর এলো। ঠিক-হলো—কার্ত্তিকের পনর তারিখে কলকাতাতে বিবাহ হবে।

যখন সমস্ত ঠিক হলো, তখন আমি বিবাহের শুভ প্রস্তাবের বিষয় গ্রামে প্রচার কল্লাম। বারুদের স্তূপে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিপতিত হলো।

যারা বৃদ্ধ তারা গালে হাত দিলেন—কলকাতা হতে কি সব অনাচারই দেশে এসে পড়্‌লো! যুবক দলের ভিতরও অধিকাংশ বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হয়ে দাঁড়ালো। আর স্ত্রীলোকদের তো কথাই নেই; নানাজনে নানাপ্রকার মিথ্যা অপবাদ রটনা করতে লাগ্‌লে।

হেম ইতিপূর্ব্বেই চলে গিয়েছিল।

প্রাতে বসে বিপিন ও বাঁড়ুয্যে মশায়ের সাথে চা-পান কচ্ছি,—এমন সময় দেখলাম, রাম বিদ্যাবাগীশ ও চন্দ্র ঘোষ পুরোহিত শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী সহ উপস্থিত। পার্শ্বস্থিত চেয়ারে উপবেশন করতে করতে বিদ্যাবাগীশ বল্‌তে লাগ্‌লেন—এ সব কি শুনছি সুরেশ? আমি এতদিন বাড়ী ছিলাম না, এসে শুনে অবাক্।

আমি ধীর ভাবে বল্লাম, যা শুনেছেন—সবই ঠিক্।

বিদ্যাবাগীশ। কোন্ মহাত্মার পুত্র তুমি, মনে পড়ে কি? আজ যদি দীন বাবু বেঁচে থাকৃতেন, তিনি কি এ সকল অনাচারের প্রশ্রয় দিতেন?

আমি। কি-সে অনাচার হলো?

বিদ্যাবাগীশ। বিধবার বিবাহ—কোন্ হিন্দুশাস্ত্র সঙ্গত?

আমি। কেন, বিদ্যাসাগর কি বুঝিয়ে দেন নি? আর প্রাচীন-কালের হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া কি জগতে অন্য শাস্ত্র নেই? নূতন মতে কি হিন্দুশাস্ত্র আর গড়ে উঠ্‌তে পারে না? ধর্ম্ম কি অচল? হিন্দু জাতির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্ম্ম ও সময়ানুসারে কি নূতন রূপ ধারণ করতে পারে না?

বিদ্যাবাগীশ। বিদ্যাসাগর! কেই বা তার মত গ্রহণ করেছে?

আমি। বিদ্যাসাগর ভুলই করেছিলেন বটে, যুক্তির উপর স্থাপিত না করে, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করে।

শাস্ত্র কি ? কতকগুলির লোকের মন-গড়া মত বইতো নয় ? আমি কেন তাকে মেনে চল্‌বো ?

"মনুকে কি তোমার মানবার মত লোক বলে বোধ হল না ?"

'আপনি ব্রাহ্মণ, আপনি মান্‌তে পারেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া কি অন্য হিন্দু নেই ? আমি কেন মানব ? যে লোকটা দ্বিজাতি ব্যতীত অন্য লোকের জ্ঞানচর্চ্চার বিরোধী তাকে মেনে চল্‌ব আমি ? বলেন কি ?'

'একটু সুর নামিয়ে বিদ্যাবাগীশ বল্লেন, সমাজের প্রতি কি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নেই ? কত মেয়ের যে একেবারেই বিয়ে হচ্ছেনা,— এমত অবস্থায় বিধবার আবার বিয়ে কেন ?'

'এমন তো কত পুরুষের ও বিয়ে হচ্ছেনা কিন্তু তার জন্য কাঁদেকাটে কে ? দরকার ও নেই তার ? পুরুষের বিয়ে করা না করা তার স্বেচ্ছাধীন। স্ত্রীলোককেও স্বাধীন করে দিন না—ইচ্ছা হয় বিয়ে করবে, ইচ্ছা হয় করবে না। তাদের বেলা কেন জুলুম কচ্ছেন—জোড় খাটাচ্ছেন ? বালিকা বয়সে যখন তারা কিছু বোঝেনা জোড় করে বিবাহ দিচ্ছেন ; আর যে বিধবা হচ্ছে তাকে বিবাহ করতে বাধা দিচ্ছেন। কেন ? পুরুষের এ ক্ষমতা কে দিয়েছে ? হিন্দু সমাজ রমণীর প্রতি অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, চিরকাল তাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে চল্‌ছে। এমন সমাজে আমার দরকার নেই।

'ব্রাহ্মদের ভিতর যে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরেও অনেক মেয়ের বিয়ে হয় না—কই তাতে তো তোমরা কিছু বল না।'

"বল্‌ব কেন ? বিবাহ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর আপনারা জোড় করে মেয়েদের বিয়ে দেন—জোড় করে তাদের বিবাহে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। এতে আপনি পুরুষ, আপনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা,

আপনি যত বার ইচ্ছা বিয়ে করতে পারেন, আর রমণী একবারের বেশী স্বামী গ্রহণ করতে পারে না। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষও একবারের অধিক বিবাহ করতে পারবেনা এ নিয়ম প্রবর্ত্তন করুন দেখি। পুরুষের অত্যাচারে তারা ঘরের বের হতে পারে না, লেখা পড়া শিখ্‌তে পারে না, আঁধারের ভিতর তাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। এ সব বন্দোবস্তেরও আবার বাহাদুরী নিচ্ছেন।"

'রমণী ব্রহ্মচর্য্য করুক।'

'আপনি কেন করেন না? সে করবে না করবে—তার জন্য আপনার কেন মত নেবে?' 'কে আপনাকে এমন তাদের উপর প্রভুত্ব করবার ক্ষমতা দিয়েছে? কেন সে আপনার হুকুম শুনে চলবে?' অনেকক্ষণ তর্কবিতর্ক করে—রাম বিদ্যাবাগীশ উঠবার জন্য দাঁড়ালেন। যাবার পূর্ব্বে আমাকে উদ্দেশ করে বল্লেন, যাই কর সুরেশ! ভেবে চিন্তে করো, এ গ্রাম দেশ, সহর নয়।

তিনি নিজে বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করেছিলেন। সে বিষয়ে ইঙ্গিতে উল্লেখ করে বল্লাম,—আপনার মত লোকের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের বক্তৃতা করে বেড়ান শোভা পায় কি? আপনার মত লোকের ভ্রূকুটীকে বিন্দুমাত্রও ভয় করাকে আমি মহাপাপের কার্য্য মনে করি।

চেয়ে দেখ্‌লাম মালতী গ্রামে আমার পার্শ্বে দাঁড়াতে প্রস্তুত এমন দুটী মাত্র লোক রয়েছে,—বিপিন আর বাঁড়ুয্যে মশায়। তিনি আমাকে বারংবার উৎসাহ দিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, যে কাজ কচ্ছ তোমারি ভাই উপযুক্ত। যোগ্য পিতার—যোগ্য পুত্র। আমার বয়স এই পঞ্চাশে পড়েছে—দাঁত পাঁচ ছয়টা পড়ে গেল—একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটা বিয়ে কল্লেম, ঘরে দু ছেলে বর্ত্তমান—নাতনাতিনী

রয়েছে—তাও দু চারটা বিয়ের প্রস্তাব আস্ছেই। আমি হরিশ ঘটককে বলি,—যদি তোমার এমন ইচ্ছেই হয়ে থাকে ছেলেদের ধরনা? সে বলে, এখনকার ছেলেগুলোর কথা বল্‌বেন না, তারা কি কারো কথা শোনে? না কৌলীন্যের মর্য্যাদা বোঝে? আপনার এমন বয়স কি, বিয়ে করলে বুড়ো কালটা সুখে কাটিয়ে যেতে পারবেন। আর এমন কচি মেয়ে তার বিয়ের কথা বল্লেই সকলে চীৎকার করে উঠ্‌বে, ধর্ম্ম রসাতলে গেল। যত শাস্ত্র কেবল কচি মেয়েদের বেলা। আমি বলি, তোর যখন বৌ মরেছিল, তখন ব্রহ্মচর্য্য ছিল কোথায়? তুই ব্যাটা পঞ্চাশ বছর বয়সের বিদ্যাবাগীশ, তুই আবার বিয়ে করিস কোন্ মুখে? না ভাই সুরেশ! তুমি ওসব কথা শুনোনা! যে কাজে হাত দিয়েছ—এ অতি সৎকাজ, মানুষের মত কাজ। আমি আমার বোনটীর দিকে যখনই তাকাই, বুক ফেটে যায়। ওদের কথা শুনোনা, কিছুতেই শুনোনা।

এই বলে তিনি চার পেয়ালায় মুখ দিলেন এবং একটু পান করেই বিপিনের দিকে চেয়ে বল্লেন, তোমার কি মত হে বিপিন ভায়া?

সে বল্লে,—দাদার যে মত। আমার দিকে চেয়ে বল্ল, সুরেশ দা! আপনি কোনও চিন্তে করবেন না। কয়েক দিন লোকগুলো কল্লা করবে, তার পর সব মিটে যাবে।

বাঁড়ুয্যে মশায় দন্তপাটি বিকশিত করে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, দাও দেখি সুরেশ ভায়া, আর এক পেয়ালা। ইংরাজ কি মজার জিনীষই দেশে এনেছে!

বিপিন হেসে উত্তর করলো, চা—চার কথা বলছেন? সে দিন কে যেন বল্‌ছিল, চা ভারতবর্ষের মুক্তির উপায়।

বাঁড়ুয্যে মশায় চা-র পেয়ালায় মুখ দিতে দিতে বল্লেন, তা আর বল্‌তে? না হে সুরেশ ভায়া! তুমি কোন চিন্তা করোনা। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি—এ কাজে তোমার মঙ্গল হবে। ও সব ভ্রুকুটীতে ভয় পেও না। বোনটী আজ কি চা-ই বানিয়েছে।

*　　*　　*　　*　　*

কয়েক দিন পরে, মাও নলিনীকে নিয়ে কলকাতায় রওয়না হলাম। সঙ্গে বিপিনও বাঁড়ুয্যে মশায় চল্লেন।

আমার হৃদয় যুগপৎ আনন্দও ভয়ে উদ্বেলিত হচ্ছিল। যাবার পূর্ব্বে পাঠ গৃহে প্রবেশ কর্‌লাম। সেখানে দেয়ালের গায় বিলম্বিত পিতৃদেবের মূর্ত্তিকে উদ্দেশ করে প্রণাম কল্লাম। পাঁচ বছর হয়, তিনি চলে গেছেন, কিন্তু এমন দিন যায় নি যখন তাঁর মঙ্গলময় হস্ত জীবনের সর্ব্ববিধ ঘটনার ভিতর দেখ্‌তে পাই নি। আজ ও যখন তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করে দাঁড়ালাম, তখন স্পষ্ট মনে হলো, তিনি বল্‌ছেন, যাও বাবা! যাও মা। আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি একাজে শুভ ছাড়া, কখনো অশুভ হবে না।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কলকাতায় এলাম। পূর্ব্ব বন্ধুবান্ধব, কাকা কাশী বাবু,—মাষ্টার বসন্ত বাবু,—মামা বিনয় বাবু—অনেকের সঙ্গেই দেখা হলো। সকলেই আমার স্বাস্থ্যোন্নতি দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন এবং ভবিষ্যতে কি করব জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। আমি সঠিক কোনও উত্তর দিতে পারলাম না—কারণ এ পর্য্যন্ত আমি কিছুই ঠিক করে উঠ্‌তে পারছিলাম না।

উপরওয়ালার সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় মাষ্টার মশায় চাকরী হতে অবসর গ্রহণ করার সঙ্কল্প করেছেন। কথা প্রসঙ্গে বল্লেন,—নূতন হেডমাষ্টার ঘনশ্যাম বাবুর সঙ্গে আমার বনিবনাও হচ্ছে না। লোকটা ভারি ধর্ম্মের ভান্ করে বেড়ায়—এ দিকে চরিত্রটা নিতান্ত বিশ্রী। ভণ্ড তপস্বী! আমি একদিন জ্ঞানদায়িনী সভায় ঈদৃশ ভণ্ড সাধুদের সম্বন্ধে একটু বলেছিলাম, তার পর থেকে বাবু আমার উপর চটে আছেন। তার বিশ্বাস আমি তাকে উদ্দেশ করেই বলে ছিলাম। এখন বলে কি না, ছেলেরা আমার উত্তেজনায়, তাকে মারবার চেষ্টায় আছে। তুমি করবে বদমায়সি—আমার হলো দোষ। তা যাক্ চাকরী—আমার দ্বারা মিছে খোসামদ করা হবে না।

আমি তাকে উদ্দেশ করে বল্লাম, মাষ্টার মশায়, কোনও চিন্তা করবেন না। মুখে যেই যত বলুক—আপনার কেশাগ্র স্পর্শ করতে কারো সাহস হবে না।

আমাদের আগমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বেই আর পি রায় সপরিবারে কলকাতায় আগমন করেছিলেন, আলাপে জান্তে পারলেম, তারে বড় সাহেব এখন কলকাতায় আছেন,—তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। আরো বল্লেন—কলকাতা কর্পোরেশনের ভিতর একটা বড় চাকরী খালি আছে। দেখি কিছু করা যায় কি না?

আমি বল্লাম, তা হলে তো ভালই হয়।

তিনি উত্তর কল্লেন,—ভালো বলে ভালো, মাইনের তো কথাই নেই, সেখানে পেতাম সাত শ—এ কাজে মাইনে হাজার। তা ছাড়া আসামের জঙ্গলও আর ভাল লাগে না। দেখা যাক যেভাবে হবস্ সাহেবকে ধরেছি—কিছু না করে ছাড়্ছি নে।

কথা প্রসঙ্গে শেষটায় লীলার কথাও এসে পড়্‌ল। তিনি বল্লেন,—লীলাকে নিয়ে মহা গোলমালেই পড়া গেছে। কিছুতেই সে বিবাহে সম্মত নয়। আমরা ভাবছিলাম—হেমের সঙ্গেই বিয়ে হবে—কত জল্পনা কল্পনা কচ্ছি, এমন সময়, সে অকস্মাৎ জানালো—তার মত নেই। কয়েকদিন পরে হেমেরও তদ্রূপ মত জান্‌লেম। এর জন্যই বোধ হয় সে সময় চেয়ে নিয়েছিল। তারপরও দুই একটী প্রস্তাব উঠেছিল—কোথায়ও তার মত হলো না। এখন তো সে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভাবই ধারণ করেছে। বলে কি না,—এ জীবনে বিয়ে করবেই না। কারো পরাধীন হয়ে থাক্‌তে তার ইচ্ছা নেই। এখন দেখ্‌ছি, মিশনারীদের হাতে মেয়েটাকে দিয়ে মাটী করেছি। শেষটা কোথায় যে কি দাঁড়ায়, ঠিক কি?

কথা শুনে, দুঃখও হলো এবং বল্‌তে কি মনের নিগূঢ় প্রদেশে বেশ একটু আনন্দও অনুভব কচ্ছিলাম। কেমন লীলার নির্ভীক স্বাতন্ত্র্য-ভাব।

আলাপ কর্‌তে কর্‌তে,—নলিনীর বিবাহের প্রস্তাবের কথা তার কাছে খুলে বল্লাম। শুনে তিনি কতক্ষণ চুপ করে রইলেন এবং শেষে বল্লেন,—বেশ ভালই হয়েছে।

কথা বল্‌ছি, এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হতে লীলা এসে উপস্থিত। আমাকে দেখে, একটু থমকিয়ে দাঁড়ালো এবং একটু আশ্চর্য্যের ভাব প্রকাশ করে হেসে বল্লো, বা! আপনি কোথেকে? শরীর এখন ভাল হয়েছে তো? সে-বার আপনাকে যেমন দেখেছিলাম,—তাতে এত শীঘ্র যে আরোগ্য হবেন, মনে করে নি। মাসিমা এসেছেন তো—আর সই নলিন?

আর পি রায় হেসে বল্লেন, তারা তো এসেছেনই কিন্তু কেন এসেছেন, জান কি? শুন্‌লে অবাক্ হবে।

লীলা আমার দিকে চেয়ে ব্যগ্রভাবে বল্ল—কি সুরেশ বাবু! কি সংবাদ? কোনও নূতন আছে কি?

মিষ্টার রায়। নূতন বলে নূতন—নলিনীর বিবাহ—হেমের সাথে।

লীলা অসীম আশ্চর্য্যের ভাব প্রকাশ করে বল্লে,—সত্যিই?

আমি ঘাড় নেড়ে সংবাদ সত্য বলে জানালে, সে যেন ক্ষণকালের জন্য বিমর্ষ ভাব ধারণ করলো। তার পর উত্তর করলো, বেশ তো—খুবই সুসংবাদ। সুরেশ বাবু! এ এমনি একটা কাজ আপনি করলেন, যার জন্য লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আপনার উপর চতুর্গুণ বেড়ে যাবে। কি কষ্টেই না নলিন দিন কাটাচ্ছিল? আর হেম বাবু,—তিনিও বেশ লোক।

বলতে বলতে তার মুখ লজ্জায় কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠ্‌লো, এবং 'যাই মাকে এ সুসংবাদ দেই' বলে—সে বাটীর ভিতর চলে গেল।

আমিও আরো কিয়ৎকাল অপেক্ষা করে—স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

সে দিনই বৈকালে—তার মাকে সঙ্গে করে লীলা আমাদের গৃহে এসে উপস্থিত। নলিনীর সন্দর্শনে ভাবতরঙ্গে তার হৃদয় উচ্ছলিত হয়ে উঠ্‌ছিল। তাকে লক্ষ্য করে বল্‌তে লাগ্‌লো, বেশ হলো—আমি স্বপ্নের ঘোরে মাঝে মাঝে যে আশার ছবি আঁকতাম—তাই আজ জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করতে চল্ল। কিন্তু নলিন! তুমি ভাই আমায় এতদিন জানাও নি কেন? তা হলে—আমি কত সুখী হতেম।

আলাপ হচ্ছে—এমন সময় প্রকাণ্ড এক জুড়ীগাড়ী এসে গৃহের সম্মুখে দাঁড়াল এবং তন্মুহূর্ত্তেই পশ্চাৎ অনুগামী দাসীসহ—একটী যুবতী কক্ষে প্রবেশ করলো। তাকে দেখে নলিনী যেয়ে ঝাঁপিয়ে তার বক্ষে পড়লো এবং আনন্দভরে বল্‌তে লাগ্‌লো—সরোজ! সরোজ! তোমায় যে এমনভাবে দেখ্‌তে পাবো তা তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

সরোজ সুন্দরী—তাতে নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত হয়ে ও সুশ্রী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধানে—তাকে কেমন চিত্তাকর্ষণীয়ই না দেখাচ্ছিল। তার হাস্যতরঙ্গে কক্ষ বিকম্পিত হচ্ছিল। এমন ভাগ্যবতী কে ?

কিন্তু এ কি ? আমার দিকে চাইতে,—তার বদন এমন বিমর্ষ ভাব ধারণ করলো কেন ? আমাকে উদ্দেশ করে ধীরে ধীরে বল্ল, এখন কেমন আছেন ? মাঝে নাকি আপনার শরীর বড়ই খারাপ হয়ে পড়েছিল।

লীলা উত্তর করলো—তা কি আর বল্‌তে ? ভগবানের অসীম দয়া —তাই এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন। হাঁ সুরেশ বাবু ! আপনাদের মালতী জায়গা তো বেশ—আমাদের একবার দেখাবেন না ?

আমি দেখে উত্তর কল্লাম, তা কি আপনাদের পছন্দ হবে ? পঁচা জল,—মশা মাছি জঙ্গল—দুদিনেই অস্থির হয়ে পড়তে হবে।

লীলা হেসে বল্ল,—হতে পারে কিন্তু আপনাদের সকলেরই চেহারার দিকে চেয়ে তো মনে হচ্ছে না যে সে জায়গা নেহাৎ অপছন্দ হবে। সে যাক্—শুনেছ তো সরোজ ! নলিনীর সংবাদ ?

সরোজ। শুনেছি বৈ কি ? তার জন্যই তো আসা। এখন সেই বাবুটী কোথায় ? তিনি যে গোপনে গোপনে এতদিন ধরে এমন একটা ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন—তাতো জানতুম না।

বল্‌তে না বল্‌তে—হেমও কক্ষান্তর হতে সেখানে এসে দেখা দিল। তাকে দেখে লীলা মুখ নত করে সরে দাঁড়ালো। সরোজ হেসে বল্লো,—কি হেম বাবু ! এসব কি শুনি ? সত্যিই কি ?

হেম হেসে উত্তর করলো—সত্যি কি মিথ্যে আপনারাই বল্‌তে পারেন।

অনেকক্ষণ আলাপ সালাপের পর যে যার গৃহে চলে গেল। হাস্য তামাসার ভিতর সন্ধ্যাটী কেটে গেল।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শনিবার রজনীতে বিবাহ— সোমবার হতে মা বিষম জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁকে নিয়ে আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। নলিনী ও লীলা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করতে লাগ্‌লো। মামা বাবুর চিকিৎসায় প্রথম প্রথম অনেকটা উপকার দেখা গিয়েছিল—কিন্তু বুধবার হতে পীড়া আবার বিষম আকার ধারণ করলো। প্রবল জ্বর—তার উপর বক্ষ বেদনা—ডাক্তারগণ নিমোনিয়ার আশঙ্কা করতে লাগ্‌লেন। আমাদের সাধ্যমত চিকিৎসার কোনও ত্রুটী হলো না, কলকাতার সর্ব্বপ্রধান ডাক্তার সাহেবকেও আনা হলো—তিনিও ঘাড় নেড়ে আশঙ্কার ভাবই প্রকাশ কল্লেন।

বৃহস্পতিবার প্রাতে যেন একটু ভাল দেখা গেল। জ্বরের প্রকোপ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে এলো, জ্ঞানেরও পূর্ণসঞ্চার হলো। সে দিন ভোরবেলা চক্ষুরুন্মীলন করেই তিনি আমায় উদ্দেশ করে বল্লেন,—বাবা! বিয়ের কি করেছ? সব যোগাড় ঠিক্ তো?

আমি উত্তর করলাম, বিবাহ আপাতত বন্ধ রয়েছে। তুমি মা! ভাল হও—তার পর ওসব বন্দোবস্ত করা যাবে। হেম তো আমাদের পর নয়—দুদিন বিলম্বে কি হবে?

তিনি অর্দ্ধভগ্ন কণ্ঠে বল্লেন,—না বাবা! তুমি ছেলেমানুষ, বুঝছ না। বিয়ে সোজা ব্যাপার নয়—কখন কি হয় বলা যায় না। তারিখ পরিবর্ত্তন যেন কিছুতেই না হয়।

নলিনী কাঁদ কাঁদ ভাবে বল্ল, না মা! তুমি ভাল না হলে—ওসব কিছুই হবে না।

মা বল্লেন,—না বাছা! তুমি বুঝ্তে পাচ্ছ না। এ প্রাণে যে এত দিন কত সয়েছি—তা কে জানে? প্রাণটী মা! পুড়ে ছাই হয়ে গেছে! না মা! আপত্তি করো না, আমি যাবার আগে তোমায় সুখী দেখে যাই।

হেমকে ডেকে বল্লেন, বাবা! আমার প্রাণের সাধ যেন অপূর্ণ না থেকে যায়! বাল্যকালাবধি তোমায় দেখে আস্‌ছি—তোমার হাতে নলিনীকে দিয়ে গেলে আমি নিশ্চিন্তভাবে মরতে পারবো।

হেম উত্তর করল, ওসব কথা মা! তুমি কি বল্‌ছ? কোনও ভয় নেই। তুমি মা! শীঘ্রই ভাল হবে এবং তার পরই বিবাহ হবে। মা বল্লেন,—না বাবা! আমার কথা তুমি কখনো অমান্য করনি—আজও করো না। তোমাদের মঙ্গল হবে।

*   *   *   *   *   *

তাঁর উপদেশ মতই কাজ হলো। শনিবার রজনীতে সমাজ মন্দিরে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গেল। মাকে ফেলে—বিবাহ সভায় উপস্থিত থাক্‌তে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্ছিল। ঘণ্টা খানেকের ভিতর, শুভ বিবাহ ব্যাপার নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়ে গেল। এক বিষাদের গুরুভার সমবেত সকলকেই প্রপীড়িত কচ্ছিল। লীলা ও সরোজের মাঝে দাঁড়িয়ে নলিনী বিষাদের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপে শোভা পাচ্ছিল। কিয়ৎকাল পরে, আমরা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করলাম।

হেম ও নলিনী এসে মাকে প্রণাম করলো। তিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করে—কাঁদ কাঁদ ভাবে বল্‌তে লাগলেন,—আজ আমার অনেকদিনের সাধ পূর্ণ হলো। দেখো বাবা! দেখো মা! আমার আশীর্ব্বাদে সুখেই তোমাদের জীবন যাবে। আমি কাল রাত্রিতেও

স্বপ্নে দেখেছি, তিনি এসে আমায় এ কার্য্য শীঘ্র শেষ করতে বলছেন: এখন তোমরা বাবা, মা—আমার কাছে এসে বসো—আমি দেখে সুখী হই।

তৎপরে, তারা নতজানু হয়ে তাঁকে প্রণাম করলে—তিনি অতিকষ্টে শয্যার উপর উপবেশন করে তাদের মস্তকোপরি হস্ত স্থাপন করে বল্লেন—আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখে থাকো—তোমাদের জীবন মধুময় হোক—ভগবান তোমাদের দীর্ঘজীবী করুন।

আর বিশেষ কিছু বল্‌তে পারলেন না। তিনি বড়ই অসুস্থ বোধ করতে লাগ্‌লেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বল্‌তে প্রাণ বিদরিয়া যায়—আমার মা নেই! যে রজনীতে বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হলো—তার শেষভাগেই তাঁর প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়ে গেল। বিনা মেঘে আবার বজ্রাঘাত হলো! মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আমাকে উদ্দেশ করে বল্লেন, বাবা সুরেশ! তোমায় ভাসিয়ে চল্লেম। আমি তাঁর কাছে গেলুম, কয়দিন যাবৎ তাঁরই স্বপ্ন দেখ্‌ছি। তিনি আমায় ডাক্‌ছেন—আর আমার সংসারে থাকা হবে না। নলিনীর জন্য চিন্তা ছিল—তা দূর হয়েছে। তোমার জন্য তেমন চিন্তা করি না—তুমি পুরুষ, কিসের ভয় বাবা? তোমাকে সংসারী দেখে যেতে পাল্লুম না—এই মনে দুঃখ রয়ে গেলো। এ বিষয়ে যা তুমি ভাল মনে করো—

ক'রো, তোমার মত পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানের দিন দুঃখে যাবে না। আরো যেন কি বল্‌তে যাচ্ছিলেন কিন্তু বল্‌তে পারলেন না।

তাঁর অন্তর্ধানে সংসার শূন্য বোধ হতে লাগ্‌লো। আমার যে কেহ রইলোনা—কার বুকে যেয়ে বিপদের দিনে আশ্রয় নোব? কিন্তু তখনই আবার মার শেষ কথা শেষ আশীর্ব্বাদ কর্ণে বেজে উঠ্‌লো—পুরুষ মানুষ—কিসের চিন্তা, কিসের ভয় আমার?

* * * * *

এ কয়দিন লীলা আমাদের গৃহেই মাতৃদেবীর শুশ্রূষার কর্ত্তন করেছে। এমন সেবাতৎপরা রমণী বিরল। কেমন তার পীড়িতের প্রতি স্নেহে কোমল ব্যবহার, সুসংযত মিষ্টি বাক্যাবলী—যত্ন। পীড়িত হওয়ার পর হতে তাকে মার শয্যা পার্শ্বে সর্ব্বক্ষণই উপবিষ্ট দেখ্‌তাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তার দিকে চেয়ে মুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। এক সময় ভাবতাম, তার মনে দয়া প্রেমের লেশমাত্র নেই,—সংসার হতে সম্পূর্ণ স্বাধীন নির্ম্মুক্ত ভাবে জীবন পরিচালনাতেই তার আনন্দ তৃপ্তি। কিন্তু পূর্ব্বে আমার পীড়ার সময় এবং এক্ষণে দেখ্‌তে পেলাম—রমণী সকল অবস্থাতেই প্রেমময়ী, স্নেহময়ী। যতই কেন তুমি স্বাধীনতার গুণ গেয়ে না বেড়াও—তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে জননীর ক্রন্দন সর্ব্বক্ষণ অনুরণিত হচ্ছে—সে কি তোমার জগতের এক কোণে একাকী জীবন অতিবাহিত কর্‌তে দেবে? সংসারের চারিদিক হতে যে অহরহ দীন দরিদ্র পীড়িত শোকার্ত্তের অশ্রু উচ্ছ্বসিত হচ্ছে—তুমি নারী! তুমি যদি তোমার স্নেহার্দ্র হস্তে অপসারিত না কর—তা হলে, এ জগৎ যে নিতান্তই মরুভূমিতে পরিণত হবে, জীবন্ যে নিতান্তই দুর্ব্বিষহ হয়ে উঠ্‌বে!

পীড়িতাবস্থায় মাকে প্রায়ই দেখতাম দৃষ্টিবদ্ধ করে লীলার দিকে চেয়ে আছেন। এক দিন লীলা জিজ্ঞাসা কচ্ছিল—কিছু চাই কি মাসিমা?

মা তদুত্তরে বল্‌লেন—কিছু চাইনে মা। আর কিছু নয়, শুধু তোমার দিকে চাচ্ছিলুম,—আর মনে কত কথা জাগ্‌ছিল। তুমি হেসে খেলে দিন কাটিয়েছ—লোকে বল্‌তো তোমার মা ও বল্‌তো—তুমি মায়ামমতাশূন্য, স্বার্থপর। এখন দেখ্‌ছি—আমাদের সব ভুল, সব ভুল। তোমায় যতই দেখছি ততই মনে হচ্ছে—তুমি এজগতের নও, স্বর্গের। আর এক জন্মে বুঝি মা! তুমি আমার মা ছিলে—তা না হলে,—আমার প্রতি এমন ভালবাসা তোমার কোথা হতে এলো?

লীলা কোনও উত্তর না দিয়ে মার দিকে একবার বিষণ্ন ভাবে চেয়ে শেষে চক্ষু অবনত করে, তাঁর সেবায় নিযুক্ত হলো।

আর একদিন মা অর্দ্ধতন্দ্রাবেশে তাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছিলেন, তুমি মা! এত দিন কোথায় ছিলে? এস মা! আমার ঘরে এসো! নলিনী চলে যাচ্ছে—তুমি এসে তার স্থান অধিকার করবে না কি?

মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস আমায় ডেকে বল্লেন,—খোকা! নলিনীকে যা অলঙ্কার দেবার, তা দেওয়া হয়েছে,—তার জন্যে আর দুঃখ করি নে। আমার যা কিছু অলঙ্কার সব লীলাকে দিয়ে গেলুম। তৎপরে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্লেন—গ্রহণ করো মা! গ্রহণ করো। আমাদের সে দিন নেই, কপাল দোষে সব হারিয়েছি। এক্ষণ যৎসামান্য যা কিছু আমার ছিল—তাই তোমায় দিয়ে গেলুম। পুরনো ধরণের জিনীষ—হয়তো তোমার এখন মনোমত হবে না। তা নূতন করে গড়িয়ে নিও। তোমার মাসিমার মরণ-উপহার—গ্রহণ করো মা। তা না হলে, আমার প্রাণে শান্তি পাবে না। নলিনী ও তোমাতে আমি কোনও পার্থক্য দেখ্‌তে পাচ্ছি না। দীর্ঘজীবী হয়ে বেঁচে থাক তোমরা।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মাসেক পরে হেম ও নলিনী আসামের দিকে চলে গেল।

তখন হতে আমি সম্পূর্ণ একাকী জীবন যাপন করতে লাগ্‌লাম। কি যে কর্‌ব, কিছু ভেবে উঠ্‌তে পারছিলাম না। জীবনে কখন যে কিছু একটা করব, নির্দ্দিষ্টভাবে মনে স্থান পায় নি কিন্তু তাও মেঘঘন আকাশপ্রান্তে বিজলীর ন্যায়, মাঝে মাঝে কি যেন কিসের কাহার ছবি হৃদয়কোণে ফুটে উঠে বিলীন হয়ে গেছে। কার রক্তচরণ স্পর্শে—মন প্রাণ নেচে উঠ্‌ছে। কিন্তু, আজ সবই আঁধার, জীবনটা নিতান্তই অসার এবং অস্তিত্ব উদ্দেশ্যবিহীন বোধ হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল—জীবনপটে এতদিনকার হিজিবিজি লেখার ভিতর দিয়ে—যে দুই চারিটী বোধ্য পঠনীয় অক্ষরের সমাবেশ হচ্ছিল, সমস্তের উপর অকস্মাৎ বোতলভরা কালি পড়ে গিয়ে, এক মুহূর্ত্তে সব কালিমাময় করে সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য করে তুল্লো।

পৌষের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আস্‌ছে। আমি আমার পাঠকক্ষের জানালার পার্শ্বে একাকী বসে বসে ভাব্‌ছি। এই স্থানটীতে বাল্যকালে বসে কত কি সুখের কল্পনা করেছি—মাঝে মাঝে তার মোহন ছবি দেখে আনন্দভরে তন্ময় হয়েছি। বাবা, মা, আমাদের দোকান ব্যবসা, বাল্যকালের সহপাঠিগণ—সব কোথায়? কে ভেবেছিল—জীবন এমন ভাব ধারণ করবে? দীপ্তিময় চাকচক্যময় গীতবাদ্য-নুপুর-নিক্কন মুখরিত নাট্যশালা—অকস্মাৎ স্তব্ধ ভাব ধারণ করেছে! আবার জগতের দিকে চেয়ে দেখলাম,—বাল্যবন্ধুগণ মধ্যে কতজন কত ভাবে প্রাণ মন সঁপে দিয়েছে। আমি যখন জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতায় উপলখণ্ড

নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত ছিলেম,—তখন তারা লক্ষ্মীকে করায়ত্ত করবার জন্য কতভাবে যত্ন ও চেষ্টা করেছে। কেহ সাগর ডিঙ্গিয়েছে—কেহ দূর দেশান্তরে চলে গেছে—ক্ষুদ্র বৃহৎ সুখের ভিতর নিজ নিজকে ডুবিয়ে দিয়েছে। আর আমি? আমি কি করেছি? কিন্তু তখনই আবার মনে হচ্ছিল, করেই বা কি লাভ? সবই তো দুদিনের।

দুদিন? দুদিনেরই বটে। কিন্তু, এ দুদিনের খেলার ভিতর মেতে থাকাতেইতো সুখ—পরিতৃপ্তি। অসারতা নশ্বরতা, এসব ভাবের চর্চ্চা করে জীবনকে অসার করে তুলব? কি মহত্ত্ব তাতে? কি সুখই বা তাতে? ঘৃণ্য কুকুরের জীবন-যাপন, ইহাও কি লোভনীয়?

বসে বসে নানা কথা ভাব্‌ছি। অন্ধকারে ভরা নির্জনতাটী ক্রমে ক্রমে বেশ উপভোগ্য বোধ হয়ে উঠ্‌ছিল। এমন সময়, নীচে দরজার সম্মুখে স্ত্রীলোকের কণ্ঠ ধ্বনি শুন্‌তে পেলাম এবং কতকটুকু পরেই, লীলা তার মাকে নিয়ে গৃহে প্রবেশ করলো। সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য গয়ানাথ আলো নিয়ে দেখা দিল। আমাকে উদ্দেশ করে লীলা বল্ল—কি সুরেশ বাবু! একা একা আঁধার ঘরে বসে কি কাব্যচর্চ্চা কচ্ছেন? যেমন দেখ্‌ছি—আঁধারটী যেন আপনার দিন দিনই বড় প্রিয় হয়ে পড়ছে। এর ভিতরই কি জীবনের খেলা সাঙ্গ হবে?

কথাটী সাঙ্গ না হতেই লীলার মা প্রতিবেশীনি অন্নদার পিশিমার সহিত আলাপ কর্‌তে কক্ষান্তরে চলে গেলেন। লীলা এসে কক্ষের এক কোণায় স্থাপিত চেয়ারে উপবেশন করলো।

ঈষৎ ম্লান-হাসি হেসে আমি বল্লাম,—মন্দই কি? আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক—আঁধার আমাদের নিত্য সনাতন;—আলোতে কি দরকার, অনভ্যাস বশত পেঁচকের ন্যায় তাকি অসহ্য হবে না?

লীলা। পাড়াগাঁয়ই কি মন্দ স্থান? আলো কি কেবল সহরের অলিগলির ভিতরই নেচে বেড়াচ্ছে? আপনার হৃদয়ের ভিতর যে আলো জ্বল্‌ছে—তাই যদি সম্যক পরিস্ফুট হয়—সমস্ত আলোময় হয়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও বেঁচে যাব।

অঞ্জি। কোথায়, কোথায় আলো? আমি তো কিছুরই সন্ধান পাচ্ছিনে। আঁধারেই আরম্ভ—তাতেই অন্ত।

লীলা। সবার সম্বন্ধেই কি তাই? তাই যদি হতো, তা হলে কি সংসারে বাস সম্ভবপর হতো? খেলোয়াড়দের চেয়ে দর্শক যেমন গুটীর চাল চলন দেখে ভাল—তেমনি অপনাকে অন্যে যেমন দেখ্‌তে পাচ্ছে, নিজে তেমন পাচ্ছেন না। আলোর সন্তান আপনি—আপনার ললাটে সেই জ্যোতির ভাতিই বিকশিত হচ্ছে—যার কল্যাণে আমাদের পুঞ্জীভূত আঁধার ও একদিন দূর হয়ে যাবে।

আমি উত্তর করলাম,—মাপ করবেন, আপনার এসব অত্যুক্তি। আমি যে অসার অকর্ম্মণ্য।

লীলা উৎসাহের ভাবে উত্তর করলো,—বলেন কি? বলেন কি? নিজের প্রতি এমন ধিক্কার, এমন গ্লানির ভাব—এ যে মহাপাপ। এই যে লোকমত অগ্রাহ্য করে, নলিনীকে বিবাহ দিলেন—এতেও কি প্রাণের পরিচয় আপনি পান নি? এই যে—আপনি জাতিমান ভুলে, সকলের সঙ্গে মিশবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছেন,—এত কি আপনার অনন্যসাধারণত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না? কারই বা আপনার ন্যায় রমণীর স্বাধীনতার প্রতি এমন উদার প্রশস্ত ভাব, কার এমন স্নেহভরা প্রাণ?

তার কথা শুন্‌লে আমার প্রাণের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত যে বিস্ময়ে আনন্দে ভয়ে কেঁপে ওঠে!

বলে কি লীলা এসব ? সত্যই কি তবে তার প্রখর নারীদৃষ্টির কাছে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল যেমন ভাবে ধরা পড়েছে,—এমন আমার নিজের কাছেও পড়েনি ? না,—এ শুধু স্তাবক-বাণী ? দেবতার প্রতি ভক্তের অর্ঘ্য ? কিন্তু, আমি কি দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত হবার উপযুক্ত পাত্র ? লীলার মনোগত ভাব কি ?

বেশ ভালই লাগ্‌ছিল—এমন সময় কথার ধারা বদলিয়ে সে বল্ল, কবে যাচ্ছেন মালতীতে ?

আমি। আসে রববার।

লীলা। ভবিষ্যতে কি করবেন—কিছু ঠিক করেছেন কি ?

আমি। কিছুই না। মালতীতে যাব—সেখানে স্কুলটী স্থাপন কর্‌তে হবে; তার পর গ্রামের স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা কর্‌তে হবে, রাস্তাঘাটগুলি যাতে ভাল হয়—তার দিকে দেখ্‌তে হবে; আর সঙ্গে সঙ্গে দীন দরিদ্রকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুল্‌তে হবে; পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের ও লেখা পড়ার বন্দোবস্ত করতে হবে; চাষবাস করে এবং অন্য উপায়ে নিজ উদরান্নের যোগাড়ও করতে হবে;—এ সব করতে অনেক দিন চলে যাবে—হয়তো বা শেষে নির্জ্জন মালতীর নির্জন কক্ষে অথবা বিদেশে কোন হোটেলে একাকী জীবনান্ত হবে, আর হয়তো এ জীবনে আপনাদের সাথে দেখা হবে না। বল্‌তে বল্‌তে আমি স্পষ্ট অনুভব করতে লাগলাম, ভাবাবেশে স্বর গাঢ় হয়ে আসতে লাগ্‌লো। একটু অপেক্ষা করে বল্লাম, সত্যিই সংসারের সাধারণ ধনমানে যাতে লোক সকল ডুবে আছে আমার প্রাণের ক্ষুধা মিট্‌বে না। এত দুঃখ, এত ক্রন্দন, হাহাকার, অনাহার, কদর্য্যতা, মলিনতা, অপরিচ্ছন্নতা,—মনে হচ্ছে আমার হৃদয় শতদল এর ভিতর ফুটে উঠে ও উঠ্‌ছে না কিন্তু তাও

বুঝতে পাচ্ছি—এ স্থানই আমার স্থান। কুসংস্কার, অলসতা, দরিদ্রতা, পীড়া,—এসব হতে কবে সম্পূর্ণ মুক্ত হবো? কবে, মানুষকে ভাই বলে আলিঙ্গন দিতে শিখ্‌বো? নারী-মর্য্যাদার প্রতি সম্যক সম্মান দেখাতে পারবো? রমণীকে তার পূর্ণ অধিকার পূর্ণ স্বাধীনতা দান করতে পারবো? কবে সংসারকে সার মনে করে—অর্থে সামর্থ্যে সম্পদে পূর্ণ করে তুল্‌তে পারবো? আমার যা আছে তাই যথেষ্ট, আর যে স্থানটীতে আমার বাস—তার চারিদিকটুকু যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জ্ঞানের শুভ্র আলোকে সজ্জিত করে তুল্‌তে পারি তাই যথেষ্ট, এতেই বুঝি আমার প্রাণের তৃষ্ণা মিট্‌বে।

লীলা উত্তরে করলো, কতলোকের সহিত সাক্ষাৎ হলো, এমন ভাবে তো কাকেও বল্‌তে শুনিনে। আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।

এর পরে আরও অনেকক্ষণ আলাপ হলো। ক্রমে নলিনীর নিকট হতে যে সে শেষ পত্র পেয়েছে, তার সম্বন্ধে ও আলাপ হলো। স্বামী প্রেমে বিভোরা নলিনীর পত্রগুলি কেমন মধুর!

*   *   *   *   *

আজ রাত্রিতে মালতীর দিকে রওয়না হব। আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ শেষ করে এসেছি। প্রাতে আর পি রায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাঁর চাকরী এখনও জুটে ওঠে নি—ছুটী ও সেই কারণে বর্দ্ধিত হয়েছে।

গৃহে প্রবেশ করব, এমন সময় দেখলাম, লীলা জনৈক ভৃত্যকে ভৎর্সনা কচ্ছে। তার চক্ষুদ্বয় ক্রোধে রক্তবর্ণ, নাসিকাদ্বয় বিস্ফারিত, কুঞ্চিত ভ্রূর মাঝ হতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে, তার এমন ভাব তো ইতিপূর্ব্বে কখনো দেখিনি। এ যে সংহার মূর্ত্তি!

আমার দর্শনে সে একটুও লজ্জার ভাব প্রকাশ করলোনা বরং আমাকে উদ্দেশ করে একটু জোড়ে বলতে লাগলো, এই বেয়ারাটাকে নিয়ে কি মুস্কিলেই পড়া গেছে। ওর কাজ কর্ম্মের ভিতর, প্রাতে টেবিল চেয়ারগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা আর জিনীষ পত্র গুছিয়ে রাখা। কিন্তু কোন দিনই ও কাজ ভাল করে করবে না। আপনি এসে পড়লেন—নচেৎ ওকে বেতিয়ে বাড়ী হতে বের করে দিতুম। আমার কথা না শুনে এ বাড়ীতে থাকবে? (বেয়ারার দিকে লক্ষ্য করে গম্ভীর ভাবে বল্ল) নিকলো তোম্ হিঁয়াছে—আভি নিকাল যাও।

সে বেচারী অনেক কাঁকুতি মিনতি করলো—কিন্তু কিছুতেই লীলার দয়া উদ্রেক করতে পারলোনা। ড্রয়ার হতে তার মাহিনার হিসাবের খাতাটা বের করে, মাহিনার টাকা কয়টা সম্মুখে ঝনাৎ করে ফেলে দিয়ে, সে আবার তাড়স্বরে বল্লো—নিকালো ঘরছে—নিকালো। সে তাও আবার দয়া ভিক্ষা কচ্ছিল। এমন সময় লীলা, ডাকলো, দ্বারোয়ান। কথা মাত্রই সে এসে উপস্থিত হলো। তখন তাকে উদ্দেশ করে লীলা বল্লো, ওই ভীখন বেয়ারাকো টুটী ধরকে ঘরছে আভি নিকাল দেও। বেয়ারা উপায়ান্তর না দেখে গৃহ হতে নিস্ক্রান্ত হয়ে গেল। অনেকক্ষণ পর লীলা পুন সাম্য ভাব ধারণ করলো।

কাণ্ডকারখানা দেখে, কেমন একটা ঘৃণার ভাবে হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগলো। রমনী কোমলাঙ্গী মৃদুভাষিণী মিষ্টহাসিনী, তার সঙ্গে এ প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তির সমাবেশ—কি বিসদৃশ! সে দিব রজনীতে যে দেবী আমার নয়ন সম্মুখে বিভাষিত হয়ে উঠেছিল, যে দয়াবতী স্নেহ পরায়ণা অশ্রুসিক্তা মধুরা নারীমূর্ত্তি মাতৃদেবীর শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্টা দেখেছিলাম, এক মুহূর্ত্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

প্রকৃতস্থ হয়ে চেয়ারে উপবেশন করতেই আমি আমার আসন্ন বিদায়ের কথাটী উল্লেখ করলাম। তা শুনে যেন সে বড়ই ম্রিয়মান হয়ে পড়লো। আমার দিকে কাতর নয়নে চেয়ে বল্লো, এত তাড়াতাড়ির কি দরকার? আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করুন না।

কিন্তু আমার অপেক্ষা করার উপায় ছিল না। বাঁড়ুয্যে মশায় সহ বিপিন অনেক দিন হয় মালতীতে ফিরে গেছে। আমার অনুপস্থিতে স্কুলের কাজ কর্ম্ম সব স্থগিত হয়ে আছে—বারংবার সে কথাই বিপিন লিখ্ছিল। আর বিলম্ব শোভা পায় না। এবার যেতেই হবে।

লীলার অকস্মাৎ কেমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল। আবার সেই স্নেহময়ী নারী মূর্ত্তি! অনেক কথাই হলো। বিদায়কালীন বল্ল,—যাচ্ছেন, যান। আর কি দেখা হবে না? আজ আপনার কথা ভাব্তে—কষ্ট বোধ হচ্ছে, মা নেই,—দুটী অন্ন তৈয়ের করে সম্মুখে ধরবে এমন লোকটীও নেই। পীড়িত হলে যে ঔষধটুকু দেবে এমনই বা কে আছে? যদি কখনো প্রয়োজন হয়, সংবাদ দিতে ক্রুটী করবেন না।

ক্রমে তার স্বর গাঢ় হয়ে এলো, চক্ষুদ্বয় ছল ছল কর্তে লাগ্লো।

আরও কিয়ৎকাল অপেক্ষা করে,—মিষ্টার রায় ও তার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে বিষণ্ণ-প্রাণে আমার নির্জ্জন গৃহে ফিরে এলাম।

থেকে থেকে লীলার কথাটীই মনে হচ্ছিল। কোমলে, কঠোরে, মাধুর্য্যে, কদর্য্যতায় কেমন অভিনব। কদর্য্য? আমারই যে দৃষ্টি ভ্রম! জীবন কি শুধু কাব্যের ছিন্নাংশ নিয়েই গঠিত? গদ্যের ও কি তাতে সমাবেশ নেই? প্রকৃত পক্ষে লীলাই তাদের সংসারের এক্ষণ কর্ত্রী কিন্তু কেমন তার কঠিন শাসন। দাস দাসী সকল কেমন আজ্ঞাবহ। তার গৃহটী কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—জিনীষ পত্রগুলি কেমন পরিপাটী রূপে সজ্জিত। এমনই কি হওয়া উচিত নয় রমণীর এবং সঙ্গে সঙ্গে পুরুষেরও?

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মালতীতে ফিরে এলাম। গ্রামে পা দিতেই বাঁড়ুয্যে মশায় এসে হেসে বল্লেন, সুরেশ! যা ভেবে ছিলাম, তাই। আমাকে ও বিপিনকে একঘরে করার যোগাড় হচ্ছে।

আমি বল্লাম, বেশ তো, আমি আপনি বিপিন—তিনজনেই দল পাকান যাবে। কি বল হে বিপিন?

সে তাচ্ছিল্য ভাব প্রকাশ করে বল্ল, আপনিও ভাল, এ সবের তোয়াক্কা আমি রাখিনে। করুক না এক ঘরে—ভয় কি?

বাঁড়ুয্যে মশায় দন্ত পাটি বিকশিত করে হেসে বল্লেন, কিশোরী বাঁড়ুয্যেরও তাই কথা। কোন মেয়েতো বিয়ে দেবার নেই যে ভয় করবো?

আমাদিগকে এক ঘরে করবার জন্যে কয়েকদিন জল্পনা কল্পনা চলতে লাগ্‌লো, রাম বিদ্যাবাগীশের বৈঠকখানায় ঘন ঘন মজ্‌লিস বস্‌তে লাগ্‌লো। প্রাচীনের দল সকলেই তাদের পক্ষপাতী, এমন কি দুই দলের এই উপলক্ষ্যে পূর্ব্ব শত্রুতা ভূলে একত্র হবার যোগাড় হচ্ছে; কিন্তু নব্য দলের ভিতর গোলমাল বেধে গেল, তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জোড়ের সাথে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থন করতে লাগ্‌লো—ফলে কিছুই হলোনা। নিশ্চল গ্রাম্য জীবনকে অনাবশ্যক রূপে ফেনিল করে কয়েক মাস পর সমস্ত উত্তেজনা অন্তর্হিত হলো।

ইহার কয়েকদিন পরেই আমাদের গ্রামের এণ্ট্রেন্স স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো। কয়েকদিন পর্য্যন্ত তার কাজ কর্ম্মেই মগ্ন হয়ে ছিলাম।

মাষ্টার সব নিযুক্ত হয়ে এলো,—গৃহ নির্ম্মিত হলো,—টুল টেবিল চেয়ার প্রস্তুত হয়ে আস্‌লো, মহা আনন্দের ভিতর স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হলো। আমি স্কুলের সেক্রেটারী ও রেক্টার হয়ে থাক্‌লাম।

শীতকাল। কক্ষে আলো জ্বল্‌ছে। কাপড় চোপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে স্বীয় পাঠ কক্ষে চেয়ারে উপবেশন করতেই গয়ানাথ গরম গরম চা নিয়ে এলো। প্রভুপরায়ণ কুকুর 'বজ্র' লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে আনন্দ প্রকাশ করতে করতে পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়্‌লো। আমি গায় হাত বুলিয়ে বল্লাম, ভাল আছ 'বজ্র'। জিজ্ঞাসা করায় সে তার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় আনন্দ গদগদ ভাবে জানালো আমার বিরহে সারাদিন তার বড়ই কষ্টে গেছে কিন্তু এক্ষণ সমস্ত কষ্টই দূর হয়েছে।

সকলেই সুখী, শুধু আমি ছাড়া। আমার প্রাণেই শান্তি নেই। কাজ যা কিছু কচ্ছি, কই তার ভিতর দিয়ে প্রাণ ভরে উঠছে না। সর্ব্বক্ষণই মাতৃদেবীর অভাব নলিনীর অভাব আরো কার যেন অভাব অনুভব কচ্ছি। এক একদিন এমনও হয়েছে—যে মার স্বর শুনে অন্য মনস্ক ভাবে তাঁর কক্ষে যেয়ে উপস্থিত হয়েছি—অবশেষে ভ্রান্তি বুঝে দুঃখিত হৃদয়ে নিজ কক্ষে ফিরে এসেছি।

নলিনী সুখে আছে—এই আমার মহাসান্ত্বনার সুখের বিষয়। তার বিবাহ দেওয়ার পর হতে সর্ব্বক্ষণই মনে হচ্ছিল—কি এক গৌরবের মুকুট ধারণ করে চলেছি। নানাজনে নানাকথা বল্‌ছিল। সমাজদ্রোহী সমাজকলঙ্ক বংশকলঙ্ক কত কথাই না কর্ণে এসে পৌছিল কিন্তু আমি মনের ভিতর অনুভব কচ্ছিলাম,—কি এক মহৎ কাজ করেছি—যাতে হৃদয়ের এক দেশের শূন্যতা পূর্ণ হয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে লীলার কথা কয়টীও মনে হচ্ছিল।

সে দিন বসে বসে আলাপ কচ্ছি এমন সময় বিপিন আমার দিকে চেয়ে বল্ল, যাই বলেন সুরেশ দাদা! বিদ্যাবাগীশ এবার বড়ই জব্দ হয়ে গেল। এক ঘরে ব্যাপার একেবারেই ফস্কে গেল।

আমি। যাবেনা? এমন দিন আসবে—যখন এসব বিদ্যাবাগীশদের কথায় লোকে কাণও পাতবে না। এরাই যত প্রাচীন অন্ধকুসংস্কারকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে। এদের কাছে ও যে এখনকার লোক ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যায়—ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়, দুঃখের বিষয়। ইংরাজী ভাষা এমন কি বাঙ্গালা ভাষারও এরা সংবাদ রাখে না। আছে এরা তিন হাজার বছরের সংস্কৃতের পুঁজি পুঁথি নিয়ে।

বিপিন। তা কি করবেন? এই সংস্কৃত ভাষাইতো দেশের গৌরব।

আমি। গৌরব সন্দেহ নেই কিন্তু প্রাচীনকালের কারুকার্য্যখচিত মোগল বাদশাদের প্রাসাদ যেমন এখনকার দিনের লোকের কাজে আসেনা, শুধু দেখবার পক্ষেই সুন্দর এবং প্রত্নতত্ত্ববিতেরই চক্ষে মূল্যবান তেমনি তোমার সংস্কৃত ভাষাও তাতে রচিত গ্রন্থাবলী। প্রাচীনকে নিয়ে যদি নিতান্তই চলবার ইচ্ছে থাকে, তবে তার নূতন ভাবে সংস্কার করে নাও। প্রাচীনকে দিয়ে কেন নূতনকে চালাতে চাও? মৃত কেন জীবিতকে পথ দেখাবার স্পর্দ্ধা করে? এ সব বিদ্যাবাগীশদের দলের প্রভাবেই তো দেশের উন্নতি হচ্ছে না।

বিপিন। এরা আছে বলেই তো, হিন্দুধর্ম্ম আছে বল্‌তে হবে। আর হিন্দুধর্ম্ম আছে বলে আমরাও জাতি হিসাবে বেঁচে আছি বলতে হবে।

আমি। শুধু হিন্দু জাতির অন্তর্গত বলে বেঁচে থাকাতে কি মাহাত্ম্য? এমন তো য়িহুদীরাও বেঁচে আছে—দেশশূন্য, গৃহশূন্য। মানুষের মত বেঁচে আছি কি আমরা? কুকুর, বেড়ালও তো জগতের সৃষ্টি হতে বেঁচে আছে। জাতিভেদ, বৈধব্যপ্রথা, সতীদাহ, রমণীর অধীনতা—এ সকল প্রথার চর্চ্চা করতে করতে আমাদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে—ভেবে দেখেছ কি? আমাদের ধর্ম্ম আমাদের উন্নতির পথে কেমন প্রতিবন্ধকরূপে দাঁড়িয়ে আছে—তা কি খুলে বলার এখনও দরকার? শুধু ধর্ম্ম নিয়ে কি করব, যদি তার সাহায্যে মানুষ না হতে পারি?

বিপিন। কি বলেন, সুরেশ দা? এমন উদার ধর্ম্ম ও জগতে আছে? আর ব্রাহ্মণদের ত্যাগের ভাব! এটার কাছে জগৎ তাদের কাছে মাথা নুয়ে চিরকাল থাকবেই। দেশের রাজত্ব ধনমান ইচ্ছা করলে সবই তো তারা পেতে পারতো—কিন্তু সব তুচ্ছ করে শুধু জ্ঞানচর্চ্চাতেই জীবনপাত করে গেছে।

আমি। কি ভুল বিশ্বাস! তুমি কি মনে কর, শ্রীকান্ত চক্রবর্ত্তী ইচ্ছে করলেই আমার তালুকদারি কেড়ে নিতে পারে? পুরোহিত বশিষ্ঠের কি ক্ষমতা ছিল, অযোধ্যার সিংহাসন আরোহণ করা? দ্রোণাচার্য্যের এমন কি শক্তি ছিল যে তাকে হস্তিনার সিংহাসনে নিয়ে লোকে বসাবে? ব্রাহ্মণরা ছিল দরিদ্র পুরোহিত—রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে যাদের জীবন কাটাতে হতো। কিন্তু এরা যখন রাজার নির্ব্বুদ্ধিতার সুযোগে রাজকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করতে লাগ্‌লো—তখন হতেই রাজোচিত শক্তি সামর্থ্য বীর্য্য পরাক্রমের ভাব অন্তর্হিত হয়ে সংসার অসার, দয়া, দৌর্ব্বল্য, ত্যাগ, বিনয়, ক্ষমা ইত্যাদি দরিদ্রোচিত ভাব

সমূহ সমাজে প্রচারিত হয়ে তাকে বিকলাঙ্গ ও দুর্ব্বল করে তুল্ল। পুরোহিতের প্রভাবে সব দেশই মাটী হয়েছে।

বিপিন। আপনি কি বলেন তা হলে ব্রাহ্মণদের কোনও ক্ষমতা ছিল না?

আমি। স্কুল-মাষ্টারদের ভিতর ক্ষাত্রশক্তি তেজবীর্য্য পরাক্রম কোথায় দেখেছ? জ্ঞানসেবক ছিল তারা,—এই পর্য্যন্ত। কালে তারা কলে কৌশলে এই জ্ঞানভাণ্ডারটী সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব করে নিয়েছিল। তার পর থেকে—পূর্ব্বাপর নিজেদের দেবত্বের মহিমাই প্রচার করেছে। এখনকার দিনেও লোকের তাদের দেবত্বে কি বিশ্বাস! লোকের এখনও বিশ্বাস, পূর্ব্বের ব্রাহ্মণগণ মহা চরিত্রশালী ছিল। এখন নেই, তাই তাদের দুরবস্থা। এও একটী মহা ভুল: পূর্ব্বেও যেমন এখনও তেমন। মহর্ষি নারদ, বশিষ্ঠ, পরাশর, ব্যাস, দুর্ব্বাশা প্রভৃতির জীবনেতিহাস পাঠ করলে—তারা যে বড় শ্রেষ্ঠ পুরুষ ছিলেন এমন তো মনে হয় না। যেখানে সেখানে প্রাচীন গ্রন্থাদিতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ কথায় কথায় লোক ভস্ম কচ্ছে, কথায় কথায় প্রাণ দান কচ্ছে, সাত সমুদ্রের জল এক গণ্ডুষে পান কচ্ছে, কত কি আজগুবি গল্প। তোমরা যে এসবে বিশ্বাস কর, লজ্জার বিষয়, দুঃখের বিষয়। এদের শিক্ষার ফলে—কুড়ি কোটী হিন্দুর ভিতর ছয় কোটী অস্পৃশ্য! আর বাকী যারা আছে—তাদেরও অধিকাংশ জনকয়েক ব্রাহ্মণের পদসেবা করে জীবন ধন্য মনে করছে। এ ব্যবস্থার জন্য ও তুমি গৌরব নিতে চাও।

জাতিভেদ ছাড়া যে সমাজ চল্‌তে পারে, ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব না মেনে চল্লেও যে ধর্ম্মকার্য্য সম্পন্ন করা যায়, এ যেন লোকে ভেবেই উঠ্‌তে পারে না, সে ক্ষমতা তারা এতদিনে হারিয়ে ফেলিয়েছে। কিন্তু যিনি

দেশের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, প্রকৃত শিক্ষিত ও জ্ঞানী, তিনি ব্রাহ্মণ হোন আর চণ্ডালই হোন তাকে দেখতে হবে যাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব জেগে ওঠে। প্রভু শক্তি গর্ব্বে বিভোর; কৃতদাস নতজানু হয়ে তার অত্যাচার মস্তকে পেতে নিচ্ছে ও সঙ্গে সঙ্গে যে অলক্ষিতে তার ও মনুষ্যত্বের অপচয় কচ্ছে—তার দিকে তার দৃষ্টি পড়্ছে না। কৃতদাসের দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা যে বিষের ন্যায় তার দেহ ও মনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করে তাকেও শক্তিহীন ও দুর্ব্বল করে তুল্ছে—তা সে দেখতে পাচ্ছে না। অসহায় দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করতে করতে প্রবলও দুর্ব্বল হয়ে পড়ে—ইহাই প্রকৃতির অনুশাসন। এজন্যই পরাক্রান্ত গ্রীস ও রোম রাজত্ব এসিয়াতে এসে নিঃশেষ হয়ে গেল। এ কারণেই ভারতে ব্রাহ্মণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত হিন্দুজাতির বর্ত্তমান দুর্দ্দশা। ব্রাহ্মণকে তোমার উপর অত্যাচার করতে দিও না, জাতিগত জন্মগত তার কোনও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এ ভাব পোষণ করতে সুবিধা দিও না এবং তুমি যে তাদের চেয়ে কোনও অংশে নিকৃষ্ট এ ভাবও মনে স্থান দিও না—তোমার উপকার হবে, সেও মানুষ হবে। যেমন করে হোক, জাতিভেদ উঠাতে হবে এবং রমণীকে সকল বিষয়ে স্বাধীনতা দিতেই হবে। এ দুটা মহাক্ষত যত দিন আছে—ততদিন সমাজ পঙ্গু হয়ে থাক্‌বেই।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পূজা পার্ব্বণ পূর্ব্ব হতেই বন্ধ করে ছিলাম—এখন হতে রান্নার জন্য যে বামন ঠাকুর ছিল তাকেও উঠিয়ে দিলাম। তার স্থলে গোবর্দ্ধন নমকে নিযুক্ত করলাম। প্রভুপরায়ণ গয়ানাথকে বল্লাম, জাতিবিচার আর এ বাড়ীতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে মানা হবে না—তোমার যদি ভাল না লাগে—তা হলে যেতে পার। কিন্তু সে আমায় কিছুতেই পরিত্যাগ করবে না। এই দুই জন এবং 'বজ্র'—ইহাদের নিয়েই আমার ক্ষুদ্র সংসার বেশ চল্‌তে লাগল।

মনের ভিতর এতদিন নিজের কাছে নিজে ম্লান হয়ে পড়ছিলাম, এখন সমস্ত কৃত্রিম বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে, নিজকে গৌরবান্বিত মনে করতে লাগ্‌লাম। সমস্ত জগতের সকলে আমার ভাই, আমি কি কাকেও ঘৃণা করে অস্পৃশ্যজ্ঞানে দূরে সরে দাঁড়াতে পারি? মনেতে দেহেতে নূতন শক্তি অনুভব কচ্ছিলাম। গ্রামের ছোট বড় সকল কাজেই আমি গা ঢেলে দিলাম। তার পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত, স্বাস্থ্যোন্নতির চেষ্টা, সর্ব্বোপরি শিক্ষার সর্ব্ববিধ উন্নতি এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে মত প্রচার করা, এর ভিতর আমি নিজকে কয়েক দিনের জন্য ডুবিয়ে দিলাম। গ্রামের ভিতর কতক ঘর দরিদ্র যুগীর বাস। এক সময় তাঁতে কাপড় বুনিয়ে তারা বেশ দুপয়সা রোজগার করত—এখন, বড়ই দুরবস্থা। তাদের দিকেই আমার সর্ব্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো—কিন্তু এ সকল দুদিনের কাজ নয় যে শীঘ্রই কিছু করা যাবে।

মাস কয়েক বেশ একটা মোহের ভিতর চলে গেল। প্রাতে বৈকালে নীরার তীরে বেড়িয়ে, দ্বিপ্রহরে স্কুলের কাজে ব্যস্ত থেকে এবং অন্যান্য

সময়ে চাষবাস ও অন্যান্য নানা কাজে রত থেকে সময়টা বেশ যেতে লাগ্‌লো।

শেষে এ জীবনও যেন কেন একঘেঁয়ে হয়ে পড়তে লাগ্‌লো। কাজে স্পৃহা কমে আস্‌তে লাগ্‌লো। এসব দেখেই বুঝি বাঁড়ুয্যে মশায় একদিন হেসে বল্লেন, কি সুরেশ ভায়া! তোমার শরীর কি আবার খারাপ বোধ কচ্ছ?

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে উত্তর করলাম, না, কিছুই নয়। আমি তো বেশ আছি।

"চেহারা দেখে তো তেমন বোধ হচ্ছে না।"

"কি বলেন আপনি? কিছুই বুঝতে পারেন নি। এতো বেশ আছি"

"তুমি যাই বল, আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তুমি সুখী নও।"

সে দিন রাত্রিতে শয্যায় শুয়ে শুয়ে এসব কথাই আমি ভাবছিলাম। প্রাণের এই বা কি ক্ষুধা? কিন্তু কার সাথে যেয়ে এ জীবন মিশাব? ভাবতেই সরোজের কথা মনে হলো। সুখে আছে সে—সুখে থাক্। পর-স্ত্রী—তার কথা ভাবতেও যে পাপ। কিন্তু অবাধ্য প্রাণ শুনেও যে শোনেনা। মিষ্টার বৌস—তুমি ভাগ্যবান এ হেন রত্ন পেয়েছ কিন্তু আমার প্রতি তুমি কি অত্যাচার করলে—তা কি তোমার মনে ক্ষণকালের জন্যও স্থান পেয়েছে? পাবেই বা কেন? পরলুণ্ঠন ও পরস্বাপহরণই যে ভাগ্যবানের ব্যবসা। সরোজ ও তোমাকে চায়নি, তুমিও তার অভাব কখনো অনুভব করোনি; হঠাৎ কেন তুমি তোমার স্বর্ণ রৌপ্য ও যশ প্রতাপের ছটায় তার বৃদ্ধ পিতার মন আকৃষ্ট করে, তাকে নিয়ে চলে গেলে? সরোজ ও যেমন,—অন্য দশজন ও তেমন— তোমার পক্ষে সব সমান। তবে কেন তাদের ছেড়ে সরোজের প্রতি

তোমার দৃষ্টি নিপতিত হলো? ভালবাসা—ব্যাধি। এর হাত হতে কি আর মুক্ত হতে পারব না? সরোজ তো হয়েছে। সে তো আর আমার কথা ভাবে না। কেন ভাব্‌বে? বোসের মত স্বামী লাভ করে আমার মত ক্ষুদ্র কীটকে তার ভুলে যাবারই কথা। যাক্—যাক্—তার সঙ্গে আমার এমন কি সম্বন্ধ যে সে চিরকাল আমায় মনে করে রাখ্‌বে? কিন্তু মন হতে তখনই প্রশ্ন উদয় হচ্ছিল—সত্যিই কি সে আমায় ভুলেছে?

সরোজের বিষয় ভাব্‌তে ভাব্‌তে ক্রমে নলিনী—শেষে লীলার কথা মনে উদয় হলো। তার প্রতি আমার মনের এ কেমন ভাব? এক সময় প্রাণ আপনা হতেই নুয়ে পড়ে—মনে হয় জগতে ঐ লাবণ্যময় বদনখানি ও স্নেহভরা প্রাণটীর মত এমন সুন্দর কিছুই নেই, আবার মনে হয়—কেমন কঠিন। রমণী হবে—মূর্ত্তিমতী দয়া মায়া প্রেম পবিত্রতা; তার ভিতর কি কোনও কর্কশতা মলিনতা শোভা পায়?

* * * * *

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৎসরেক কাল চলে গেল। আমাদের স্কুলটী বেশ ছাত্রের দলে ভরে উঠেছে। তার সেক্রেটারী ও রেকটারের কাজের অভাব নেই। ছেলেদের পড়ান, তা ব্যতীত মাষ্টার নিযুক্ত করা, তাদের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা, বোডিং লাইব্রেরী স্থাপন, বিপদের বন্ধু সমিতির প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন, কত কাজই যে আমার জুটে গেছে তা বলবার নয়।

স্কুল-স্থাপনে গ্রামের ছেলেদের পাঠসমস্যা অনেকটা সংশাধিত হচ্ছিল। বালিকাদের জন্য ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব চল্‌ছিল কিন্তু বিবাহিতা রমণীদের শিক্ষার কোনও প্রকার বন্দোবস্তই করে উঠ্‌তে পারছিলাম না। উপায়ান্তর না দেখে আপাতত কতকগুলি মাসিক ও সাপ্তাহিক

পত্রিকা এবং উপন্যাস ও অন্যান্য গ্রন্থ এনে তাদের জন্য নব স্থাপিত লাইব্রেরী হতে প্রেরণ করতে লাগলাম।

লোকমুখে আমার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়্‌ছিল। কিন্তু আমি নিজে যেন তেমন আনন্দ পাচ্ছিলাম না। সুখ—কোথায় তুমি?

পূজার বন্ধ সন্নিকটবর্ত্তী হতেই আমি হেডমাষ্টার রমেশ বাবুকে ডেকে বল্লাম, এখন থেকে আপনার উপরই স্কুলের সম্পূর্ণ ভার রইলো—আমি কয়েক মাসের জন্য ছুটী নিচ্ছি। বিপিনকে ডেকে, বিপদের বন্ধু সমিতির পরিচালনের ভার তার উপর দিলাম। গ্রামের সর্ব্ববিধ সৎকাজ—দীন সেবা পীড়িতের সেবার—সহিত এই সমিতির সম্পর্ক।

শেষে একদিন সন্ধ্যায় একাকী বেড়িয়ে পড়লাম।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কলকাতায় এলাম। লীলার সাথে দেখা হলো। তার মার শরীর ভাল নয়। মিষ্টার রায় এখন কলকাতা কর্‌পোরেশনেই চাকরী কচ্ছেন। ছুটী নিয়ে চেঞ্জে যাবার মনস্থ করেছেন।

লীলা আমায় জিজ্ঞাসা করলো, কি মনে করে এখন কলকাতায় এলেন?

উত্তরে বল্লাম, কিছু মনে করেই নয়। সংসারটা একবার দেখ্‌ব অনেকদিন থেকে ইচ্ছা। দুই চক্ষু যে দিকে যায় সে দিকেই চলে যাব, কোথায় যেয়ে শেষ হবে বলতে পারিনে।

তাহা শুনে সে হঠাৎ হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বল্ল, তবে তো ভালই। চলুননা আমাদেরই সাথে ওয়াল্টায়ারে। আমরা সেখানে শীগ্‌গিরই যাচ্ছি।

লোকের সঙ্গই যেন আমার ভাল লাগ্‌ছিল না। আমি হেসে বল্লাম, ওয়াল্টায়ার আমার প্রোগ্রেমের বাইরে। সে দুঃখার্দ্র স্বরে বল্লো, না হলে ভালই হতো।

কথাপ্রসঙ্গে সরোজের কথা উঠ্‌লো। যা ভেবেছিলাম, তাই। স্বামীর সঙ্গে তার বনিবনাও হয়ে উঠ্‌ছেনা। অমন দাম্ভিক মদ্যপায়ী জুয়ারীকে সন্তুষ্ট করা কি তার ন্যায় সরলার পক্ষে সম্ভবপর? অনেক দিনই স্বামীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বৌসের সময় নাকি হোটেলে বা বিদেশেই অধিকতর অতিবাহিত হয়। শুনে বড়ই দুঃখ হলো—কিন্তু কোনও উপায় দেখ্‌তে পেলেম না, যে সরোজের কষ্টের কথঞ্চিৎ ও উপশম করতে পারি।

এ সময় মালতী হতে ফেরৎ ডাকে নলিনীর একখানা সুদীর্ঘ পত্র পেলাম। নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত কচ্ছি—

গৌহাটী,

২০শে আশ্বিন...

শ্রীচরণেষু,

দাদা! তোমার পত্র পেলাম। অনেকবার পড়লাম। যতই পড়ি, ততই ভাল লাগে। যেমন তোমার প্রাণটী, তেমন চিঠিখানা—স্নেহেভরা। আর মালতীর ছোটো খাটো জিনীষগুলির যা বর্ণনা দিয়েছ, তাতে যেন তাকে চোখের কাছে ভাস্‌ছে দেখ্‌ছি।...আমাদের জীবন এখানে যাচ্ছে বেশ। এখন থেকেই বেশ ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে, সন্ধ্যার দিকে

একটু শীত বোধ হয়। তোমার ওখান থেকে কি চা খাওয়াই শিখে এসেছেন, প্রাতে বৈকালে না হলে চলবেই না। মাঝে মাঝে তাঁর দুই চারিজন বন্ধু ও চা খেতে আসেন। এ রকম বন্ধু মধ্যে দুজন আছেন—মনোমোহন ও বিপ্রদাস বাবু—যাদের কাছে শুধু আমি বেরোই। আমার চার বড় সুখ্যাতি বেড়িয়েছে। কিন্তু যেখানে দাদা নেই, সেখানে আমি সম্পূর্ণরূপে সুখী হতে পারি কি? * * * এতদিন তোমায় বলিনি, তিনি উপরের তালার দক্ষিণ দিকের কোঠাটী আমার জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন। আমার যেটী পছন্দ হয়, সেইটীই নিতে বল্লেন। সেই-টীতেই দাদা তুমি ছিলে, আমি সেটীই নিয়েছি। আমি যেন তোমাকে এখনও জানালার পাশে দেখ্‌ছি। * * * একটা পিয়েনো কিনেছি, মিশ ডেনিসের সঙ্গে আমার খুবই আলাপ হয়ে পড়েছে। প্রতি শনিবারে আমাদের এখানে আসেন—আমাকে পিয়েনো শিখিয়ে যান। আমি তাঁর সঙ্গে মাঝে মাঝে তাদের ওখানে যাই। লীলার কথা প্রায়ই উঠে থাকে—মিস্‌ গিলবার্ট তার খুবই সুখ্যাতি করেন। সাহেবদের পারি-বারিক জীবন আমার বড়ই ভাল লাগে। সবই কেমন পরিপাটী, চুপ চাপ, যে যার কাজ নিয়ে আছে, লোকজন ও খুব কম, যারা আছে তারা ও ধীরে ধীরে কথা বলছে—এক একখানা বাড়ী যেন শান্তি মন্দির। মিস্‌ গিলবার্টের বোনের মেয়ে ম্যাবেল যেন পরিটী। ইংরাজেরা ছোট ছোট ছেলে মেয়ে ও নিজ নিজকে কেমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে রাখে। আর আমাদের মত নোংরা বুঝি কেও নয়। * * তিনি ভাল আছেন, আমিও ভাল আছি। তোমাকে কাছে দেখ্‌তে পাচ্ছিনা—এই যা দুঃখ, সে দুঃখ কম নয়। তোমার এণ্ট্রেন্স স্কুল ভাল চল্‌ছে, বালিকা বিদ্যালয় খুলছ—সুখী হলুম। যেমন দেখ্‌ছি তোমার কল্যাণে

আমাদের 'মালতী' দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রাম হয়ে দাঁড়াবে। 'মালতীর' জন্যই বুঝি 'দাদা' তুমি জন্মেছিলে। তোমার মত সুসন্তান পেয়ে সে আজ ধন্য হয়েছে। সোণার মালতী, সোণার নীরা—আমি কবে আবার তাদের দেখব? কবে আবার তোমার সাথে সন্ধ্যায় নৌকা চড়ে নীরার কালো জলের উপর বেড়িয়ে বেড়াব? সে সুখের কল্পনা করতে আমার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠ্ছে। ঘরের বৌদের ও বিবাহিত মেয়েদের লেখা পড়ার ও বন্দোবস্ত কচ্ছ শুনে বড় সুখী হলুম। নির্ম্মলা [বিপিনের স্ত্রী] বোঠানকে বলো, আমি তার চিঠি পেয়েছি। বিপিন দাদা তোমাদের স্কুলে কাজ নিয়েছে, ভালই করেছে। তার মত লোকের পক্ষে কি জমীদারের চাকরী পোষায়? নির্ম্মলা বোঠানকে আমার বড়ই লাগ্‌তো—কেমন মিষ্টি চরিত্র। শরৎ দিদি, বিন্দু দিদি, তিলোত্তমা, বিভা সকলের কথাই মনে হচ্ছে। সহরের লোক পাড়াগাঁয়ের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করে। আমার কিন্তু দেখে শুনে ধারণা হয়েছে—বাঙ্গালার রমণীর শিরোমণিরা সেখানেই আছেন—কেমন সুন্দর স্বাস্থ্য, ঘরকন্নায় লিপ্ত, পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যপরায়ণ, আর তাদের মাঝে যারা লেখা পড়া কিছু শিখেছে কেমন বুদ্ধিমতী। আহা! এরা যদি সকলেই শিক্ষা পাবার সুযোগ পেত! আবার কবে তাদের দেখ্‌বো? * * * মিনি ভাল আছে, সুখী হলাম। আমি তখন নিজকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম, আসবার সময় তাকে আনা হয় নি। তাও তুমি যখন রয়েছ, তখন তার জন্য আমার চিন্তা নেই। আমার নাম করে এখন থেকে তাকে রোজ এক বাটী দুধ দিও। তার দুধের জন্য পাঁচটী টাকা পাঠালুম। * * পত্রটা বড় হয়ে পড়লো। ইচ্ছা হয়, সারাদিনই বসে বসে তোমায় লিখি। থাক্—এখানেই আজকার মত শেষ করি। * * * বড়

দুঃখ—মা আমায় সুখী দেখে যেতে পাল্লেন না। কাল রাত্রিতেও তাঁকে স্বপ্নে দেখিছি, * * * আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

স্নেহের বোন

নলিনী।

নলিনী সুখে আছে। তার জন্য আমি এখন নিশ্চিন্ত। তবে আর বাঁধা কি? এতদিন তাকে জানাই নি। আজ সব কথা খুলে তার কাছে পত্র লিখে পাঠালাম।

লীলাদের গৃহে চেয়ে উপস্থিত হলাম। তারা ওয়াল্টায়ার যাবার জন্য নানা প্রকার কল্পনা কচ্ছে। আর পি রায় ও তার স্ত্রী—উভয়ের সাথে দেখা হলো।

লীলা জিজ্ঞাসা করলো, কোথায় যাচ্ছেন এখন? কবে যাচ্ছেন?

কাল তো দিল্লী রওয়ানা হচ্ছি—দেখা যাক্ কোথায় এর শেষ হয়। বলেছিতো আপনাকে, যে দিকে দু চক্ষু নিয়ে যায়—সে দিকে চলে যাব।

এমন ভাবে বেড়িয়ে কি লাভ? লোক জনও কাউকে সঙ্গে নিচ্ছেন না, বিদেশে যদি পীড়িত হয়ে পড়েন তবে উপায়?

উপায় আর কি—মৃত্যু।

হঠাৎ লীলার মুখ বিষাদের ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌লো এবং সে বলে উঠ্‌লো, বড় নিষ্ঠুর আপ্‌নি।

আমি কোনও উত্তর দিলাম না, চুপ করে বসে রইলাম। কিয়ৎকাল পরে সে আপনা হতেই বলে উঠ্‌লো, কটার গাড়ীতে কাল যাচ্ছেন?

রাত্রি দশটায়।

'যাবার পূর্ব্বে আর দর্শন পাব কি?'

'না, এই শেষ দেখা। বোধ হয় বা জন্মের মতই শেষ দেখা।'

কি বল্‌ছেন? আমার বোধ হচ্ছে আপনি অধিক দূর যেতে পারবেন না, আপনাকে ফিরে আস্‌তেই হবে? লোকের প্রাণের ক্রন্দন কি বিফল যাবে?

লীলা বলে কি? কার প্রাণের ক্রন্দন? নলিনী ও প্রভুপ্রাণ 'বজ্র' ব্যতীত আর কার প্রাণ আমার জন্য কাঁদছে?

তার পরদিনটী, প্রবাসের জন্য প্রস্তুত হবার গোলমালেই কেটে গেল।

রাত্রি নয়টা বেজে গেছে। আমি হাবরা ষ্টেশনে গাড়ীতে এসে চড়েছি। প্ল্যাটফর্ম্ম লোকে লোকারাণ্য। দেখ্‌তে দেখ্‌তে আরও দশ মিনিট চলে গেল। এমন সময় দেখলাম দুটী রমণী একটী ভৃত্য সহ আমার গাড়ীর দিকে দ্রুত পদে অগ্রসর হচ্ছে। আর একটু, তার পরেই দেখ্‌তে পেলাম—আর কেউ নয়, লীলা, তার দাসী ও ভৃত্য। ভৃত্যের মাথার উপর একটা ঝুড়ি।

আমার কক্ষে তখন পর্য্যন্ত আর একটী মাত্র ভদ্রলোক উঠেছেন,—বৃদ্ধ। তিনি রমণী দুটীকে দেখে অন্য কোচের উপরে যেয়ে বস্‌লেন। লীলা ত্রস্তব্যস্ত ভাবে আমার দিকে চেয়ে গাড়ীতে উঠে বল্ল—বেয়ারাটার গোলমালে কি বিপদেই পড়া গেছিল,—ঠিক সময় যে পৌঁছে উঠ্‌তে পারব,—মনে ভরসা হচ্ছিল না। আপনি যে এত সকাল সকাল বেড়িয়ে পড়বেন ভাবিনি। বাসায় যেয়ে দেখ্‌লেম—দরজা বন্ধ, আপনি চলে এসেছেন। সেখান থেকে এখানে আস্‌ছি। সে যা হোক,—মা আপনার জন্য কিছু ফল ও খাবার পাঠিয়েছেন, অনুগ্রহ করে গ্রহণ করবেন। বাবাও আস্‌তেন—তিনি মাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন, তাই আস্‌তে পারলেন না।

তার পর ঝুড়িটী খুলে কোথায় কি আছে আমাকে দেখাতে লাগ্‌লো। আম, বেদানা, আঙ্গুর, নেসপাতি, কমলা ইত্যাদি সে সময়কার নানাবিধ দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ফলে একাংশ সজ্জিত। অন্যাংশে সুন্দর চিনা বাসনের ভিতর সন্দেশ, মিহিদানা, কচুরি ও অন্যান্য নানারকমের মিষ্টান্ন। লীলাকে প্রশ্ন করে জানালাম, সবই তার স্বহস্তে প্রস্তুত। লীলার আগ্রহাতিশয্যে একখানি সন্দেশ মুখে দিয়ে দেখলাম, অনুপম। এমন স্নেহ ও প্রীতির নিদর্শনে কার না মন আকৃষ্ট হয়? সর্ব্বোপরি একটী সুশ্রী গোলাপ ফুলের তোড়া, লীলাদেরই বাগান হতে সঞ্চিত পুষ্পে তার স্বহস্তে রচিত। তাহা হতে নির্গত সুগন্ধ লীলার হৃদয় সুগন্ধেরই পরিচয় দিচ্ছিল।

বেশী কথা বলবার সময় ছিল না। অল্পক্ষণ মধ্যেই গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা দিল। লীলা যেয়ে প্লেটফর্ম্মে নেমে দাঁড়াল। একবার আমার দিকে চেয়ে বল্লো, সুরেশ বাবু! ফিরে আসবেন, আবার যেন দেখা হয়।

বল্‌তে বল্‌তে গাড়ী ছেড়ে দিলে। দেখলাম তার চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে। অলক্ষিতে আমার নয়নদ্বয় ও কেমন জলে ভরে উঠবার উপক্রম হলো। লীলা আমার কে? আমিই বা তার কে? অথচ আমার প্রতি তার ব্যবহার কেমন প্রীতি স্নেহে ভরা! তার মনোগত ভাব কি?

উনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

আঁধারের বক্ষ ভেদ করে গাড়ী ছুটেছে। আমি একটী কোচ দখল করে পড়ে আছি কিন্তু চোখে নিদ্রার লেশ মাত্র নেই। থেকে থেকে কেবল লীলার কথাই মনে হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সরোজ, নলিনী, হেম, মা, বাবা সকলের স্মৃতিই জড়িত হয়ে উঠ্‌ছে। নিজ জীবনের কথা ও মনে হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছি? কার উদ্দেশে যাচ্ছি? কেন যাচ্ছি? আর কি দেশে ফিরে আসব? মালতীতে যাব? তার সুখ দুঃখের ভিতর নিজকে ডুবিয়ে দিব?

কিছুই ভাল লাগছিল না। শেষে শয্যা হতে গাত্রোত্থান করে জানালা খুলে বাহিরের দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করে চেয়ে রইলাম। আঁধারে কিছুই দেখা যাচ্ছেনা—শুধু দূর গগনে তারকাগুলি মিটি মিটি জ্বল্‌ছে। ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনে হচ্ছিল, সংসারে সকলেই যে যার স্থান খুঁজে নিয়েছে; আমিই শুধু দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার প্রাচীন সনাতন দেশ—একদিন যে পরম পুরুষকে সত্য বলে আশ্রয়স্বরূপ গ্রহণ করে ভাগ্যবানও গৌরবান্বিত মনে করেছিল—তাতে আমার প্রাণ শান্তি পাচ্ছে না; তার প্রাচীন ত্যাগের অসারত্বের আধ্যাত্মিকতার বাণী ও আমার কাছে অর্থশূন্য বোধ হচ্ছে। জীবন হবে মহা আনন্দময়, কার্য্যে আনন্দ, ভাবে আনন্দ। ছোট বড় সকল কাজে প্রাণকে পরিপূর্ণরূপে দান করব কিন্তু কৈ তা হয়ে উঠ্‌লো কৈ? ওগো! আমার ভাগ্য বিধাতা—তুমি কি আছ? যদি থাক, আমাকে তোমার কাজে গ্রহণ করে নিঃশেষ করে দাও। গ্রহণ করো, সম্পূর্ণরূপে আমায় গ্রহণ করো।

আমার ভাল মন্দ যা, তা তোমার পদে সব দান কচ্ছি। আকাশে তারা ফুট্‌ছে, বনে ফুল ফুঠ্‌ছে, সূর্য্য তেজোরশ্মিতে জগৎ বিমণ্ডিত করে শোভা পাচ্ছে,—সকলেই যে যার কাজে মহীয়ান; আমিই শুধু ম্লান, হীন, নিজের কাছে নিজে ম্রিয়মান হয়ে ধুলায় অবলুণ্ঠিত হচ্ছি।

আমার দেশ, আমার ভাই ভগিনী সকল—তারাও তো আমারই মত। কোথায় তাদের মুক্তি, কোথায় প্রাণ—তার কি তারা পরিচয় পেয়েছে? অসারের বিষে জর্জ্জরিত দেহ হয়ে অসারের গান গাইতে গাইতে তারা যে আজ মরতে বসেছে—কেমন করে তাদের বুঝাব? আমার কথা—কারো কাণে পৌঁছবে কি? পশ্চিমের প্রাণপ্রদ হাওয়া এসে অর্দ্ধমৃত জড়দেহের হাঁড়ে লাগছে—কিন্তু সে স্পর্শে সে জেগে উঠ্‌বে কি?

বসে বসে কত কি কথা ভাবছি—এমন সময় বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী জেগে উঠে ধূম পান করতে করতে বল্লেন, কি মশায়! আপনি কি এ পর্য্যন্ত একটু ও ঘুমান নি? অনেক রাত্রি হয়েছে যে।

আমি উত্তর করলাম, না।

"কোথায় যাচ্ছেন?"

'আপাতত দিল্লী। সেখান হতে কোথায় যাই—ঠিক নেই।'

'ও, আপনি দেশ ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। ভাল কথা। এ সময়টাই বেড়াবার প্রশস্ত সময়। তা দিল্লীতে দেখবার জিনীষও যথেষ্ট আছে। কদিন সেখানে থাক্‌বেন? কোথায় থাক্‌বেন?"

'কোথায় থাকব, কদিন থাকব—কিছুই ঠিক করিনি। যে কয়দিন ভাল লাগে থাক্‌ব, তার পরে যে দিকে ইচ্ছে হয় চলে যাব।'

'কি করেন আপ্‌নি?'

'আপাতত কিছুই নয়।'

আরও অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা হলো। জান্‌তে পারলাম, ভদ্রলোকটী পূর্ব্বে পোষ্টেল বিভাগে ইউ পিতে বড় চাকরী করতেন—নাম রামরতন মিত্র। কয়েক বৎসর হলো—অবসর গ্রহণ করেছেন। সংসারে তিনটী ছেলে। তিনটীই ভাল কাজ করে। দুটী মেয়ে, তাদেরও অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ হয়েছে। কাশীতে পূজার সময় বেড়াতে গিয়েছিলেন—সেখান হতে কলকাতায় কার্য্যোপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন—এখন স্বগৃহে ফিরে যাচ্ছেন।

পরদিন প্রভাতের কিছু পরেই গাড়ী এসে দিল্লী ষ্টেসনে দাঁড়ালো। রামরতন বাবুকে নেবার জন্য তার নাত নাতিনী সহ জ্যেষ্ঠ পুত্র ও তার স্ত্রী এসে উপস্থিত। তাকে দেখেই ক্ষুদ্র ফুট ফুটে ধপধপে একটী মেয়ে বলে উঠ্‌লো—ঐ যে দাদা মশায়। কি এনেছ দাদা মশায় আমার জন্যি কলকাতা হতে? পুতুল কৈ? মেঠাই কৈ? বাঁশী কৈ?

বুড়ো হেসে বল্ল, সব এনেছি—সব পাবে। তোমার জন্য বর এনেছি। বুড়োকে বুঝি মনে ধরছেনা?

মেয়েটী হেসে বল্লে, যাও দাদা! তুমি বড় দুষ্টু।

তিনি যেয়ে তাকে কোলে নিয়ে চুমো খেলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ এসে তাকে প্রণাম করলো। সকলের মুখেই হাসি—বেশ বৃদ্ধ ও তার জীবনটী। কিন্তু তখনই আবার মনের ভিতর যত প্রশ্ন জেগে উঠ্‌ছিল—এ কি লোভনীয়?

আমিও গাড়ী হতে নামলাম—রামরতন বাবু আমাকে তার গৃহে অতিথি হবার জন্য পূর্ব্বে ও বারংবার অনুরোধ করেছিলেন, এখনও আবার কল্লেন। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে—গাড়ীতে চড়ে পান্থশালার দিকে রওয়ানা হলাম। যাবার পূর্ব্বে লীলার

ঝুড়ি হতে কতকটা ফল ও খাবার তার নাত নাতিনীদের ভিতর বিলিয়ে দিলাম। তারা মহানন্দে তাহা গ্রহণ করলো। তাদের সরল প্রাণের হাসির ছটায় আমার হৃদয় প্রদেশও উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

দিল্লী হতে আগ্রা—সেখান হতে মথুরা, বৃন্দাবন, লক্ষ্ণৌ, ফতেপুর কানপুর, জয়পুর ঘুরে প্রায় মাস দুই পরে বোম্বাইতে এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে এসে, নলিনী হেম ও আর, পি রায়ের চিঠি পেলাম। হেমের পত্রে জানলাম ভালই আছে তারা, বেশ সুখ শান্তির ভিতর দিন কেটে যাচ্ছে—ব্যবসায়ের ও দিন দিন উন্নতি হচ্ছে। আর একটী সুখ-সংবাদ, নলিনী সন্তান-সম্ভবিতা।

কিন্তু আর পি, রায়ের পত্রে তেমন আনন্দিত হতে পারলাম না। তাঁর স্ত্রীর শরীর আরও রুগ্ন হয়ে পড়েছে—কলকাতা হতে যে জ্বর ও বেদনা নিয়ে এসেছিলেন—তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওয়ালটায়ারে চেঞ্জ করে কোনও উপকার হয় নি—শীঘ্রই আবার কলকাতা ফিরে যাবেন। পত্রের শেষভাগে একটী নূতন সংবাদ ও দিয়েছেন। সার্ভে ডিপার্টমেণ্টে তার ছোট ভাইদের আফিসে দেরাদুনে বাবু নৃত্যকৃষ্ট ঘোষ নামে একটী যুবক কাজ করেন। মাসিক মাহিনা পাঁচ শত টাকা, সঙ্গতিপন্ন। তার সঙ্গে লীলার বিবাহ প্রস্তাব চলেছে—নৃত্যকৃষ্ণ দেখ্‌তে সুপুরুষ, বেশ সুশিক্ষিত। তিনিও কয়েকদিন হলো ওয়ালটায়ারে বেড়াতে এসেছিলেন—লীলার তার প্রতি যেমন ব্যবহার দেখা গেছে, তাতে মনে হয়, এ প্রস্তাব বোধ হয় প্রত্যাখ্যাত হবে না।

ভাল কথা। লীলার পক্ষে শীঘ্রই বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া সর্ব্বোতভাবে কর্ত্তব্য। তা না হলে বলা যায় না, মিষ্টার রায়ের স্ত্রীর যদি অন্তর্ধান হয়, সে যেমন অভিমানী তা হ'লে তাকে একাকী কি

কষ্টেই না যেন পড়তে হয়। কিন্তু তদ্দণ্ডেই মনে হচ্ছিল,—বনের কুরঙ্গিনী,—এত সহজেই কি পরহস্তে ধরা দেবে? স্বার্থপর মনের ভিতর তার লাবণ্যোজ্জ্বল মূর্ত্তিখানাই বা কেমন ফুটে উঠ্ছিল। কেমন কমনীয়, স্নেহে প্রেমে মধুর। সর্ব্বাপেক্ষা তার স্বাধীন সতেজ ভাব—কেমন সবলে তার দিকে আমার মনকে টেনে নিয়ে যায়।

তাকে কি ইচ্ছা করলে, আমি পেতাম না? হেমের ধারণা যদি ঠিক হয়, তা হলে কার জন্য সে প্রত্যাখাত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তার পর, পীড়িতাবস্থায় আমার প্রতি তার ব্যবহার, গত কয়েক দিবসের আচরণ, কথাবার্ত্তা, সর্ব্বোপরি ষ্টেশনে শেষ বিদায়টী সবই কি সেই একই দিকে নির্দ্দেশ কচ্ছে না? আমি কি হেলায় হস্তস্থিত অমৃত-ভাণ্ড পরিত্যাগ করে—মৃগ তৃষ্ণিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরে বেড়াচ্ছি না? এত দিন হয়তো আমার ঘর-বাঁধা শেষ হয়ে যেতো—দশজনের ন্যায় আমিও আমার স্থানটুকু খুঁজে নিতে পারতেম—কিন্তু, তা না করে পূর্ব্বেও যেমন, আজও তেমন নীড়হারা পাখীর ন্যায়,—আমি কিসের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

চিন্তাস্রোত হঠাৎ কোথায় বাঁধা পেয়ে ফেনিল ও উচ্ছ্বসিত হয়ে, হৃদয় মূলে ছাপিয়ে উঠ্তে লাগ্‌লো। যাকে পেলে আমার আত্মার পিপাসা নিবৃত্ত হ'তো—তাকেই যখন পেলাম না,—তখন অন্যে কি প্রয়োজন? আবার তন্মুহুর্ত্তেই মনে হলো—সরোজ চিত্তাকর্ষণী—কিন্তু সাধারণ রমণীর তুলনায় তার পার্থক্য কোথায়? নিতান্তই সসীম—দুখানি অলঙ্কার দুটী মিষ্টি কথায় যার প্রাণ আনন্দে মেতে ওঠে। এ হেন রমণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে, শেষে আমিও কি নিতান্ত সাধারণ হয়ে পড়তাম না?

কিন্তু,—কিন্তু—সরোজ কি আমার পক্ষে সাধারণ? তার দর্শনে আমার জীবনসিন্ধু যেমন বিপুল নৃত্যে নেচে ওঠে, এমন তো আর কারো দর্শনে হলো না। আমার হৃদয় প্রস্রবণের ভাব রাশিতে কি আমি তাকে সঞ্জীবিত করে, নুতন করে গড়ে তুল্‌তে পারতাম না? আসব্যর পূর্ব্বদিন কেমন করে আমার পদযুগল ধীরে ধীরে তার গৃহের দিকে আমায় অলক্ষিতে নিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা তখন ঘনিয়ে আসছে। আর একদিন এমনি সময়, লাউডেন ষ্ট্রীটের সেই বাটীর সম্মুখে আমি অনির্দ্দিষ্ট ভাবে এমনি ঘুড়ে বেড়িয়ে ছিলাম। সে দিন প্রাণে যে আগুন ধরেছিল আজও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হলো না। অনেকক্ষণ পায়চাড়ী করলাম,—নীরব নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদ, লোকজন যেন কেহই নেই—কাকেও দেখ্‌তে পেলাম না। শুধু দ্বারোয়ান সম্মুখে টুলের উপর বসে আছে। অনেকক্ষণ চলে গেল—এমন সময় দেখলাম উপরের জানালায় সম্মুখে একজন রমণী এসে দাঁড়ালো? কে সে? কে?—কি সুন্দর কিন্তু কেন এত ম্লানময়ী? আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি,—তার দেহে আর অলঙ্কার শোভা পাচ্ছে না, কেশেরও সে বেশ বিন্যাস নেই,—কোন নিগূঢ় পীড়া এসে দেহ আক্রমণ করেছে—চক্ষুদ্বয় জ্যোতিঃহীন! আমি তার দিকে পলকবিহীন নেত্রে অনেকক্ষণ চেয়ে থাক্‌লাম। আহা! সে যদি একবার চাইতো! ইচ্ছে হচ্ছিল, তদ্দণ্ডে গৃহে প্রবেশ করে, তাকে বুকে নিয়ে পালাই—লোকালয় ছেড়ে,—সকল মানুষের সঙ্গ ছেড়ে—নির্জন গভীর বনের ভিতর চলে যাই। কিসের সংসার, কিসের সমাজ, মান সম্ভ্রম অখ্যাতি নিন্দা—যদি সরোজ আমার হয়, ক্ষুধা মেটে। অলক্ষিতে পদদ্বয় তার গৃহাভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল,—এমন সময় রাস্তার দুই ধারের বাড়ী সমুদয়কে কাঁপিয়ে ও মহাশব্দোত্থিত করে

এক জুড়ীগাড়ী এসে তার পুরভাগে লাগলো। দ্বারোয়ানজী পাগড়ী পরে সসম্ভ্রমে এসে সম্মুখে দাঁড়ালো এবং ক্ষণকাল মধ্যেই মিষ্টার বোসও তার ইউরেশীয়ান সঙ্গিনী হাসতে হাসতে নামলেন। আমার দিকে চেয়ে মিষ্টার বোস কটমট্ করে বল্লেন, কি চাই এখানে? আমি সরে পড়্লাম।

হা পাষণ্ড! এই তোমার স্ত্রীর প্রতি ব্যবহার! কেন তুমি তবে বিবাহ করেছিলে? তুমি ওতো ধনীর সন্তান। নীলমণি বাবু হতে কন্যার যৌতুক স্বরূপে প্রাপ্ত পঁচিশ হাজার টাকা কি এতই লোভনীয় ছিল? তার সাহায্যে হাইকোর্টে প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করবে,—শুধু এই জন্যেই কি তার কন্যাকে গ্রহণ করে তাকে তুমি কৃতার্থ করেছ? সরোজ! তোমায় কি দোষ দিব? এতদিন যে আত্মঘাতিনী হওনি, এও আমাদের ভাগ্য। কিন্তু তোমার ললাটে যে আজ আমি চির বিচ্ছেদের চিহ্নই যেন দেখে এলাম। আর কি এ জীবনে তোমার সাথে দেখা হবে? নরহন্তা দস্যু বোস হরণ করে তোমায় নিয়ে গেছে; আরতো পাব না! সমাজের এ সকল কি বিধি? অত্যাচারিত হয়ে ও তোমার স্বামীর হাত হতে উদ্ধারের বিন্দু মাত্র ও উপায় নেই। এ কী অলঙ্ঘনীয় নিয়ম! সাধারণ জন্তুর যে স্বাধীনতা আছে—তোমার তাও নেই। উঃ! কি অবিচার। কি স্বার্থপরতা পুরুষের!

এর জন্যেই তো বলি—লীলা ঠিক বুঝেছে। এর জন্যেই তো সে পরের অধীন হতে চায় না। স্বামী রূপ অত্যাচারী শাসকের অধীনে নিজের জীবন মরণের অধিকার ছেড়ে দিতে চায় না। ভাবতে ভাবতে এক একবার মনে হচ্ছিল, লীলা যদি সত্যই আমায় চায়, তা হলে গ্রহণ করিনা কেন? তদ্দণ্ডেই আবার মনে হলো,—তাকে কি ঠিক বুঝতে

পেয়েছি? আমার প্রতি তার ব্যবহার,—এর ভিতর এমন কি বিশেষত্ব আছে? মিশনারীদের হাতের মেয়ে—তাদেরই ন্যায় পরসেবা তারও জীবনের সাধারণ নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাদেরইতো অনুকরণে সে তাদের পাড়ার মেয়েদের জড় করে শিক্ষা দিচ্ছে, দরিদ্র রমণীদের কত ভাবে কখনও অর্থ দিয়ে, বস্ত্র দিয়ে, ঔষধ দিয়ে, পীড়ার সময় শুশ্রূষা করে উপকার কচ্ছে। আমার প্রতি ব্যবহার—এ সকলেরই একাঙ্গভুক্ত নয় কি? কিন্তু আবার মনে হচ্ছিল,—বিদায়কালীন তার অশ্রুসিক্ত নয়ন দ্বয় কি যেন কি এক প্রাণের ব্যাকুলতা প্রকাশ কচ্ছিল—যা আর কারো কাছে ধরা দেয় নি। যাক্—যাক্, সব যাক্। নৃত্যকৃষ্ণকে প্রাণ বিলিয়ে সে যদি সুখী হয়, হোক। আমার এ মোসাফিরের জীবন—এই আমার কাছে বেশ।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

বোম্বাই উপকূল, ষ্টীমার,...২৫শে পৌষ, সন্ধ্যাকাল।

কোথায়? স্বদেশ পরিত্যাগ করে কোথায় চলেছি? কেন চলেছি? ভারতবর্ষের শেষ চিহ্ন চক্ষের সম্মুখ হতে ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে নীলাম্বুরাশি ক্রীড়া কচ্ছে। দূরে, অতি দূরে সাগর প্রান্তে সূর্য্য ডুবে যাচ্ছে।

*　　*　　*　　*　　*

ভূমধ্য সাগর, ১০ই মাঘ...রাত্রি।

এ প্রাণের তৃষ্ণা—কিসের তৃষ্ণা? কিছুই যে ভাল লাগ্‌ছে না। কোথায় সুখ? কোথায় শান্তি? যে শান্তির ভিতর প্রাণ নেই, জড়তারই

যা নামান্তর মাত্র, তা নিয়েই বা কি করব? আধ্যাত্মিকতা? যার চর্চা করতে করতে লোক সাহস-উদ্যম-শূন্য কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হয়েছে, ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বেধে গেছে, সমস্ত দেশের উপর মৃত্যুর অপছায়া ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছে—তা নিয়ে কি এখনো ভুলে থাকব? হায়! হতভাগ্য দেশ! তোমার এ মোহ কি ভাঙবে না? ভক্তি বিশ্বাস! কাকে করব? আমার প্রাচীন দেশের প্রাচীন বাণীতে আমি বিশ্বাস হারিয়েছি? আমি নূতনের সন্ধানে চলেছি। আমার দেশ—সে তো মরেছে—মরতে বসেছে। আমিও তো তার সঙ্গে দিন দিন মৃত্যুর কবলে নিষ্পেষিত হচ্ছি! কিন্তু তাকে ছাড়বো কেমন করে? সে যে আমার প্রাণ। শত যুগের শত মায়ামমতার শৃঙ্খলে সে যে আমায় বেঁধে রেখেছে। আমার অবহেলিত অবজ্ঞাত দেশ—কে তাকে জীবনের পথ দেখিয়ে দেবে?

*　　*　　*　　*　　*

মালতীতে যত দিন ছিলাম, সুখ দুঃখের সহিত জড়িতজীবন হয়ে ছিলাম, অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাবার তেমন অবসর পাইনি। হৃদয়ের অন্তঃস্থল ভরে কর্ত্তব্যের ক্ষুদ্র চিত্রখানি জুড়ে ছিল। আজ এই রজনীতে সম্মুখে বিশাল সমুদ্রের দিগন্তপ্রসারিত অনন্ত জলরাশির দিকে দৃষ্টি করতে করতে মনে হচ্ছিল—কি নগণ্য আমি! মালতী—তার সব সুখ দুঃখ—সবই কত ক্ষুদ্র, নগণ্য! আমি কি নিয়ে এতদিন জীবন কাটাচ্ছি? বৃহত্তর প্রাণের আস্বাদ—কোথায় তা? কোথায় প্রাণের বিপুলতা ব্যাকুলতা—নিঃশেষ দান?

আবার মন হতে উত্তর হচ্ছিল, অনন্ত জগতের তুলনায়, মালতী কেন, —এ বিশাল পৃথিবী—এই যে সুবিশাল সমুদ্র—সবই যে ক্ষুদ্র, নগণ্য—নিতান্ত নগণ্য।

দূর যা—এ সব চিন্তা। আবার সেই নগণ্যত্বের ভাব? আমার প্রতি শিরায় রক্ত কণিকায় অণুতে পরমাণুতে—যুগ যুগ ধরে এ-ভাব মিশিয়ে আছে,—দিন দিন আমায় কুক্ষীগত করে নিঃশেষ করছে—পা যেন চল্‌তে চায় না, মন অবশ হয়ে আস্‌ছে। কেমন করে আমি এর হাত হতে ত্রাণ পেয়ে সগৌরবে বল্‌তে পারব, আমি পেয়েছি, আমি তার সন্ধান পেয়েছি—এস, তোমরা! এস,—অমৃত পান করে অমর হও—বলীয়ান হয়ে অগ্রসর হও?

*　　*　　*　　*　　*

ব্রিণ্ডিসিতে পদার্পণ করবার সঙ্গেই হৃদয় এক নূতন ভাবতরঙ্গে নেচে উঠ্‌তে লাগ্‌লো। এই তো ইয়ুরোপ—এই ইটালী—এই রোম—যার বীর্য্য শৌর্য্যের বিজয় গরিমা জগৎ পৃষ্ঠে চিরকালের জন্য অঙ্কিত হয়ে আছে। রোম কখনও ভবিষ্যতের অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কায় নিজকে আলোড়িত হতে দেয় নি; যখন যে কাজটী হাতের কাছে পেয়েছে প্রাণ মন দিয়ে সম্পন্ন করে গেছে। মানবত্বের এমন বিস্তার, মানব শক্তির এমন প্রসার—আর কোথায় হয়েছে? কি অদম্য অদ্ভুত শক্তিই না সামান্য একটী নগরের ভিতর এসে পুঞ্জীভূত হয়েছিল—যার দিকে সমস্ত ইয়ুরোপ ও অর্দ্ধ এশিয়া আফ্রিকার লোকসকল জীবন মরণের জন্য চেয়ে থাক্‌তো। সংসারকে কখনও অসার মনে করে নি সে, দয়া মায়ার ও প্রশ্রয় দেয় নি। এক কর্ত্তব্যের চিত্র সম্মুখে রেখে সন্তানগণ দেশকে জাতিকে বড় করবার জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেছিল—বড় হয়েছিলও তাই তারা। তাদের আদর্শ পুরুষ—কর্ত্তব্য ধর্ম্মের, কঠোরতার অবতার—ষ্টোয়িক। রোমের ভিতর ঘুরতে ঘুরতে আমি তার সন্তানগণকেই চোখের কাছে দেখ্‌ছিলাম—সিপিও, পম্পে, সিজার, সিসিরো, গ্রেকাস, অরেলিয়াস—

সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে হচ্ছিল—কি কুধর্ম্ম ই আমরা শিক্ষা করেছিলাম, ত্যাগ যার মূল মন্ত্র এবং স্বজাতি ঘৃণাই যার ভিত্তি। ধর্ম্ম! এও ধর্ম্ম, যা ঘরের ভাইকে যুগ যুগান্তর ধরে পর করে দিচ্ছে, মানুষকে পশুর অপেক্ষাও অধম মনে করার বুদ্ধি অহরহ জাগিয়ে তুল্‌ছে? স্বজাতি! কোথায় আমাদের জাতি? আমরাও এক জাতি? এসিয়া মৃত্যুর দেশ—সর্প ভীতি, ব্যাঘ্র ভীতি, পীড়া ভীতি—সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণই মৃত্যু। মৃত্যুর রাজ্যে প্রাণ থাক্‌বে কেমন করে? মৃত্যুতেই মুক্তি—তাই তার ধর্ম্মের শিক্ষা। কে যেয়ে তাকে এই বাহিরের মৃত্যু হতে উদ্ধার করে মনের মৃত্যু হতেও ত্রাণ করবে?

*　　*　　*　　*　　*

কর্ম্মশীল রোম হতে প্যারিস—ব্যবধান অত্যল্প। কিন্তু দুটীতে পার্থক্য অনেক। একটী প্রাচীন ইয়ুরোপের ভাব রাজ্যের কেন্দ্র স্থল, তার ইতিহাসের অন্ত হয়েছে—আর একটী হতে এখনও নূতন আশার বাণী প্রচারিত হচ্ছে। এখান হতে যে ভাবরাশি ছড়িয়ে পড়্‌ছে—তার ফলে মানবত্বের সম্প্রসারণ হচ্ছে, জগৎ উন্নত হচ্ছে।

*　　*　　*　　*　　*

ইয়ুরোপের ভাবকেন্দ্র চ্যুত হয়ে এক্ষণে অর্দ্ধ-অসভ্য রুসিয়াতে এসে উপস্থিত হবার উপক্রম হয়েছে। মানবের পাপ তাপ জ্বালা যন্ত্রণা সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য সমস্তই সে দাবদাহ ভীষণ কটাহের ভিতর পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কে বল্‌বে তা হতে নূতন মানুষ না নরাকারে পশু সেখানে সৃষ্ট হচ্ছে?

*　　*　　*　　*　　*

ব্রাসলেস—হলেণ্ড—নরওয়ে—সুইজারলেণ্ড—কত স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কেমন সব মনোরম স্থান—জ্ঞান ধন ঐশ্বর্য্যের লীলাভূমি।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ—কিন্তু একটী যেন শক্তি সামর্থ্যের আধার। কোথায় তাদের এ শক্তির মূল ?

*   *   *   *   *

বার্লিন হতে জেনা যেয়ে যখন উপস্থিত হলাম, তখন সন্ধ্যা সমাগত। হোটেলে রাত্রি কাটিয়ে, প্রাতে নগর পরিভ্রমণে বের হলাম। ইয়ুরোপের উজ্জয়িনী—যেখানে মহাকবি গেটে ফস্ট রচনা করে জগদ্বিখ্যাত হয়ে আছেন, যাঁর নামের সহিত তার বন্ধুবর মহাকবি সিলারের নামও জড়িত হয়ে চিরকাল জগতে ঘোষিত হবে। এই স্থানেই হেগেল তাঁর গভীর দর্শনতত্ত্বের আলোচনা করেছিলেন মহা দার্শনিক পণ্ডিত যেখানে বাস করতেন, গাইড আমাকে সেই গৃহ দেখিয়ে দিল। যতই দেখ্‌ছিলাম, ততই আমার হৃদয় ভক্তি শ্রদ্ধার ভাবে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছিল। সঙ্গে সঙ্গে থেকে থেকে হৃদয়পটে একটী দৃশ্যই জেগে উঠ্‌ছিল। চিরস্মরণীয় জেনা যুদ্ধের রাত্রিতে হেগেল তাঁর ফেনেমনোলজি গ্রন্থ রচনা শেষ করেন। রজনী গভীর,চারিদিকে ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্র সমূহের গভীর গর্জ্জন হচ্ছে, নেপোলিয়ানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য প্রুসিয়ানদের সহিত ভয়াবহ সমরে প্রবৃত্ত। চারিদিকে যে এমন মহাপ্রলয় সংঘটিত হচ্ছে,—তার বিষয় হেগেল অনভিজ্ঞ—তিনি তার নির্জ্জন পাঠ কক্ষে বসে গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত। এমন তন্ময়তা না হলে কি অন্যকে তন্ময় করা যায় ? ইয়ুরোপেও আধ্যাত্মিকতা এবং দর্শনের চর্চ্চাও আলোচনা হয়ে থাকে—কিন্তু তা মানুষকে অকর্ম্মণ্য করে তোলে না, সংসার হতে মনকে অদৃশ্য আকাশের দিকে, মৃত্যুর পর পারে অনির্দ্দিষ্ট জীবনের দিকে নিয়ে যায় না। তারা সংসারকে চিনেছে, সেখানেই বড়ও হচ্ছে—ধন জনে জ্ঞানে গুণে দেশ সব অলঙ্কৃত।

*   *   *   *   *

জীবন

ইংলেণ্ড! কি অত্যাশ্চর্য্য দেশ! বর্ত্তমান যুগের রোম। সময় ও স্থান বুঝে কাজ, এই প্রথম-দৃষ্টিতে-সামান্য নীতির অনুসরণ করে, ইংরাজ আজ জগতের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জাতি। কেমন সাহসী, কেমন দেশপ্রাণ!

*　　*　　*　　*　　*

নিউইয়র্ক, ফিলেডেলফিয়া, সিকেগো—ইংরাজেরই গৌরব মহিমা প্রচার কচ্ছে। ইয়ুরোপের সর্ব্বত্রই রমণী স্বাধীন অপ্রতিহতগতি কিন্তু আমেরিকায় নারীত্বের যেমন বিকাশ হয়েছে—এমন কোথায়ও নয়। রাস্তা ঘাটে আফিসে হোটেলে কলেজে সর্ব্বত্রই পুরুষের সঙ্গে তারাও সমান অধিকার পাচ্ছে। কেনেডা, নিউজিলেণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, মিসর, কাইরো সর্ব্বত্রই ইংরাজ—সর্ব্বত্রই তাদের বিজয় গরিমা ছড়িয়ে পড়ছে? দুর্দ্ধর্ষ নীরব ইংরাজজাতি—যাদের সঙ্গে বৃথা ভাব রাজ্যের সম্পর্ক নেই, স্বার্থকে যারা সঠিক জেনেছে। দুঃখ, এ হেন জাতির সঙ্গে এতদিন জীবন যাপন করেও মানুষ হতে পাল্লেম না। এখন ও শাস্ত্রের গৌরব ব্যাখ্যা করেই বেড়াচ্ছি। এখনও তিন হাজার বছরের পুরাণো পুঁথির মোহে মুগ্ধ। একটু একটু সত্যের টুকরার সঙ্গে সঙ্গে কত মিথ্যা কত কুসংস্কারের আবর্জ্জনা তাতে মিশে রয়েছে—কেউ তো তা দেখ্‌বে না। তাদের ভুল্‌বে কেমন করে,—জাতিভেদ—ব্রাহ্মণপূজা—রমণীর পরাধীনতা—এ সব ভুলব কেমন করে? তা হলে যে মানুষ হবে। মৃত্যুই যে তোমার লক্ষ্য, মৃত্যুর অপর পারের সুখের কল্পনাতেই যে তুমি মুগ্ধ;—এ জীবনে তো তুমি সুখ চাও না—পাবেও না।

*　　*　　*　　*　　*

এসিয়ার এক মাত্র দেশ জাপান, যেখানে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংযোগে নূতন মানুষ সৃষ্ট হচ্ছে। প্রতীচ্যের আধ্যাত্মিকতা ও অসারতার মোহের

হাত হতে সে উদ্ধার পেয়েছে। কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—তাদের ঘর বাড়ী, পরিচ্ছদ, আচ্ছাদন। পরীর দেশ, ফুলের দেশ, সৌন্দর্য্যের লীলা নিকেতন। এ-সব বিষয়ে ইয়ুরোপ ও তার কাছে পরাস্ত। তাও জাপান দেখে আমার তেমন ভাল লাগেনি। গভীরতা নেই,—মহত্ত্ব নেই, ভালবাসা নেই, সাহিত্য নেই, দর্শন নেই, কাব্য নেই—জাতীয় জীবনের ভিত্তি—ভাব নেই। আসলেও নকলে যে পার্থক্য—ইয়ুরোপ ও জাপানের তুলনায়, তাই বোঝা যায়।

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

জাপান হতে পিকিন এলাম। বৃদ্ধ চীন ও জাগরণের স্পন্দন অনুভব কচ্ছে। দেহে নূতন প্রাণের স্পন্দন হচ্ছে, এতদিনের লম্বাবেণী ও অহিফেণ সেবন পরিত্যক্ত হয়েছে, মানুষ হবার একটা দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা, জগতে স্বীয় স্থান অধিকার করবার ইচ্ছায় সেও অস্থিরচিত্ত হয়ে উঠেছে। অনভ্যাসবশত এখনও প্রকৃত ভাবে চল্‌তে পারছে না, কিন্তু দুদিন পরে পারবে।

*　　*　　*　　*　　*

বৎসরেক কাল চলে গেছে। নানা স্থানে নানা লোকের সম্পর্কে এসে সময়টা একরকম বেশ চলে যাচ্ছে—তাও বল্‌তে কি, চুম্বক লোহার কাঁটার স্থায়,—প্রাণটী সব সময়ই মালতীর দিকে আকৃষ্ট হয়ে রয়েছে। যখনই ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ভিতর একাকী ঘুরে বেড়িয়েছি, তখনি কেবলি মনে হয়েছে এদের স্থায় মালতীকেও কবে উন্নত দেখব?

তাদের ছোট ছোট গ্রাম গুলি—শিক্ষা স্বাস্থ্য ও ব্যবসা বাণিজ্যের কল্যাণে কেমন ধন ঐশ্বর্য্যে সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ। মালতী ও কি কখন তেমন হবে না? সেখানকার লোকও কি এদের ন্যায় মানুষ হয়ে উঠ্‌বে না?

মালতীর সঙ্গে সঙ্গে হেমের কথা, নলিনীর কথা, সরোজ, লীলা—আরও কতজনের কথা—মন মধ্যে সময়ে অসময়ে উদয় হয়ে বিলীন হয়ে গেছে। ইয়ুরোপের সর্ব্ববন্ধনবিমুক্ত রমণীদের সাথে আলাপ কর্‌তে কর্‌তে, মাঝে মাঝে আমি আপনা হতেই চুপ করে গেছি। কই তারা তো পুরুষের দিকে চেয়ে থাকে না? যতই দিন যাচ্ছে ততই তাদের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, জীবনের বিকাশ হচ্ছে—শক্তি বাড়ছে। মুক্ত বায়ুতে পশু পক্ষীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, পুরুষের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি সাধন হয়, কেবল কি জগতের মাঝে রমণীই তাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়?

আমার দেশের রমণীদের কথা মনে হয়ে প্রাণ শোকে দুঃখে সেচ্ছায় অভিভূত হয়ে পড়ছে। জগতে এমন প্রপীড়িত কে? এমন দুঃখী কে? আঁধারের ভিতর জন্মগ্রহণ করে আঁধারেই তারা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। যে কোমলতা, মমতা, ভালবাসা,—জগতের কত দুঃখ, কত ক্ষত দূরীভূত করতে পারত; যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি জীবনের কত জটিল সমস্যার জাল ছিন্ন করতে পার— কেউ তার সংবাদও পেলে না। হায়! রমণীর প্রতি পুরুষ এমন অবিচার অত্যাচার কোথায় করেছে? এমন ক্ষমতা পুরুষ তুমি কোথায় হতে পেলে?

নলিনীর শেষ পত্র পেয়েছিলাম—নিউইয়র্কে। তাঁর পুত্রের কথা, স্বামীর কথা, অনেক কথা ছিল। তা ছাড়া আরও অনেক সংবাদ ছিল—তন্মধ্যে দুটীই সর্ব্বাপেক্ষা আমাকে পীড়ন কচ্ছিল। একটী লীলার মাতৃবিয়োগ সংবাদ। সেই যে তাঁর রোগ দেখে এসেছিলাম, তা হতে আর

তিনি মুক্ত হন নি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লিখিত হয়েছে যে আর পি রায় শীঘ্রই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করবেন। তা হলে লীলা মেয়ে কোথায় দাঁড়াবে? অমন গরবিণীর সাথে কি বিমাতার মিলন সম্ভবপর হবে?—দ্বিতীয় সংবাদ—সরোজের পীড়া। কয়েক মাস যাবৎ জ্বরে ভুগ্ছে, নীলমণি বাবু তাকে নিয়ে নানাস্থানে বেড়াচ্ছেন তেমন কিছুই উন্নতি হচ্ছে না—বোধ হয় যক্ষ্মারোগ দেখা দিয়েছে। হায়! তাকে কি আর এ জীবনে দেখ্‌তে পাব না? ভাবতেও প্রাণ কেঁদে আকুল হচ্ছিল। জগতের এত স্থান ঘুরলাম—আমার মনের মতন তো কাউকেও এমন দেখলাম না। লীলা! তার মতও তো কেহ নয়নে পড়ল না? কাঠিন্যে, মাধুর্য্যে, সত্যতে, ভ্রান্তিতে, দয়াপ্রেমে, প্রাণের বিপুল পরিপূর্ণতায়—অনুরূপা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণে ভারতে নারী মূর্ত্তিতে কি সব অমৃত ভাণ্ডই না সৃষ্ট হচ্ছে! অন্যান্যসাধারণা সে। পদে পদে ভুল করছে—কিন্তু ভয়শূন্যা, আবেগময়ী। তার কথা যখনি ভাবি তখনি আমার দেশের কথা মনে উদয় হয়—জীবন উপভোগ্য, বাঞ্ছনীয় বোধ হয়। সুখ! সুখের অন্বেষণে কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছি?

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

আরো মাস ছয়েক চলে গেছে। আর পদদ্বয় অগ্রসর হতে চায় না। কে আমায় দেশের দিকে প্রবলবেগে টান্‌ছে? কোথায় জন্মগ্রহণ করে এমন সরোজ,—কোথায় সাক্ষাৎ পাব এমন মাধুর্য্যময়ী লীলার? এমন স্নেহময়ী ভগিনী! কোথায় তুলনা তার? আমার শস্য শ্যামলা মাতৃভূমি—

জগতে কোথায় তার সমকক্ষ ? কোথায় দেখব এমন পুত্রবৎসল পিতা, ভ্রাতৃভক্ত ভাই, পতিগতপ্রাণা সীতাদেবী। সব দোষ নিয়েও—আমার দেশের তুলনা নেই। আমি কোথায়—নিরুদ্দেশে সুখের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছি ?—সুখ! সুখ! তাকে কি পশ্চাতে ফেলে আসিনি ?

* * * * * *

১৮ ফাল্গুন, ষ্টীমার, সমুদ্রবক্ষে।

সেন্‌ফ্রেন্সিস্‌কো হতে চলেছি—ফিরে চলছি। মেলবোর্ণে যাওয়া হয়ে উঠল না—ইচ্ছা কর্‌লো না।

সন্ধ্যাকাল, সমুদ্রবক্ষ ভেদ করে সজোরে জাহাজ চল্‌ছে।

কি দেখ্‌লাম, কি শিখ্‌লাম,—এই বৎসরাধিক কাল দেশে দেশে ঘুরে ? যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন ও সমবায়ে জীবনের উদ্বোধন ও পরিপুষ্টি। যে দুর্ব্বল, জগৎ তার ক্রন্দনের সংবাদ নেয় না। যে একাকী তারও স্থান নেই তার বক্ষে ; নিশার শিশির বিন্দুর ন্যায় কোথায় সে অন্তর্হিত হয়ে যায়। যার পৌরুষ আছে সেই মানুষ, যারা জীবিত তারাই জাতি ; শুধু তাদের দাবীই জগৎ চিরকাল পূর্ণ করে আস্‌ছে!

ইয়ুরোপ ও আমেরিকায় লোকের সহিত লোক মিশেছে—মিশ্‌ছে—ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, রমণী—একে অন্যকে টেনে তুল্‌ছে,—দেশকে কেন্দ্র করে মিলিত হচ্ছে।

তারা মানুষ হয়েছে, বড় হয়েছে। তোমরাও কি পার না ?

* * * * *

তবে, ভালবাসায় প্রাণ পূর্ণ করে তোলো সবার, একে অন্যে মিলিত হও। ভুলে যাও সর্ব্বাগ্রে—তোমার জাতিভেদ। সকলে সমান—সকলেরই বাঁচবার, বড় হবার সমান অধিকার।

ছিন্ন করে ফেল—রমণীর অধীনতার শৃঙ্খল। তোমার তাড়নায় পুরুষ! সে তো মাথা তুল্‌তে পার্‌ছে না। সে তোমার দাসী নয়—তোমারই মত সমবুদ্ধি মানব। তাকে নিজভাবে নিজ হস্তে জীবন সমস্যা পূরণ করতে দাও।

জীবন অনিত্য, জগৎ অনিত্য, ধনজন বিত্ত কিছুই নয়,—আত্মাই সর্ব্বস্ব—এসব কুদর্শন ভোল। গৈরিক বসন ত্যাগ কর, হাতে কোদাল নিয়ে সংসারের মাটী কাটো, সংসারে মনোনিবেশ কর,—সেখানে বড় হতে সচেষ্ট হও।

ভগবান! কোথায় ভগবান? পেয়েছ কি কখনও? দেখেছ কি কখনও? মুনিঋষিরা বলেছেন, সাধুরা বলছেন। এমন অনেক কথা তাঁরা বলেছেন—লিখেছেন—যা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। সকল কাজে যেমন—ভগবান সম্বন্ধেও মনের ভাব তেমনি কর। নিজের প্রাণের ভিতর সঠিক প্রমাণ না পেলে কিছুতেই বিশ্বাস করবে না—সাধুই বলুন আর যিনিই বলুন। নিজের পায়ের উপর সাহসে ভর করে দাঁড়াও; জেনে নাও—তোমার দুখানি হাত ও বুদ্ধিই তোমার একমাত্র সহায়।

* * * * *

আজীবন যে সকল চিত্র অস্পষ্ট ছায়ার ন্যায় হৃদয় ভরে ফুটে বিলীন হয়ে গেছে—চেয়ে দেখলাম সবই সত্য। যা কিছু সন্দেহ ছিল—দূর হয়েছে। প্রাণ মিছে বলে না। শুনবে না কি তোমরা আমার কথা? না শোন,—তাও দুঃখ নেই। আমি তো প্রাণের সন্ধান পেয়েছি। কবে সকল মানুষ বাঁচবার বড় হবার সমান অধিকার পাবে,—রমণীর অধীনতা ছিন্ন হয়ে যাবে?

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

নিউইয়র্কে এসে নলিনীর আর এক পত্র পেলাম। যা এতদিন আশঙ্কা কচ্ছিলাম—তাই ঘটলো। আমার প্রাণপ্রতিমা সরোজ জন্মের মত চলে গেছে! নীলমণি বাবু সর্ব্বশেষে তাকে বৈদ্যনাথে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেখানেই তার দুঃখ জীবনের অবসান হয়েছে! মাসেক দুই হলো অকালে একা পুত্র সন্তান প্রসব করেছিল—সূতিকা গৃহেই তার মৃত্যু হয়—তার কয়েকদিন পরেই যে প্রবল জ্বর ও কাশি দেখা দেয়—আর আরোগ্য হয় নি। শেষ অবস্থায় স্বামীকে একবার দেখ্‌তে চেয়েছিল—কিন্তু হতভাগা তখন মিস্ ম্যাথুয়নের মোহেই মুগ্ধ—স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করার সময় কোথায়? চিন্তা কি তার? এক দাসী গিয়েছে—ইচ্ছে হলেই—আর একজন আস্‌বে।

নলিনীর পত্রে আর একটী সংবাদ ছিল—লীলার আসন্ন-বিবাহ, নৃত্যকৃষ্ণের সঙ্গে। বলব কি সত্যি কথা—প্রাণের ভিতর যাতনা ও হচ্ছিল—রাগও হচ্ছিল। কোথাকার কে তুমি কথা নেই বার্ত্তা নেই—লীলাকে এমন ভাবে নিয়ে চলে যাবে? মনে মনে ধিক্কার ও হচ্ছিল—নিজের প্রতি। সকল কাজেই আমার বিপরীত নিয়ম। সরোজকে যদি তখন গ্রহণ করতাম,—তা হলে সেও আজ বেঁচে থাকৃত,—আমাদের সংসারও বুঝি এমন বিশৃঙ্খল ভাব ধারণ করত না। তার পর লীলা—সেও কি আমার কাছে ধরা দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েই ছিল না? আমি তখন হস্তস্থিত সুধাপাত্র ফেলে—উদাস প্রেমিকের মুখস্ পরে—দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়ালাম। এমন কে আমি—যে লীলা আমার

প্রতীক্ষায়—তার অনিন্দ্য রূপ যৌবন নিয়ে বসে থাকবে? কবে আমি ফিরে আসব,—এসে বলব,—তবে তুমিই ভাল, তুমিই এস—আর অমনি জীবন কৃতার্থ মনে করে, আমার বক্ষে এসে লুটিয়ে পড়বে? এমনটী হয় না জগতে। কে কার জন্য বসে থাকে?

একাকীই ফিরে যাব—মালতীতে। কাজের ভিতর যেয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। নূতন ধর্ম্ম প্রচার করব,—মানুষের নিজ শক্তিই যার মধ্যমণি আর জ্ঞান-বিজ্ঞানই যার ভিত্তি। সাম্যের মহামন্ত্র প্রচার করব,—মানুষ গড়ে তুলব,—রমণীদের অধীনতা পাশ মুক্ত করব, শিক্ষাপ্রচার করব,—স্বাস্থ্যের কথা, জীবনের কথা শিখাব—কত কাজ, কত বাধা,—কত বিঘ্ন,—কত জয়, পরাজয়— কত দুঃখ, কত আনন্দ! কিসের লজ্জা, কেন অলসতা, জড়তা? ক্রমে ঘরে ঘরে আমার বাণী উচ্চারিত হবে—ভাই ভগ্নীর মিলনে নূতন জাতি সৃষ্ট হয়ে উঠবে—ন্যায়ও প্রেম যার মূল মন্ত্র হবে। ভাবতে ও কত সুখ!

কিন্তু, আর কাকে কি আমার পার্শ্বে আমারই ভাবে বিভোর হয়ে সব সময় দণ্ডায়মান দেখতে পাব না! আর একজনের পরিপূর্ণতা হতে আমার প্রাণ পুষ্ট হবে না? আবেগময়ী ভাবোচ্ছ্বাসময়ী লীলাময়ী লীলা! নৃত্যকৃষ্ণের মত সাধারণ লোকের সঙ্গে মিলিত হয়ে সে কি সুখী হবে?

ভাল,—সে যে কিদৃশ লোক—তাতো কিছুই জানিনে। তাও, তার বিরুদ্ধে কত সব মত প্রকাশ কচ্ছি। লীলা যখন তাকে গ্রহণ করেছে—নিশ্চয়ই সে অসামান্য।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

কলকাতায় এসে উপস্থিত হলাম।

জাহাজ হতে নামতেই হেম ও নলিনীকে দেখতে পেলাম। কাছে যেয়ে হাত বাড়াতেই নলিনীর প্রিয়দর্শন পুত্রটী আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই একটী বছরের ভিতর,—নলিনী পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কত সুন্দর হয়েছে। স্বামীর প্রতি সন্তানের প্রতি ভালবাসা যেন তার মুখে চোখে ফুঠে উঠ্ছে। হেমেরও চেহারার বেশ উন্নতি দেখতে পেলাম।

এতদিন পরে আমাকে পেয়ে তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্ল—কিন্তু আমার নিকট তার তেমন প্রতিদান না পেয়ে বুঝি মনে মনে ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল।

কতকটুক পরেই সরোজের দুঃখদগ্ধ জীবনের করুণ কাহিনীর কথা উঠ্লো। গাড়ীতে চড়ে আমরা যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কচ্ছিলাম, এবং নলিনী সে হৃদয়বিদারক আখ্যায়িকা বিবৃত কচ্ছিল—প্রাণ শতধা বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। দেওঘর যাবার পূর্ব্বে নলিনীর সঙ্গে তার শেষ দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন নলিনী বল্লো সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল,—ভাই! এই শেষ দেখা; ভেবেছিলাম মরবার পূর্ব্বে সুরেশ বাবুর সাথে আর একবার সাক্ষাৎ হবে—কিন্তু হলোনা। তাঁকে বলো—আমায় ক্ষমা করতে।

তাকে ক্ষমা! স্বর্গের দেবী স্বর্গে সে চলে গেছে!

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

লীলার বিবাহের তারিখ ঠিক—আর পনর দিন মাত্র বাকী। নলিনী বল্লো—কিছুই তেমন বুঝে উঠ্‌তে পাচ্ছিনা। লীলার বোধ হয় তেমন মত নেই। তাই যদি না হবে—তা হলে বার বার তারিখ ফিরছে কেন? এবার নিয়ে তিন বার বদ্‌লে গেল।

কারণ জিজ্ঞাসা করতে নলিনী বল্ল,—আর পি রায়ের খুবই ইচ্ছা—এখানেই হয়। মেয়েটাকে কোনও মতে হাত ছাড়া করতে পারলেই তিনি নিজে আবার বিয়ে করবেন—সে দিকেও গোপনে সব ঠিক হচ্ছে—এক পাত্রী ও নাকি ঠিক হয়েছে—তবে লীলার বিয়ে না হয়ে গেলে কিছু করে উঠ্‌তে সাহস কচ্ছেন না।

হেম হেসে বল্ল,—মেয়ে গুলকে নিয়ে পড়া গেছে মহা মুস্কিলে। ইচ্ছে হয়ে থাকে বাপু বিয়ে করে ফেল; না হয়—পরিষ্কার বলো।

নলিনী। লীলাতো আগাগোড়াই বল্‌ছে বিয়ে করবেনা—তার বাবাই তো গোলমাল কচ্ছে। লীলার তো বিয়েতে একেবারেই মত নেই।

হেম। কে বল্লে নেই? মত বেশ আছে—তবে মনের মতনটী জুটছে না। এখন তিনি এসেছেন—যদি তার মত হয়, দেখো তারিখ আর বদ্‌লাতে হবে না—সাত দিনের ভিতর সব মিটে যাবে।

নলিনী। তুমি যে কি বল্‌ছ—বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা। কাকে উল্লেখ করে বল্‌ছ? হেমের মুখের চাপা হাসি লক্ষ্য করে সে ক্ষণেক পরে বল্ল,—ও, দাদার কথা—তুমি এত সবও জান। দাদার সঙ্গে হলে তো কবেই হয়ে যেতো?

হেম হেসে বল্লো—না, আমি তো কিছুই বুঝিনে। দাদা ও এজন্মে বিয়ে করবে না—লীলাও এজন্মে বিয়ে করবে না—তবে এমন দুজন এক প্রকৃতির লোক সংসারের সব জায়গা ছেড়ে—আবার কলকাতায় এসে একত্র হলো কেন? গেল ইয়ুরোপ, গেল আমেরিকা, গেল জাপান, কে এই বাবুটীকে পুনর্ব্বার বাঙ্গালা দেশে টেনে নিয়ে এলো?

কি উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম,—মুখেই ঠেকে রইলো।

*   *   *   *   *

নৃত্যকৃষ্ণের সঙ্গে লীলার শ্রাবণ মাসের দশই তারিখ বিবাহ। এই মর্ম্মে—আর পি রায় হতে—সে দিনই বৈকালে হেমের কাছে—বেয়ারা চিঠি দিয়ে গেল। আর পি রায় লিখ্‌ছেন—এবার তারিখ আর ফিরবে না। পত্রের আভাসে ইহাও বোঝা গেল, লীলার পক্ষ হতে আর কোনও প্রকার আপত্তিই এবার শোনা যাবে না। হায়! লীলার ভাগ্যে কি শেষে এই ছিল? কিন্তু লীলার যে এ বিবাহে অমত তাও তো বোধ হচ্ছে না। কিছুই যে বুঝে উঠ্‌তে পারছিনে।

ভালই হলো—কিন্তু মনকে যতই প্রবোধ দিতে চেষ্টা কচ্ছিলাম—কিছুতেই যেন মান্‌ছিল না। এক বছরের অধিক কাল তাকে দেখিনি;—এমন কি তার হস্তাক্ষরটী পর্য্যন্ত ও চোখের সম্মুখে পড়েনি। তাও তার অনুপম কান্তি পূর্ব্বেরই ন্যায় তেমনি আমার হৃদয় মন পূর্ণ করে আছে। তার নিটোল বদনখানি,—চম্পকবর্ণ—তার জ্যোতিষ্মান চক্ষুদ্বয়,—সুদীর্ঘ কেশদাম—গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল—সবই যে আমার চোখের সম্মুখে ভাস্‌ছে। তার যা কিছু এক সময় দোষের বলে মনে হতো—তাও এতদিনের বিরহের পর সুমিষ্ট সুন্দর বোধ হচ্ছে। কত জায়গায় কত রমণী দেখ্‌লাম কিন্তু তার তুলনা কোথায়? সেও

আজ আমায় ত্যাগ করে গেল! মালতী—তার সুখ দুঃখ—আমার সমস্ত জীবন—সব নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হচ্ছিল।

লীলার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাব কি? সে কি আমার কথা এখনো ভাবে? কখনো ভেবেছে কি?

তার বিবাহোৎসবে যোগদান—তা আর আমার পক্ষে ঘটে উঠবে না। তার পূর্ব্বে তার কাছে বিবাহে আনন্দ জ্ঞাপন করে আসা—অন্যায় কি? আর পি রায় ও এতদিনের পরে দেখে নিশ্চয়ই সুখী হবেন।

* * * * *

সন্ধ্যার আঁধার তখন গাঢ় ভাব ধারণ কচ্ছে—যখন আর পি রায়ের গৃহে যেয়ে আমি উপস্থিত হলেম।

বসবার কক্ষে প্রবেশ করব, এমন সময় দারোয়ানের কাছে জানতে পেলাম, আর পি রায় এই মাত্র বেরিয়ে গেলেন—রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে ফিরবার কথা নয়—গৃহে শুধু লীলাই আছে।

তার সাথে দেখা না করে কিছুতেই মন ফিরতে চাচ্ছিল না কিন্তু এ অবস্থায় এতদিন পরে দেখাইবা করি কেমন করে?

কতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলাম। শেষে দারোয়ানকে বল্লাম,—লীলা দেবীর সাথে কি দেখা হতে পারে না?

সে উত্তর করলো, কেমন করে হোবে বাবু সাহেব?

পকেট হতে কার্ড খুলে বল্লাম, এই কার্ড নিয়ে তাকে দেখাও—যদি দেখা করার হয়, করবেন।

সে তাও নিয়ে যেতে সম্মত হলো না। মহা বিপদেই পড়া গেল। একবার ভাবলাম, আজ ফিরে যাই, কাল আসা যাবে—কিন্তু পা সরছিল না; শেষে ঠিক করলাম—মিষ্টার রায় আসা পর্য্যন্ত বসে থাকব।

চেয়ারে উপবেশন করে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলাম,—কবে বিয়ে? সে উত্তর করলো, দশ তারিখ, বড় গোলমাল হোচ্ছে, আজও বৈকালে এই নিয়ে কত তর্কো হোয়ে গেলো।

কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছিলাম না। তখন পকেট হতে দুটী টাকা বের করে, তার হাতে দিয়ে বল্লাম, দেখো, আমার বিশেষ জরুরী কাজ, লীলা দেবীর সাথে সাক্ষাৎ করার বড় দরকার, কার্ডখানা তাকে দিয়ে এসো।

টাকা দুটী হাতে নিয়ে, আম্তা আম্তা করে কার্ড হস্তে সে বেরিয়ে গেল। এমন সময় পার্শ্বের কক্ষ হতে, কে, কে ওখানে? বল্তে বল্তে একটী রমণী ঈষৎ ত্রস্তব্যস্তভাবে দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল? কে সে? কে? কে?

একবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, ও আপ্নি—আপ্নি এতদিন পড়ে,—অর্দ্ধস্ফুটভাবে এই কয়টী মাত্র কথা উচ্চারণ করে, সে একটু পশ্চাতের দিকে সরে পড়্লো। তদ্দণ্ডে দেখ্তে পেলাম তার দুর্ব্বল দেহখানা সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ঢলে পড়্বার উপক্রম হয়েছে।

সেই মুহূর্ত্তে কেমন করে লজ্জা সরম দ্বিধা ভয় সব যেন বিস্মৃত হয়ে গেলাম। আমি যেয়ে স্পর্শ করতেই, আমারই বিরহে নিশার শেষের তারকাটীর ন্যায় ক্ষীণদশাপ্রাপ্ত শুভ্র দেহখানা—আমার বক্ষের দিকে লতিয়ে পড়লো। মুহূর্ত্তে একের প্রাণ অন্যের সহিত দুর্ভেদ্য বন্ধনে মিলিত হয়ে গেল! এত দিনের সব সন্দেহ, সব দুঃখ যাতনা, দুরত্ব—মিলনের মহা আনন্দের ভিতর বুদ্বুদের মত অদৃশ্য হয়ে গেল।

* * * * *

মাসেক পরে লীলাকে সঙ্গে করে মালতীর দিকে রওয়না হলাম।

রাস্তায় আস্‌তে আস্‌তে তাকে বল্লাম, এ কি ভাল কর্‌লাম আমরা, এমন সব-হারা হয়ে সাধ করে দরিদ্রতা বরণ করে নিয়ে? না জানি কোন দুঃখ কষ্টের ভিতরই তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি?

সে তার স্বর্ণচুড়ি বাজিয়ে ঈষৎ গম্ভীরভাবে উত্তর কর্‌লো, কোথায় দুঃখ? যেখানে সূর্য্য, সেখানেও আবার আঁধার? টাকা পয়সাতো কত জনেই রোজগার কচ্ছে, নাই বা হলো আমাদের তা, বা নাই হলো প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি, যদি প্রাণের সন্ধান পাই—পিপাসা মেটে। দেখ্‌বো কোথায় এর শেষ। সামান্য দুটো প্রাণ, এর জন্যেও চিন্তে?

এ যে আমারই আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমতী হয়ে লীলার মধুর কণ্ঠে বিরাজ কচ্ছে। সে যে আমারই জন্যে প্রকৃতির রম্যোদ্যানে ফুটে উঠেছে।

সমাপ্ত।